সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

ভারত অভিযান

ভারত অভিযান - ১

ভারত অভিযান

(প্রথম খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর — ২০০৭

প্রকাশক ◗ আরিফ বিল্লাহ্, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ◗ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ◗ নাজমুল হায়দায়
কম্পিউটার কম্পোজ ◗ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ◗ আল-আরাফা প্রিন্টার্স
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

BHAROT OVIJAN-1 : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Al-Arafa Printers Date of Publication September 2007.

PRICE : TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY

ISBN : 984-70109-0000-3 SET

উৎসর্গ

মাতৃত্বের সুখানুভূতি বুঝে ওঠার আগেই কোলজুড়ে আসা ফুটফুটে ছেলেটি নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেলো জান্নাতের শিশুকাননে।

ছেলে হবে দীনের সৈনিক, দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে দেবে উজাড় করে, মায়ের সেই শাশ্বত স্বপ্ন রয়ে গেলো অধরা।

রাব্বুল আ'লামীন তাকে বীরক সন্তানের গর্বিতা মা হিসেবে কবুল করুন।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে এদেশে উর্দুভাষী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ'র পরিচয় দেয়ার নিষ্প্রয়োজন, তদ্রূপ বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও অনুবাদক শহীদুল ইসলাম-এরও বিশেষ পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামী উপন্যাসের রুচিবান পাঠক মাত্রই তাঁর অনুবাদ ও লেখার সাথে পরিচিত। কালজয়ী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ-এর অন্যতম কীর্তি সুলতান মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান সিরিজ এর এটি প্রথম খণ্ড। পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটিকে সার্বিক সুন্দর করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পাঠক পাঠিকা মহলে এ সিরিজ আদৃত হলেই আমাদের প্রয়াস স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করছি।

—প্রকাশক

লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি প্রথম খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মঁতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

৯৭১ সালের পয়লা নভেম্বর, ৩৫৭ হিজরী সনের দশই মুহররম। সেদিন মানবেতিহাসে সূচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। জন্ম নিলো এমন এক কালজয়ী মহাপুরুষ, যার নাম শুনলে হাজার বছর পরে আজো মূর্তিপূজারী হিন্দুদের গা কাঁটা দেয়। কল্‌জে কেঁপে ওঠে। সেই মহাপুরুষের নাম সুলতান মাহমূদ গযনবী। ইতিহাসে যিনি আখ্যা পেয়েছেন 'মূর্তি সংহারক' নামে।

হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে পৃথিবীতে ঘটে গেছে কতো ঘটনা, কতো বিবর্তন। কতো রাজা, মহারাজা, দুঃশাসন, সুশাসন দেখেছে প্রাচ্য এশিয়ার জমিন। এখানকার মাটিতে কতো বনি আদমের খুন মিশে আছে তার ইয়ত্তা নেই। কতো আদম সন্তান, এক আল্লাহর ইবাদতকারী বহু দেবতাপূজারী মূর্তিপূজকের নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট হয়েছে এরও নেই সঠিক পরিসংখ্যান। কিন্তু একটি কথা ইতিহাসের পাতায় চির সমুজ্জ্বল— মূর্তি ভাঙ্গার ইতিহাস। পৌত্তলিকদের মনগড়া দেবদেবীর মিথ্যা স্বর্গ ভেঙ্গেচুরে মহাজগতের সত্য ও প্রকৃত স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। একবার দু'বার নয়, পরাজয়-পরাভবকে দু'পায়ে দলে সতের বার ভারতের মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক প্রভুদের সৃষ্ট সাম্রাজ্য খান খান করে ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার ইতিহাস। সেই কালজয়ী ইতিহাসেরই জনক সুলতান মাহমূদ।

সুলতান মাহমূদ ইতিহাসের এক জীবন্ত কিংবদন্তী। এখনও জীবন্ত তাঁর কর্মকৃতি। বেঈমানদের কাছে মাহমূদ গযনবী হিংস্র, সন্ত্রাসী, খুনী, অত্যাচারী কিন্তু মুসলমানদের কাছে সুলতান মাহমূদ মর্দে মুজাহিদ, মহানায়ক, ভারতীয় মজলুম মুসলমানদের ত্রাণকর্তা, মূর্তিবিনাশী।

আজ থেকে হাজার বছর আগে। মহাভারত জুড়ে ছিল মূর্তি ও মূর্তিপূজারীদের একচ্ছত্র রাজত্ব। মানুষ ছিল মানুষের দাস। মানুষের উপর প্রভুত্ব করতো মানুষ। মানুষের হাতে তৈরি মূর্তি-পদতলে জীবন দিতো মানুষ।

আজ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে শোভিত যে মূর্তি, সেসব কাদা মাটির মূর্তিকে ভেঙ্গেচুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে সুলতান মাহমূদ সেই সময়ের

পরাজিত পূজারীদের বলেছিলেন, "কাদা-মাটির এসব ভূত ও মূর্তি মানুষের প্রভু হতে পারে না, যদি তোমাদের মাটির ওইসব দেবদেবীর কোন ক্ষমতা থাকে তবে বলো, নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত টুকরোগুলোকে পুনর্গঠিত করে আমাকে এভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলুক।"

পারেনি। ধ্বংসাবশেষ থেকে দুমড়ানো মুচড়ানো মূর্তির টুকরো আর জোড়া লাগেনি। মাটিতে মিশে যাওয়া দেবদেবীরা খাড়া হয়ে রুখতে পারেনি মূর্তিসংহারী মাহমূদকে। সুলতান মাহমূদের বিজয়ী সৈনিকেরা কাদা-মাটির মূর্তির উপর দিয়ে তাদের ঘোড়া হাকিয়ে দিলো। সোমনাথ থানেশ্বরের বিশালকায় মূর্তিগুলো মাহমূদ গযনবীর অশ্ববাহিনীর খুরাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, পদাতিক বাহিনীর পদতলে পৃষ্ঠ হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলো। প্রতিরোধ করবে তো দূরে থাক আত্মরক্ষাও করতে ব্যর্থ হলো। সে সময়ের ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছিল, স্বীকার করেছিল এক আল্লাহ্র বড়ত্ব, মেনে নিয়েছিল এক আল্লাহ্র গোলাম মাহমূদ গযনবীর বশ্যতা। অতঃপর পেরিয়ে গেল অনেক দিন।

এক সময় অতীত হয়ে গেলেন মাহমূদ গযনবী। ভারতের মন্দিরে মন্দিরে আবারো শুরু হলো শঙ্খধ্বনি, শুরু হলো গীত-ভজন। মন্দিরের শূন্য বেদীতে পুনঃস্থাপিত হলো আরো বিশাল বিরাটাকার পাথর-কংক্রীটের শক্ত মূর্তি। ব্রাহ্মণরা নতুন উদ্যোগে পুনরোদ্যমে শুরু করলো ভগঃভজনা। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়ে হিন্দু-তপস্বীরা মূর্তিসংহারের প্রতিশোধ নিলো; জানিয়ে দিলো, সন্ন্যাসীরা মূর্তিনাশীদের প্রতিশোধ নিয়েছে, মুসলমানদের ইবাদতখানা মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে মূর্তি স্থাপন করেছে। তারা মুসলমানদের শক্তি, বীরত্ব, কীর্তি গাঁথার ইতিহাসকে মুছে দিয়েছে।

বিগত হাজার বছরে মুসলমানরা ভারতের পৌত্তলিকদের কাছেই শুধু আত্মবিসর্জন দেয়নি, পৃথিবীর যে সব ভূখণ্ডে মুসলমানরা ছিল দণ্ডমুণ্ডের মালিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধর্মীদের কাছে এসবের কর্তৃত্ব চলে গেছে। মুসলমানরা হারিয়েছে ঈমানী শক্তি, জাতীয়তা বোধ, বিস্মৃত হয়েছে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশ্বনবীর দেয়া শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়েছে। পরিণতিতে ভিমরুলের মতো চতুর্দিক থেকে হামলে পড়েছে বেঈমানেরা, সম্বিত হারানো ব্যাঘ্রের মতো মুসলিম নওজোয়ানরা দংশিত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে নিজেদের সৃষ্ট তুফানে। এখন মুসলমানদের অবস্থা টালমাটাল।

পুনরায় ভারতে ফিরে এসেছে পৌত্তলিকতার জৌলুস। গযনবী যেসব দেবালয় ধ্বংস করেছিলেন সেগুলো এখন আগের চেয়ে আরো বেশি জমজমাট। আধুনিকতার রঙিন ফানুসে উজ্জ্বলতার মূর্তিগুলো যেন পরিহাস করে বলছে, মুসলমানদের খোদা এখন আর নেই, এখন আর নেই মূর্তিসংহারী কোন মাহমূদ। ওরা সব মরে গেছে।

মিথ্যার ভূত ধ্বংসকারীদের চারিত্রিক রূপ কেমন হয়ে থাকে, আর ইসলামের শিকড় কীভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কেটে দেয়া হয়, সেই সব জিজ্ঞাসার জবাব এবং অজানা অধ্যায়গুলোর চাপা পড়া ভয়ঙ্কর সব ঈমান কেনাবেচার উপাখ্যান জানতে হলে ফিরে তাকাতে হবে অতীতের দিকে, উন্মোচন করতে হবে ইতিহাসের ভাগাড় ঘেঁটে প্রকৃত সত্যকে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। সমকালীন শাসকদের তৈরি কঠিন প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কোন পর্যবেক্ষকের সন্ধানী দৃষ্টিও নাগাল পায়নি প্রকৃত সত্যের, অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই প্রকৃত সত্য ইতিহাস, চেপে রাখা ইতিহাস।

সত্য চাপা পড়ার কারণে মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামী বীর সেনাদের কীর্তি বদলে গেছে, সত্যের পতাকাবাহীরা কথিত ইতিহাসে আখ্যা পেয়েছেন খলনায়ক আর খলনায়কদের দেয়া হয়েছে মহানায়কের আসন। সত্য-মিথ্যার আলো-আঁধারে মিশ্রিত ইতিহাসের জঞ্জাল যাচাই করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা যে কঠিন তা আন্দাজ করা যায় এ থেকেই যে, সুলতান মাহমূদ গযনবীকে সমকালীন প্রখ্যাত দুই মুসলিম ইতিহাসবিদও চিত্রিত করেছেন এভাবে :

"মাহমূদ গযনবী ছিলেন সোনা-দানা ও সম্পদ প্রাচুর্যের প্রত্যাশী। মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসে তার বেশি আগ্রহের কারণ ছিল সেগুলোর ভেতরের মণি-মুক্তা, সোনা-দানা কব্জা করা"। অথচ অনেক হিন্দু ইতিহাসবিদও অকপটে বলেছেন যে, "মাহমূদ গযনবীর মণি-মুক্তা, সোনার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তিনি সোমনাথের মূর্তিগুলোকে আট আটটি টুকরো করে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন, তার সৈনিকেরা এগুলোকে পায়ে পিষে ফেলেছিলো, মূর্তির গায়ে কিংবা মন্দিরের কোথাও সোনা-দানা, মণি-মুক্তা গচ্ছিত রয়েছে কি-না অথবা মূর্তির গায়ে অলঙ্কার জড়ানো ছিল কি না এসবের প্রতি তাদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মাটি ও পাথরের তৈরি এসব মূর্তির প্রতি মাহমূদ ও তাঁর সৈনিকের ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। এগুলোর প্রতি আগ্রহভরে তাকানো, এসব থেকে সোনা-দানা খুলে নেয়ার কথা প্রকৃতপক্ষে মাহমূদের প্রতি আরোপিত চরম অপবাদ।"

মিথ্যা গুজবে ভর করে চলে। মিথ্যা ধ্বংসকারীদের সন্তানেরাই যখন গুজবকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, পূর্বপুরুষদের প্রতি তাকায় সংশয় ও সন্দেহভরা দৃষ্টিতে, তখন সত্যের ভিত কেঁপে ওঠে, সত্যের শিকড় মূল থেকে ছিন্ন হতে থাকে, সত্যাশ্রয়ীরা আখ্যা পায় অত্যাচারীরূপে।

সেই ইতিহাসের অন্ধকারেই আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যদিও সত্যের নাগাল পাওয়া কঠিন। তবে ইতিহাসের দিক-নির্দেশনা চিহ্নগুলোকে অবলম্বন করে সামনে অগ্রসর হলে অবশ্যই সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে, বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো সত্যের উপাদানগুলো একত্রিত করতে পুরো ঘটনা পূর্বাপর বেরিয়ে আসবে, খসে পড়বে মিথ্যার পলেস্তরা। তখন মাটিচাপা সত্য জীবন্ত হয়ে দেখা দেবে। একটু অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায়, ইতিহাসকে মিথ্যার আবর্জনা দিয়ে চেপে রাখা যায় না, কীর্তিকে কলমের খোঁচায় মিটিয়ে দেয়া যায় না, জীবনত্যাগী শহীদ ও মজলুমদের আর্তনাদ ভুলে থাকা যায় না। কান পেতে শুনলে মাটি সত্য কথা বলে, সত্যাশ্রয়ীদের রক্তের উষ্ণতা অনুভব করা যায়, মজলুমের আহাজারি আজো ইথারে ভেসে বেড়ায়। এ সবকিছু অনুধাবন ও উদ্ধার করার জন্যে দরকার ঈমানদীপ্ত অনুভূতি, আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত হৃদয়। ইথারে ভাসমান সেসব ঈমানদীপ্ত বীর সেনানীদের ঈমান জাগানিয়া তকবীর ধ্বনি, বেঈমানদের প্রতি তেজদীপ্ত-হুংকার ও তরবারীর ঝনঝনানি হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে থাকতে হবে হৃদয় খাঁচায় হেরার নূরের জ্যোতি। হৃদয়ে ঈমানের দ্যুতিহীন আল্লাহ্র অভিশপ্ত সে সব মানব-পশুদের দলে থেকে মুমিন ও বেঈমানদের মধ্যে পার্থক্য পরখ করা অসম্ভব। যেহেতু আল্লাহ্ নিজেই ওইসব মিথ্যাবাদীদের আখ্যা দিয়েছেন পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে। ঘোষণা করেছেন, "যারা সত্য বিমুখ ওদের কানে সীসা ঢেলে দেয়া হয়েছে, ওদের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়া হয়েছে, ওরা দুনিয়াতেও ঘৃণিত অপমানিত আর আখেরাতেও ওদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। মহান আল্লাহ্ ভালো জানেন, আখেরাতের শাস্তি কতো যন্ত্রণাদায়ক।"

৯৪০ সালের দু'চার বছর আগে বা পরের ঘটনা। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক ইরানের বাদশাহ নওশেরোয়ার শাসন অতীত হয়ে গেছে। ইরানের ক্ষমতার সিংহাসনে যারা আসীন হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি তাদের চরম অনাগ্রহ। তারা ক্ষমতাপ্রিয়, ভোগ ও বিলাস-ব্যসনে মনোযোগী। তারা নিজেদের মনে করতো দেশের মালিক-মোখতার আর সাধারণ জনগণকে ভাবতো তাদের প্রজা-দাসানুদাস। প্রজাদের বেলায় ন্যায় ও আদল-ইনসাফের নীতিবাক্য তারা ছিঁড়ে ফেলে মানুষকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করার সব ধরনের ব্যবস্থাই রপ্ত করেছিল। তাদের নীতি ছিল, প্রজাদের ভুখা রাখো, ওদের মুখ বন্ধ করে দাও,

সত্যকে গলা টিপে মেরে ফেলো। সুবিচার ও রাজ সুবিধা ওদের দাও যারা শাসকদের গুণ গায়, রাজ্য জুড়ে তোষামুদে তৈরি কর। মোসাহেব ও তোষামোদকারীদের মধ্য থেকে উজির নাজির বানাও। প্রজাদের অবস্থা এমন করে রাখো, যাতে মানুষ কুকুরের মুখ থেকে হাড্ডি ছিনিয়ে নিয়ে সন্তানের আহার যোগাতে বাধ্য হয়। ইরানের শাসকেরা বাদশাহ্ নওশেরোয়ার বপিত ইনসাফের বৃক্ষকে উপড়ে ফেলে দিয়ে ইরান থেকে ইনসাফ ও সুশাসন বিদায় করে ন্যায় ইনসাফের প্রতীক নওশেরোয়ার বংশধরদেরকেও ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য করে। জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নওশেরোয়ার অধঃস্তন পুরুষেরা ইরান ছেড়ে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষমতার মসনদ থেকে ছিটকে পড়ে নওশেরোয়ার বংশধরেরা জীবন বাঁচানোর তাকিদে যে দিকে পারল বেরিয়ে পড়ল। জীবন-জীবিকার যাতনা ও দুর্ভোগ তাদের স্থান থেকে স্থানান্তরে যাযাবরে পরিণত করলো।

যারা ছিল ন্যায়ের ঝাণ্ডাবাহী, তারা অন্যায় ও জুলুমের যন্ত্রণায় দূর দেশে পাড়ি জমাল। তাদের বয়স্করা দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিল। শিশুরা বড় হতে লাগল অতি কষ্টে। আর এ দুরবস্থার মধ্যেই নওশেরোয়ার বংশে আরো নতুন নতুন শিশুর জন্ম হতে থাকল।

এই বংশের এক টগবগে যুবক কিবারুল হাকাম বিন কিরার আরসালান। মাঝারী গড়ন, দীপ্তিময় চেহারা— চেহারায় উচ্চ বংশের ছাপ পরিস্ফুট কিন্তু দারিদ্র্যের মলিনতায় বংশীয় আভিজাত্যের পেলবতা দূরীভূত।

বুখারার এক মেঠো পথে নতুন ঠিকানার উদ্দেশে চলছে যুবক। ক্লান্ত শ্রান্ত কিরার আল হাকাম একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। জায়গাটি জঙ্গলাকীর্ণ, ঝোপঝাড়ে ভরপুর। কানে ভেসে আসছে ছোট শিশু-কিশোরদের হৈ চৈ। আল হাকামের দৃঢ় বিশ্বাস, ওপাশে হয়তো কোন যাযাবর দল তাঁবু ফেলেছে। ক্লান্ত আল হাকাম মাথার নীচে কাঁধের পুটলিটা রেখে শুয়ে পড়ল।

কচি শিশুরা হৈ চৈ, খেলাধুলা ও দৌড়-ঝাপে মগ্ন হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এলাকাটা নীরব নিস্তব্ধ। দুপুর গড়িয়ে তখন পড়ন্ত বেলা। গুন গুন একটি মিষ্টি আওয়াজ আল হাকামকে মুগ্ধ করল। তখনও সে বুঝে উঠতে পারছিল না, আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে, এটি কিসের আওয়াজ! কিন্তু তার মনের কোণে আওয়াজটা হঠাৎই কেমন যেন নাড়া দিল। গভীরভাবে কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করল আল হাকাম। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠলো গুঞ্জরণ। আর কিছু নয়, তিলাওয়াত। কোন নারী কণ্ঠের আওয়াজ। গভীর মনোনিবেশে মনের মাধুরী

মিশিয়ে তিলাওয়াত করছে কোন নারী। আওয়াজের ধরন থেকেই আল হাকাম বুঝতে পারলো, এটা বয়স্ক নারী কণ্ঠ নয়, কোন কিশোরী-যুবতীর কণ্ঠ। বেশ সুন্দর। পড়ন্ত বেলায় এই বিজন এলাকায় কিশোরীর তিলাওয়াত অপেক্ষাকৃত দূর থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আল হাকাম।

আল হাকাম আর শুয়ে থাকতে পারল না। শরীরের ক্লান্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বেশ ফুরফুরে লাগছে তার। তাড়াতাড়ি হেঁটে ঝোপঝাড়ের এপাশটা ঘুরে আওয়াজটার দিকে এগিয়ে দেখল, তিন-চারটে ছেড়া ফাড়া কাপড়ের তাঁবু টাঙ্গানো। কাছেই একটি কিশোরী কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন। কণ্ঠ যেমন মধুর, কিশোরী দেখতেও তেমনটি হৃদয়কাড়া। তাঁবু থেকে একটু দূরে দুই বুড়ো বসে রশি পাকাচ্ছে। তাঁবুর অন্য পাশে ক'জন মহিলা আর কয়েকটি ছোট শিশু। কজন শক্ত সামর্থ্য পুরুষও আছে।

কিরার আল হাকামকে আসতে দেখে সবাই তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। লম্বা লম্বা পা ফেলে আল হাকাম তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

"আপনাদের এ মেয়েটি একটি আয়াত ভুল পড়েছে"। বুড়োদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল আল হাকাম।

"আপনারা অনুমতি দিলে আমি তার ভুল শুধরে দিতে পারি।"

"ও কি ভুল শুদ্ধ পড়েছে আমরা শুনিনি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।" বলল এক বুড়ো।

"আপনাদের শোনা উচিত। কোত্থেকে এসেছেন আপনারা?" জিজ্ঞেস করল আল হাকাম

"আমরা তুর্কী। তুর্কী মুসলমান।" এক বুড়ো বলল।

তা তো আপনাদের দেখেই আমি বুঝতে পারছি আপনারা মুসলমান। ঠিক আছে আমি আগে ওর ভুলটা শুধরে দেই।

ধীর পায়ে এগিয়ে তেলায়াতকারী কিশোরীটির কাছে গিয়ে বসল আল হাকাম। অজ্ঞাত কেউ কাছে বসছে ঠাহর করে কিশোরী মুখ ফেরাল এবং কুরআন শরীফ পড়া বন্ধ করে দিল। অচেনা পুরুষকে কাছে বসতে দেখে সে জিজ্ঞাসুনেত্রে বুড়োদের দিকে তাকাল। তার চোখের চাওনিতে অপার জিজ্ঞাসা, কে এই পুরুষ এভাবে তার কাছে এসে আসন গ্রহণ করল?

আল হাকাম কোন ভণিতা না করেই বলল, "কুরআন শরীফ খোল। তুমি এক জায়গায় ভুল পড়ছিলে"। কিশোরী সে আয়াত থেকে আবার তিলাওয়াত করেও ভুল পড়ল।

আল হাকাম তার ভুল শুধরে দিলো। নিজের ভুল ধরতে পেলে কৃতজ্ঞচিত্ত দৃষ্টিতে কিশোরী আল হাকামের মুখের দিকে তাকাল।

এই আয়াতের অর্থ জানো?

কিছু কিছু বুঝি, পরিষ্কার না, লাজনম্র ভাষায় বলল কিশোরী। আমাদের সাথে এক বুযুর্গ ব্যক্তি থাকতেন। তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়েছেন, অর্থও শিখাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাপের দংশনে তিনি মারা গেছেন। এখন আমি কিছু কিছু অর্থ বুঝি কিন্তু সব আয়াতের অর্থ বুঝি না।

আমার কাছে শোন! আমি তোমাকে অর্থ বলে দিচ্ছি :

"ইবরাহীমকে স্মরণ কর, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, আপনি এমন সব জিনিসের পূজা করেন, যেগুলো কোন কিছু শুনতে পারে না। আমার কাছে এমন তথ্য আছে যা আপনার জানা নেই। আপনি আমার কথা মানুন, আমি আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিব।"

আল হাকাম কিশোরীকে পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার পর বলল, সামনের আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

"অতঃপর ইবরাহীম যখন ওসব মূর্তি ও মূর্তিপূজারীদের থেকে ভিন্ন হয়ে গেলেন, তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছি এবং সবাইকে নবী বানিয়েছি।"

তুমি জানো, এখানে আল্লাহ্ তায়ালা কোন্ ঘটনা বললেন? ওরা মূর্তি পূজা করতো আর ওই সব মাটির মূর্তির কাছে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করতো। তুমি তো জানো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।

আল হাকাম কিশোরীকে বলছিল, যেসব মূর্তি কিছু বলতে পারে না, শুনতে পারে না, কিছু করতে পারে না পৌত্তলিকরা সে সবের পূজা করে, আসলে সবই ওদের হাতে তৈরি মাটির পুতুল।

আল হাকামের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল কিশোরী, আর তন্ময় হয়ে শুনছিল তার কথা। মুখে কোন শব্দ ছিল না। তার হৃদয় মনে অনাবিল আনন্দের ঢেউ তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। গোত্রের অন্যান্য পুরুষও ইতোমধ্যে আল হাকামের পাশে এসে বসে গেল।

হঠাৎ গমনোদ্যত হলো আল হাকাম। পা বাড়াল চলে যাওয়ার জন্য। বুড়োরা তাকে থামাল। কিশোরীর কাছ থেকে একটু দূরে বড়দের আগের জায়গায় গিয়ে বসল সে।

তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? কোথায় যাবে? জিজ্ঞেস করল এক বুড়ো।

ইরানের মাটি আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বলল আল হাকাম। যাদের বাপ-দাদা ন্যায়-ইনসাফের দ্বারা ইরানের মানুষকে দিয়েছিল সীমাহীন মর্যাদা, যারা মানুষের জন্য ইরানকে পরিণত করেছিল সুখের ঠিকানা, তাদের সন্তানেরা আজ জঙ্গলের জীবজন্তুর মতো বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তো কোন কীট-পতঙ্গ ছিলাম না যে, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে ঝাড়জঙ্গলে বসবাস করবো, কিন্তু তিন চার পুরুষ যাবত আমাদের তাই করতে হচ্ছে। জালেমদের অত্যাচার ও জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের খান্দান যাযাবরে পরিণত হয়েছে। যেদিকে যখন মন চায় সে দিকে চলতে থাকে।

তুমি কি বলতে চাচ্ছো, তুমি ন্যায় শাসক নওশেরোয়ার বংশধর? বলল এক বুড়ো।

আমাদের বাপ-দাদার মুখে তার অনেক কিচ্ছা-কাহিনী শুনেছি, কিন্তু আমাদের কাছে ওই সব কাহিনী রূপকথার গল্পের মতো মনে হয়।

আচ্ছা, তোমরা কোথায় তাঁবু ফেলেছো? জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রশ্ন করল অপর বুড়ো।

'আমি একা'। বলল আল হাকাম।

ছোটবেলা থেকেই কুরআন শরীফের সাথে আমি জীবনের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটিয়েছি।

তোমার কথা দারুণ সুন্দর। বলল এক বুড়ো। যদি থাকতে চাও আমাদের সাথে থাকতে পারো, আর যেতে চাইলেও অন্তত একদিন আমাদের এখানে আতিথ্য গ্রহণ করো।

আজ রাতটা এখানেই থেকে যাওয়ার চিন্তা করল আল হাকাম। খুব একটা জ্ঞান-গরীমাওয়ালা লোক নয় আল হাকাম, কিন্তু যাযাবরদের কাছে আল হাকামকে মনে হলো বুযুর্গ লোক। থেকে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার পর তার পাশে দাঁড়ালো সবাই।

আল হাকামের কথা সবাইকে রূপকথার গল্পের মতো স্বপ্নালোকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই বিকেল থেকে রাত অবধি একনাগাড়ে তার কথাই শুনছিল তাঁবুর সব লোক।

রাত যখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গভীর হতে থাকল, একজন দু'জন করে উঠতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত যুবক, পৌঢ়, শিশু-কিশোর, মহিলা সবাই তাঁবুতে চলে

গেল। বুড়ো দু'জন খোলা আকাশের নীচে বিছানা পেতে আল হাকামের কাছেই শুয়ে পড়ল। নানা কথার ফাঁকে দু'বুড়ো জোর দিয়ে বলল :

'তুমি আমাদের সাথে থাক।'

আল হাকাম ভাবছিল, ওরা কেন তাকে তাদের সাথে থাকতে বলছে। আল হাকামের মনের কোণে কিশোরীর শান্ত সৌম্য কান্তিময় চেহারা উঁকি মারল। কিন্তু বেশি ভাবনায় না গিয়ে সরাসরি বুড়োদের জিজ্ঞেস করে বসল আল হাকাম:

"আমার দ্বারা কি আপনাদের কোন কাজ হবে?"

আমাদের গোত্রে পুরুষ কম, মহিলা বেশি। পুরুষ বেশি থাকতে সুবিধা। আমাদের নানাবিধ ভয়। জঙ্গলের হিংস্র জীব-জন্তুই নয় এর চেয়েও হিংস্র মানুষ-লুটেরা, ডাকুদের ভয়টা বেশি। ওই যে মেয়েটা, ওকে নিয়ে আমাদের ভীষণ দুশ্চিন্তা। আমাদের দলে কোন অবিবাহিত পুরুষ নেই। বড়দের সবার বউ আছে, আর বাকীরা ছোট। এই মেয়েটার জন্য কোন বর পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা আমাদের ঘাড়ে কঠিন দায়িত্বের বোঝা হয়ে আছে। বলল এক বুড়ো।

'ওকে তো তুমি দেখেছো, ওর কুরআন পড়া শুনেই তো তুমি এদিকে এলে। ওর রূপও হয়তো দেখে থাকবে তুমি। তুমি আমাদের সাথে থাক, আর ওই মেয়েটাকে বিয়ে কর।' বলল অপর বুড়ো।

'আমি ছাড়া আর কোন মানুষ কি আপনারা পাননি? আর কোন মানুষের কাছে কেন ওকে বিয়ে দেননি? নাকি আমিই আপনাদের কাছে আসা প্রথম পুরুষ ব্যক্তি?'

অনেক লোকই এসেছে। ওকে নিয়ে কাড়াকাড়িও হয়েছে বেশ। কিন্তু ওদের সবাই ব্যবসায়ী। মেয়েটাকে কিনে নিতে চাইলো। কে কার চেয়ে বেশি দেবে এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ওকে নিয়ে বিবাদও পর্যাপ্ত হয়ে গেছে। আমরা একবার ব্যবসায়ীদের হাতে ওকে তুলে দেয়ার চিন্তাও করেছিলাম। কিন্তু মেয়েটা বড়ই জেদি। এমন করলে সে আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি দিল। এরপর এ সিদ্ধান্ত বাদ দিলাম।

সেই সময় অবাধে নারী কেনা-বেচা হতো। ধনাঢ্য ও আমীর-উমরা পছন্দমতো নারীদের টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিজেদের হেরেম গুলজার করতো। ইরানী বেদুঈন ও যাযাবর মেয়েদের অঙ্গসৌষ্ঠব, রূপলাবণ্য, সৌন্দর্য কিংবদন্তিতুল্য। এ জন্য এ ধরনের যাযাবর গোত্রে নারীলোভীরা মেয়ের তালাশ করতো। মেয়ে বেচা-কেনা করা বেদুঈন ও যাযাবর গোত্রের মধ্যে কোন দোষণীয় ছিল না। অনেকটাই রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। রীতিমতো মানুষ

কেনা-বেচার হাট বসতো। ওসব হাটে সব ধরনের নারী-পুরুষ বেচা-কেনা হতো। যুবতী নারী ও বালক-বালিকাদের সরবরাহ আসত ডাকাতদের কাছ থেকে। ওরা মুসাফিরদের আক্রমণ করে ধন-সম্পদ ও ছোট ছেলে-মেয়ে ও যুবতী মেয়েদের অপহরণ করে বাজারে এনে বিক্রি করে দিতো। ওসব হাটের সুন্দরী যুবতী-কিশোরীদের কদর ছিল বেশি। অধিকাংশ আমীর ক্ষমতাবান লোকেরা সুন্দরী মেয়েদের চড়া দামে খরিদ করে নিজেদের হেরেমের শোভা বর্ধনা করতো। শরিফ মেহমানদের মনোরঞ্জন, আপ্যায়ন ও নিজেদের সেবা-যত্নের কাজে, আত্মদৈহিক মনোরঞ্জনে ব্যবহার করা হতো এদের। ক্ষমতার মসনদে থাকা লোকদেরকেও স্বার্থান্বেষী মহল সুন্দরী যুবতী উপঢৌকন দিতো।

কোন যাযাবর বেদুঈন মেয়ে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এমন তো শুনিনি। আপনারা ওর কথা মেনে নিলেন কেন?

ও এমন সব কথা বলে যে, এতে আমাদের ভয় হয়। বলল এক বুড়ো।

তুমি হয়তো জানো, আমাদের মতো ছন্নছাড়া মানুষের মধ্যে ধর্ম-কর্ম তেমন থাকে না। কোন মানুষ যদি সুন্দরী মেয়েকে চড়া দামে বিক্রি করে দিতে পারে, নিজ স্ত্রীকেও বেশি টাকা পেয়ে তালাক দিতে পারে, তার আর ধর্ম থাকে! কিন্তু আমরা মুসলমান। ধর্ম-কর্ম ঠিকমতো পালন না করলেও খোদার ভয় তো আছে। আমরা কুরআন কিতাব ভয় করি। মরণেরও ভয় আছে। এই মেয়েটা কুরআন পড়ে। ও আমাদের বলেছে, সে নাকি সাদা শুভ্র দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেছে। তিনি তাকে বলেছেন, "তুমি কখনও কোন ব্যক্তির কেনা দাসী হবে না। তুমি বিয়ে করে কারো স্ত্রী হবে। তোমার পেটে এমন এক সন্তান জন্ম নেবে যে পথ ভোলা বিভ্রান্ত মানুষকে ধর্মের সঠিক পথ দেখাবে, দুঃখী মানুষের সেবা করবে।"

ওকি প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখে? আমিও মাঝে মধ্যে এ ধরনের স্বপ্ন দেখি। বলল আল হাকাম।

দুই চাঁদ আগের ঘটনা। আমরা মেয়েটিকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। ক্রেতার হাতে পুরো দাম ছিল না। আমরা মেয়েটির বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দাবী করেছিলাম। বিক্রির কথা শুনে মেয়েটি বলছিল, আমি পালিয়ে যাব।

ওর পালানোর কথা শুনে রাতে ওর তাঁবুর বাইরে দু'জনকে পাহারা দিতে বললাম। ওর পালানোর পথ আটকে দেয়ার কথা শুনে বলল, "আমার উদর থেকে কোন হারামজাদার জন্ম হবে না। জীবন থাকতে আমি তা হতে দেবো না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মধ্যরাতে মেঘের গর্জনে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রচণ্ড ঝড় আর ভারী বর্ষণে আমাদের সব তাঁবু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। বিজলি আর আকাশের ভয়ঙ্কর গর্জনে আমরা ভড়কে গেলাম। বিজলির ঝলকানি আর মেঘের গর্জনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতে লাগল। হঠাৎ করে বিজলি থেমে গিয়ে ঘন অন্ধকার নেমে এলো। আমরা নিজের হাতটাও ঠাহর করতে পারছিলাম না। ভয়ে আতঙ্কে ছোট ছেলে-মেয়ে, নারী-শিশু চিৎকার জুড়ে দিল। কোলের বাচ্চাগুলোকে বড়রা বুকে চেপে ধরে জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করল। কিন্তু আকাশের বিকট গর্জন আর ঝড়ের তাণ্ডবে বড়রাও ভয়ে কাঁপছিল। বিজলির এককটা ঝলকানিতে মৃত্যুর সাক্ষাত পাচ্ছিলাম আমরা। অথচ এই মেয়েটি ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন। আমরা যখন জীবন বাঁচানোর কোন আশ্রয় পাচ্ছিলাম না, সে তখন একটি তাঁবু ধরে অবিচল বসেছিল। এমন সময় একটি গাছের ডাল এসে আমাদের সামনে ভেঙে পড়ল। মৃত্যু আশঙ্কায় সবাই এক সাথে চিৎকার করে উঠল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মরণ থেকে লুকাতে চাচ্ছিল। কিন্তু এই মেয়েটি নির্ভয়ে চিৎকার করে বলছিল, 'কেউ আযান দাও আর বাকীরা যে যেখানে আছো সে জায়গায় লুটিয়ে পড়।' তিনজন ওর কথামতো আযান দিতে শুরু করল। বাকীরা প্রলয়ঙ্করী ঝড়-বৃষ্টিতে কাদা-পানির মধ্যেই সে জায়গায় লুটিয়ে পড়লো। আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা...।

অনেকক্ষণ পর তুফান থামল। এর চেয়েও তীব্র তুফানের মুখোমুখি আমরা হয়েছি কিন্তু এমন আতঙ্কিত হইনি কখনো। মাথার উপরে আসমান ও পায়ের নীচে মাটি, এই তো আমাদের ঠিকানা। আসমান তার অফুরন্ত নেয়ামত দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে সহযোগিতা করে আবার কখনো আমাদের উপর দুর্ভোগও চাপিয়ে দেয়। আসমান-জমিনের আপতিত এসব সুখ-দুঃখ মিলিয়েই আমরা বেঁচে আছি। এসবে কখনও ভীত হই না, কিন্তু ওই রাতের ঝড়-বৃষ্টি ছিল ভয়ঙ্কর, তার চিত্র ছিল ভয়াল। আমরা সেই ঝড়কে এই মেয়ের অভিশাপ মনে করছিলাম।

রাত পোহাল। সবাই তখনও কাঁপছে। ভয়ে-আতঙ্কে সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, কারো মুখে রা' করার হিম্মতটুকু ছিল না। এই মেয়েটি আমাদেরকে চোখ উল্টে উল্টে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু দূরে সরে গেল। আমরাও লজ্জায় ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। ওর হুঁশিয়ারী আমাদের কানে বাজছিলো : 'আমার উদরে কখনও হারাম সন্তান আসবে না, এর অপচেষ্টা করলে তোমরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।' তখনও সে কুরআন শরীফ বুকে চেপে রেখেছিল আর অনুচ্চস্বরে কি যেন পড়ছিলো...।

আমরা ছেঁড়া-ফাড়া তাঁবুগুলো আর বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র একত্র করে শুকানোর ব্যবস্থা করলাম। বেলা চড়লে দুই অশ্বারোহী এসে হাজির হলো। তারা আমাদের প্রত্যাশিত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এলো। মুদ্রা ভর্তি থলে আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে মেরে বলল, "এই দিনারগুলো নাও আর মেয়েটিকে আমাদের হাতে তুলে দাও।"

আমি থলেটি তুলে এক অশ্বারোহীর হাতে দিয়ে বললাম, "তোমরা দিনার নিয়ে চলে যাও, আমি মেয়ে দিতে পারব না।"

অপর আরোহী আরো দু'টি দিনার আমার পায়ের দিকে ছুঁড়ে বলল, "আরও চাইলে বল। যা চাও তাই দেবো তবুও মেয়েটিকে আমাদের দিতেই হবে।" কিন্তু মেয়েকে তাদের হাতে না দিয়ে ফিরিয়ে দিলাম।

"ও কার মেয়ে?"

"মেয়েটি আমার ভাতিজী, এতীম। " শ্বেতশ্মশ্রুধারী বুড়ো বলল।

আল হাকাম দু'হাত দেখিয়ে বলল, আমার হাত খালি, মেয়ের দাম দেয়ার মতো কিছুই আমার হাতে নেই। আপনারা কি আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনা দামে আমাকে মেয়ে দেবেন?

আমাদের সাথে তোমাকে থাকতে হবে। প্রতি রাতেই ডাকাতের আক্রমণাশঙ্কা থাকে। তুমি থাকলে পুরুষের সংখ্যা বাড়বে। পুরুষের সংখ্যা বেশি থাকলে ভয় কম থাকে। এই মেয়েটাকে যে কত লুকিয়ে-ছাপিয়ে এ পর্যন্ত রেখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। ভারী গলায় বলল পক্বকেশী বুড়ো।

বুড়োর প্রস্তাবে সম্মত হলো আল হাকাম। সেই মেয়েটির সাথে বিয়ে হয়ে গেল আল হাকামের। বেদুইন যাযাবরদের বিয়ে। কোন আয়োজন প্রস্তুতি নেই। বড়দের সিদ্ধান্ত আর পাত্রের আগ্রহ এই যথেষ্ট। অধিকাংশ যাযাবর মেয়েদের সতীচ্ছেদ ঘটে বিয়ে ছাড়াই। হয়তো ডাকাতের হাতে, না হয় কোন বেশি দামের ক্রেতার শয্যায়। বিবাহকালীন ধুমধাম আহার আয়োজনও ওদের সমাজে নেই।

"আমার জীবন ও স্বাধীনতার বিনিময়ে তোমাকে পেলাম। তোমাকে দাসী করার পথ বন্ধ করে নিজে গোলাম হয়ে গেলাম।" প্রথম রাতেই স্ত্রীকে বলল আল হাকাম।

"আমি বন্দীদশায় থাকার মানুষ নই। তোমার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গেছি একথাও ঠিক নয়। তোমার চাচা তোমার আদি-অন্ত সব কাহিনী আমাকে শুনিয়ে তোমাকে বিয়ে করে এখানে থাকতে প্রস্তাব করলো, তাৎক্ষণিক তোমার ইজ্জত

ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি মমত্ববোধ আমাকে রাজী হতে বাধ্য করেছে। যদি কখনও আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই তুমি আমার সাথে যাবে?"

"আমি আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমার জীবন-মরণ আপনার হাতে। এরা আর আমাকে বন্দী করে রাখতে পারবে না। আপনাকে প্রথম দেখাতেই আমার মন বলছিল, এই লোক যদি তোমাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তুমি গ্রহণ করতে পার।"

শুনেছি, এক শ্বেতশুভ্র-শ্মশ্রুধারী লোক নাকি তোমাকে স্বপ্নে বলেছিল যে, এমন এক সন্তান তুমি জন্ম দেবে যে পথভোলা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথের দিশা দেবে।

সে খিলখিলিয়ে হেঁসে উঠল। বললো, এটা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আকাঙ্ক্ষাটা এমনভাবে আমার মধ্যে শিকড় গেড়েছিল যে, আমি নিজের কানে শুনতে পেতাম, "তোমার কোলে এমন শিশু জন্ম নেবে যে সত্যের পথে এতো খ্যাতি অর্জন করবে পৃথিবীর মানুষ তাকে চিরকাল স্মরণ রাখবে।"

তুমি জানো না, হত-দরিদ্র ঘরের সন্তানেরা মিথ্যা বিনাশী হয় না, পেট পূজারীই হয়ে থাকে। এটা তোমার অলীক আকাঙ্ক্ষা। এই অসম্ভব কল্পনা ছেড়ে নিজে সত্য পথের উপর থাকো এটাই যথেষ্ট। আমাদের সন্তান আমাদের মতোই যাযাবর হবে, নয়তো কোন আমীরের ঘরে নোংরা কাজের চাকর হবে।

"আমি কি অবাস্তব কল্পনা করছি? আমার এই আকাঙ্ক্ষা কি অসম্ভব?"

"যে আকাঙ্ক্ষা অবাস্তব, তা কল্পনা হয়ে মানুষের মনে সুখ দেয়।" বলল আল হাকাম।

"সেদিন আপনি আমার ভুল শুধরে দেয়ার জন্যে এসেছিলেন। আপনি আমাকে আয়াতের তরজমায় বলেছিলেন, 'ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, আপনি কেন মূর্তিপূজা করেন, যেগুলো কিছু শোনে না, বলতে পারে না, করতে পারে না, আপনি আমার সাথে আসুন, আমি আপনাকে সত্য পথ দেখাব।' সে কথাগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। এরপর আমি কুরআন পড়তে বসলেই আমার কানে শুধু একথাই বাজে– তুমি এক ইবরাহীমকে জন্ম দেবে। আমি রাতে নূরানী চেহারার এক সৌম্য কান্তিময় ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি আপনার মতোই আমার ভুল শুধরে সেই আয়াতটিই পড়াচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, সুন্দর ফুটফুটে অথচ নির্বোধ সন্তান হলে তুমি বেশি খুশি হবে না কদাকার কিন্তু বুদ্ধিমান সন্তান পেলে সুখী হবে? আমি সেই বুযুর্গ ব্যক্তিকে বলেছি, আমি ইবরাহীমের মতো এমন সত্যের বাহক সন্তান চাই যাঁর পিতা

বিপথে থাকলেও পিতাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে না। আর মেয়ে হলে যাতে এমন কদাকার হয় যে, কোন ডাকাতের দৃষ্টি ওর প্রতি না পড়ে, কেউ ওকে কিনে নিতে না চায়।"

"তোমার মধ্যে তোমার গোত্রের রীতিনীতি বিরোধী স্বভাব কি করে এলো? যাযাবরদের মেয়েরা তো বিক্রি হতে অপছন্দ করে না।"

"জানি না আমার মধ্যে কীভাবে এ আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিলো যে, 'তুমি বিয়ে করে একজন পুরুষের স্ত্রী হিসেবে থাকবে।' একথা আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। আমার কল্পনাই আমার কানে বাজতো। হৃদয়ের একথা শুনতে শুনতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, আমার আকাঙ্ক্ষা সফল হবে।"

"তোমার অনাগত সন্তান বড় হয়ে বিখ্যাত হবে এমন অলীক কল্পনা মন থেকে দূর কর। এ স্বপ্ন তোমার মাথা খারাপ করে ফেলবে।" বলল আল হাকাম।

বংশ ধ্বংসের ভয় ও রাতের প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, আকাশের গর্জন কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু দুই অশ্বারোহী দিনার ভর্তি থলে নিয়ে এসে ঠিকই কিশোরীর জন্য সাক্ষাত আপদ হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। আকস্মিক এই ঝড়-বৃষ্টি, আকাশের গর্জন অসহায়-অবলা এক কিশোরীর সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক কিশোরীর মান রক্ষায় এগুলো বেশ কাজ করেছে। আল হাকাম বাস্তববাদী মানুষ। সে এগুলোকে অলৌকিক কিছু মনে করেনি, ভিত্তিহীনও ভাবেনি। তবে যে বিষয়টি তাকে নাড়া দিয়েছে তা হলো, এ কিশোরী সত্যিকার অর্থে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র মনের অধিকারিণী। ওর দৈহিক রূপলাবণ্যের চেয়েও আত্মিক সৌন্দর্য অনেক বেশি।

বিয়ে করে আল হাকামও যাযাবরদের সাথে মিশে গেল। কেটে গেল অনেক দিন। দু'বছরের মাথায় তাদের একটি ছেলে জন্ম নিল। আল হাকাম ছেলের নাম রাখল "সুবক্তগীন"। ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার স্ত্রীর স্বপ্ন আরো দৃঢ় হলো। তার বিশ্বাস, এই ছেলে বিখ্যাত হবে। আল হাকাম তার স্ত্রীর কথা শুনে সময় সময় হাসতো। একদিন স্ত্রী আল হাকামকে জিজ্ঞেস করল, "এই ছিন্নমূল যাযাবর জীবন কি এখন আর আপনার বিরক্তিকর লাগে না?"

"আমার মধ্যে এ জীবন নিয়ে এখন আর কোন অস্বস্তি নেই। কিন্তু আমার ছেলেকে আমি এই জংলী জীবন থেকে দূরে নিয়ে যাবো। জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কি কোন সভ্য মানুষের জীবন হতে পারে?" বলল আল হাকাম।

"আমার বিশ্বাস ছিল, এ আশাও এখন আমার পূর্ণ হবে যে, আমার কোলের সন্তান লেখাপড়া শেখার মতো জায়গায় পৌঁছতে পারবে। অবশ্য আমি তোমার মতো দুনিয়ার কোথায় কি আছে জানি না।" বলল হাকামের স্ত্রী।

"কোন আমীর-শরীফ লোকের ঘরে মজদুরী তো মিলতেই পারে। খোদার জগত তো আর ছোট্ট নয়। যে আল্লাহ্ তোমাকে বাচ্চা দিয়েছেন তিনি তার রিযিকের ব্যবস্থা করেই রেখেছেন।" বলল আল হাকাম।

"লুকিয়ে ছাপিয়ে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।" বলল আল হাকামের স্ত্রী। এই গোত্রের লোকেরা তোমাকে এমনিতে যেতে দেবে না। কারণ, তুমি টাকা ছাড়াই বিয়ে করেছো, এর বিনিময়ে তোমাকে পেয়ে ওদের শক্তি বেড়েছিল অনেক। আমি তোমাকে একটা ফন্দির কথা বলি, "আগামীকাল আমরা লাকড়ি কুড়াতে বের হয়ে আর ফিরে আসবো না।"

স্ত্রীর কথামতো পরদিন তারা গোত্রের অন্যদের মত কাঠ কুড়ানোর কথা বলে ছেলেকে সাথে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ছেলের বয়স তখন ছয় মাস মাত্র।

দুপুর গড়িয়ে গেল। তখনও তাদের তাঁবুতে ফেরার নাম নেই। বুড়োদের সন্দেহ হলো। শক্ত সামর্থ্য দুই ব্যক্তি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওদের খোঁজে। বুড়োদের সন্দেহ ছিল বিবিধ। আল হাকামের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তো ছিলই তার চেয়ে বেশি ছিল সুন্দরী ওই যুবতী অপহরণের শিকার হওয়ার। তারা আশঙ্কা করছিল, না জানি কোন ডাকাতের পাল্লায় পড়ল কিনা ওরা। দৈবাৎ এক পথিক সন্ধানী-অশ্বারোহীদের বললো, এক যুবককে সুন্দরী যুবতী ও একটি শিশুকে নিয়ে সে নদীর দিকে যেতে দেখেছে।

সন্ধানকারীরা পথিকের কথা মতো ওদিকেই ঘোড়া হাকিয়ে দিল, তাদের সন্দেহ ছিল, আল হাকাম হয়তো তাদের মেয়েটিকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আল হাকাম ও তার স্ত্রী হেঁটে যাচ্ছিল। পথ ছিল অসমতল এবড়ো থেবড়ো। তারা যে পথে যাচ্ছিল তার পাশেই ছিল নদী। হঠাৎ পিছন থেকে ঘোড়ার আওয়াজ শোনা গেল। পিছন ফিরে দেখলো, দুই অশ্বারোহী তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে। একটু অগ্রসর হলেই আল হাকাম তাদের চিনে ফেলল। আরোহীরা খাপ থেকে তরবারী বের করে আক্রমণোদ্যত হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। আল হাকাম নিরস্ত্র ছিল। এটা ছিল আল হাকামের মারাত্মক ভুল যে সে কোন অস্ত্র সাথে রাখেনি। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতাশার দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

“নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়।” বলল তার স্ত্রী।

“অনেক গভীর তীব্র স্রোত, ওরা তো ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেবে।” বললো আল হাকাম।

“আমি তোমাকে বলছি, তুমি নদীতে ঝাঁপ দাও! বাচ্চাকে তুমি বাঁচাও, ওকে ছাড়া আমি সাঁতরাতে পারব।” স্ত্রী কথাগুলো এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলল যেন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে বলছে।

“বেশি কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ ছিল না। আল হাকাম স্ত্রীর কোল থেকে সুবক্তগীনকে নিয়ে এক হাতে ওকে ধরে নদীতে ঝাঁপ দিল। এক হাতে সাঁতরাচ্ছিল আল হাকাম। স্ত্রীও তার সাথে সাথেই সাঁতরে ওর পাশাপাশি থাকতে চেষ্টা করছিল। নদী ওই দিকেই প্রবাহিত হচ্ছিল যে দিকে যাত্রা করেছিল তারা। সন্ধানী অশ্বারোহীরা এদের নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখে তীরে ঘোড়া থামাল এবং চিৎকার করে ওদের হুঁশিয়ার করল। কিন্তু ততক্ষণে ওরা নদীর মাঝামাঝি চলে গেছে। ভাগ্যক্রমে নদীর ওপারে গভীরতা কম ছিল। এক পা আর এক হাতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে অবশ হয়ে আসছিল আল হাকামের হাত-পা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে নিজেকে ও শিশুকে পানির উপর ভাসিয়ে রাখছিল। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হলো যে, আল হাকাম আর সাঁতরাতে পারছিল না। তার পা সোজা পানির তলদেশে তলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সে প্রাণপণ বাচ্চাকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে শরীরের শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করলেও বাচ্চা আর নিজের জীবনের আশঙ্কা দেখা দিল। প্রায় তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো আল হাকামের। হঠাৎ তার পা মাটি স্পর্শ করল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শুকুর আল্লাহ্‌র। নদীর কূল যেন তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এলো। গলা পানিতে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে দেখলো সে। এখনো অনেক দূরে। তলিয়ে যাচ্ছে, আবার হাত-পা ছুঁড়ে এগুতে চাচ্ছে। চিৎকার করে বলল আল হাকাম, “দাঁড়িয়ে যাও ওখানে, ওখানে পানি কম।” কিন্তু ওর কানে যাচ্ছিল না সেই ডাক। আল হাকামও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, স্রোতের তীব্রতায় শক্ত করে দাঁড়ানো অসম্ভব। আল হাকাম তবুও আগালো স্ত্রীর দিকে। ধরে ফেলল ওর চুলে, টান দিয়ে সোজা করতেই স্ত্রীর পা মাটি স্পর্শ করল। সেও দাঁড়াল। স্বপ্নে দেখার মতো তাকাল বাচ্চা ও হাকামের দিকে। যেন মরতে মরতে বেঁচে গেল। মুখে কোন কথা উচ্চারণ করা সম্ভব হলো না। নদীর এপারে এসে গেছে তারা। এখন আর পাকড়াও হবার ভয় নেই। পানি থেকে তীরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল স্ত্রী। আল হাকামও ছেলেটিকে কোলে শুইয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত উভয়ে। শরীরে হাঁটার মতো শক্তি তাদের নেই।

অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে তীর থেকে অদূরে শহরের দিকে তারা অগ্রসর হল। পৌঁছল শহরে। এখানকার লোকগুলো তাদের দিকে তাকাচ্ছিল চিড়িয়াখানার আজব চিড়িয়া দেখার মতো। বেশভূষায় এরা এ শহরে নবাগত, তাই দেখছিল সবাই। অনুন্নত কাপড়ে আচ্ছাদিত আল হাকামের স্ত্রী। তার রূপই ছিল এদের দৃষ্টি কাড়ার বড় কারণ। স্বামী-স্ত্রী হাঁটছিল লক্ষ্যহীন গন্তব্যে। গলির যুবক পুরুষেরা রূপসী এই যুবতী ও শিশুসহ আল হাকামের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষান্বিত হচ্ছিল ক্ষণিকেই। চোখ ফেরাতে পারছিল না আল হাকামের স্ত্রী থেকে অনেক কামুক পুরুষ।

আল হাকামের স্ত্রীর সৌন্দর্য তাৎক্ষণিক তাদের ফায়দা দিল। এক ধনাঢ্য ব্যক্তির আস্তাবলের নওকরী পেয়ে গেল আল হাকাম। আস্তাবলের পাশেই একটি ঝুপড়িতে থাকতে দিল তাদের। স্ত্রী ঝুপড়িতেই কোলের ছেলে নিয়ে সংসারের গোড়াপত্তন করল।

বেশি দিন আর ঝুপড়িতে থাকা হলো না হাকাম পত্নীর। ডাক এলো মহল থেকে। তাকে নিয়োগ দেয়া হলো মহলের পরিচারিকার পদে। পরদিন যখন আমীরের মহলে হাকামের স্ত্রী কাজের জন্য উপস্থিত হলো, তাকে এগিয়ে এসে নিয়ে গেল এক বয়স্কা মহিলা। মহিলা তাকে গোসল করাল এবং খুব দামী জরিদার শাহী জামা পরিয়ে দিল। জামার নক্শা-ই বলে দেয় এটা মামুলী পরিধেয় বস্ত্র নয়। এটা এমনভাবে ডিজাইন করা আর কাপড় এত পাতলা যে, শরীরের ভাঁজগুলো দেখা যায়। হাতে বাজু, গলা, বুকের অর্ধাংশ খোলা থাকে। হাকাম পত্নীর এসব কাপড় পরতে ভালো লাগছিল না। যাযাবর হলেও শরীর ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত ছিল হাকামের স্ত্রী।

মহিলাটা তাকে বোঝাল, আমাদের মালিক নোংরামি পছন্দ করেন না, তিনি পরিপাটি দেখতে অভ্যস্ত। এগুলোতে সেজে থাকলে তোমাকে দেখে খুশি হবেন। কাপড় গায়ে জড়িয়ে তাকে একটি আরশীর সামনে নেয়া হলো। আরশীতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই নিজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। নিজেকে শাহজাদী মনে হতে লাগল। তার চুল আঁচড়ে দেয়া হল। ছড়িয়ে দেয়া হল পিঠের উপর। মহিলা তার সারা শরীরে মনমাতানো সুগন্ধি ছিটিয়ে দিল। নতুন এই সাজে আল হাকামের স্ত্রীকে পরীর মতো মনে হচ্ছিল।

দেরী না করে মহিলা তাকে নিয়ে গেল মনিবের সামনে। বিশাল এক সুসজ্জিত ঘর। মেঝেতে এমন কার্পেট, সাজানো ঘর, ঝলমলে আলো দেখেনি জীবনে যাযাবর যুবতী। আমীর উমারার জীবন-জীবিকার গল্পেই যা শুনেছে।

আল হাকামের স্ত্রীকে দেখে আমীরের দৃষ্টি ওর শরীরেই আটকে রইল। ভূতে পাওয়ার মতো ওর দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ। নেশাগ্রস্তের মতো কণ্ঠে মহিলাকে বলল, তুমি যাও! মহিলা চলে গেল।

আমীর আল হাকামের স্ত্রীকে কাছে ডাকল। বসতে বলল। কিন্তু যুবতী বসল না। আমীর দাঁড়িয়ে তার দুই বাজু ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, কিন্তু যুবতী মোচড় দিয়ে দূরে সরে গেল। তার বুঝতে বাকি রইল না, পরিচারিকার কাজের কথা বলে আসলে তাকে কেন আমীরের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে।

শুনেছি তুমি যাযাবর মেয়ে। এখন তো দেখছি, তুমি নিজেকে শাহজাদী মনে করছো। দেখ আমি তোমার উপর কোন হুকুম চালাব না। তোমাকে উপযুক্ত এনাম দিব, আমার হেরেমে শাহজাদী হয়ে থাকবে।

একথা শুনে যুবতী দরজার কাছে সরে গেল। আমীরের চেহারা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল।

"আমি সোনার দিনার ভর্তি থলিতে লাথি মেরে এখানে ফেরার হয়েছি। নিজেকে নিলামে বিক্রি করতে ইচ্ছুক নই। তা না হলে বিয়ে করে স্বামী নিয়ে নদী সাঁতরে কেন পালিয়ে এসেছি নিজের গোত্র ছেড়ে। আমার স্বামীকে তোমার দশ মেয়ে দিলেও আমি তোমার কাছে যেতে পারব না।"

"স্বামী থেকে হাত ধুয়ে ফেল লাড়কী। বাচ্চার মমত্বও ভুলে যাও। এসো, আমার কাছে এসো।"

তুফানের মতো দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হাকামের স্ত্রী। সোজা চলে গেল সেই ঘরে যেখানে ওর পরিধেয় কাপড়গুলো ফেলে এসেছিল।

রাগে গর্জে উঠল আমীর। ডাকল বয়স্ক মহিলাকে। দৌড়ে এলো বয়স্কা মহিলা, আরো এক সেবিকা এবং হেরেমের দু' নারী। তারা মনিবের রাগত চেহারা দেখে হতভম্ব।

"হারামজাদী! শরমালে ভিন্ন কথা ছিল, কিন্তু ও আমাকে অপমান করে বেরিয়ে গেল।"

আমরা ওকে চুল ধরে নিয়ে আসছি। বলল এক খাদেমা।

'না। এই যাযাবর ভিখারিনীকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বহুদিন।' আমীর দু'জন বিশেষ প্রহরীকে ডেকে বলল, 'আমার আস্তাবলের পাশের ঝুপড়িতে যে হতভাগা থাকে ওকে আজ রাতে হত্যা করে ওর স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আর ওদের কোলের বাচ্চাটিকে বিক্রি করে দেবে।'

হেরেমের মেয়েরা পরস্পর চোখাচোখি করল। উভয়েই নির্বিকার। মনিব ক্ষোভে জ্বলছে।

“কোন শাহজাদী হলে না হয় এমন দেমাগ সহ্য করা যেতো। হতভাগী এক যাযাবর ভিখারিনীর এতো স্পর্ধা? যাও, সবাই এখান থেকে চলে যাও।”

গভীর রাতে আল হাকামকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে অপহরণ করার চক্রান্ত করা হলো। বেলা অস্ত যাওয়ার পর আল হাকাম তার ঝুপড়িতে এলো। স্ত্রী নিজের কাপড়েই। আমীরের রক্ষিতা যে পোশাক তাকে পরিয়েছিল তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে এসেছিল সে।

ভাবছিল আজকে তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চক্রান্তের কথা তার স্বামীকে বলবে কি-না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলেছে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবে না। স্বামীকে নানাভাবে সে এখানে না থাকার বিষয়টি বোঝাতে পেরেছিল। কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরেও তার এই ব্যাপারটি জানা ছিল না যে, আজই সে স্বামীকে জীবিত দেখছে, তার কলিজার টুকরো সন্তানকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে, তার ইজ্জত-সম্ভ্রম লুটে নেয়ার ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে গেছে।

সে স্বামীর সাথে যাবতীয় কথা শেষ করে তার সামনে খানা পরিবেশন করল। ঠিক এ সময় ঝুপড়িতে এক অপরিচিতা মহিলা প্রবেশ করল। সে প্রবেশ করেই ঝুপড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, “তাড়াতাড়ি খানা শেষ করে ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে এখনই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাও, কোথাও দাঁড়াবে না।”

এই মহিলা ছিল আমীরের বিশেষ আস্থাভাজন দুই রক্ষিতার একজন। সে আমীরের চিৎকার শুনে খাস কামরায় প্রবেশ করে আল হাকামকে হত্যা ও তার স্ত্রীকে অপহরণের চক্রান্ত শুনে ফেলেছিল। সে আল হাকামের স্ত্রীকে এক ঝলক দেখেও ছিল। নিষ্পাপ এই মেয়েটির সম্ভ্রম ও তার নিরপরাধ স্বামী-সন্তানের জীবন বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিল সে। আরো একজনকে সাথে নিল। নিজেদের দুরন্ত স্বপ্নময় কৈশোরের কথা মনে পড়ল ওদের। তাদেরও স্বপ্ন ছিল বিয়ে করে স্বামী সংসার নিয়ে সুখের ঘর বাঁধবে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এই লম্পট আমীর তাদেরকে চার দেয়ালের ভেতর যৌনদাসীতে পরিণত করেছিল। নিজেদের রূপ-যৌবন ও তারুণ্যের বিনিময়ে ওরা ভোগ করছিল বিলাসী জীবন। বিলাস উপকরণ ও ভোগ্য-পণ্যের অভাব নেই এখানে।

আমীরের হেরেমে ওরা দু'জন নিজেদের ধূর্তামি, চাতুরীপনা ও কূটকৌশলে আমীরের নষ্ট জগতকে আরো সমৃদ্ধ করেছিল। নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল

আমীরের ঘনিষ্ঠজন ও আস্থাভাজনরূপে। নিজেদের ধর্মীয় জীবন ও নারীত্বকে বিলিয়ে দিয়েছে এরা। হেরেমের চক্রান্ত আর কূটচালে ওরা সিদ্ধহস্ত। স্বয়ং আমীর ছিল ওদের হাতের পুতুল। কিন্তু নারীত্বের ঐশ্বরিক চেতনা আর স্বামীর সংসার নিয়ে সুখময় জীবনের স্বপ্নটা যে মাঝে মধ্যে তাদের কাঁদাত না তা নয়। মানুষের সহজাত পবিত্র সত্তাকে কখনো ছাইচাপা দিয়ে রাখা যায় না। ওরা যখন দেখল, একটি নিরপরাধ যুবতী, দুগ্ধপোষ্য নিষ্পাপ সন্তান ও বিদেশ-বিভূঁইয়ে অসহায় গরীব এক সৎ পুরুষ এক লম্পট আমীরের লাম্পট্যের শিকারে খুন হতে চলছে, তখন তাদের মধ্যে নিজেদের স্বপ্নময় যৌবনকে পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে দেয়ার প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু প্রতিশোধের ব্যবস্থা করতে না পারলেও তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলো, এদের জীবন বাঁচাবেই।

আল্লাহ্ তায়ালা রহমতের ছায়া বিস্তার করে আল হাকামের স্ত্রীকে সকল কলঙ্ক থেকে পবিত্র রেখেছিলেন। হাজারো বিপদের পরও এই যাযাবর মেয়েটির চরিত্রে সামান্যতম পাপের আঁচড় পড়তে পারেনি। নিজেরা আকণ্ঠ পাপে ডুবে থেকেও এই দু'মহিলাকে আল্লাহ্ তায়ালা আল হাকামের স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষায় উসিলা বানিয়ে দিলেন। হয়তো এটা ছিল আল হাকামের স্ত্রীর পবিত্রতার পুরস্কার।

"আমার পক্ষে বেশিক্ষণ এখানে থাকা সম্ভব নয়, আর এর চেয়ে বেশি কিছু বলাও সম্ভব নয়। তুমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও, এটাই আমার প্রত্যাশা।" এই বলে মহিলা বেরিয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে স্ত্রীর প্রতি তাকাল আল হাকাম। দিনের বেলায় আমীরের বাড়িতে যা ঘটেছিল স্বামীকে বলল হাকামের স্ত্রী। চিন্তায় পড়ে গেল হাকাম। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। স্ত্রী তাকে তাড়া দিল, ওঠ! আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু আল হাকামের মধ্যে পালানোর তাড়া নেই। সে বলল, এই মেয়েলোকটি মনে হয় আমীর বাড়ির সেবিকা। কেন সে আমাদের এখনই চলে যেতে বলল? আমি আমীরের সাথে দেখা করব। কিন্তু স্ত্রী তাকে সাথে নিয়ে ঝুপড়ি ছেড়ে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে জিদ ধরল। বলল, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকাও নিরাপদ নয়।

যে ঘাতককে নির্দেশ করা হয়েছিল আল হাকামকে খুন আর স্ত্রীকে অপহরণ করতে তারা তখন মদের হাড়ি নিয়ে বেহিসেবে গিলছে। তাদের হাতে উন্নত হাতিয়ার। ছিন্নমূল এক হতদরিদ্রকে খুন করে তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আসা এদের জন্যে মামুলী ব্যাপার। সন্ধ্যার আগেই তারা ঝুপড়িটা ভালো করে পরখ করে এসেছিল। কোন বাধা-বিপত্তি, আইন-কানুনের ভয় ছিল না তাদের। তারা এই ভেবে উৎফুল্ল ছিল, একটা পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ হয়েছে।

এরা মদপান শেষ করে আল হাকামের ঝুপড়ির দিকে রওয়ানা হল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ, আনন্দ-উল্লাস করে তারা আল হাকামের ঝুপড়ির কাছে গেল। ঝুপড়ির দরজা বন্ধ ছিল। একজন অপরজনকে বলল, তুমি মহিলাকে ধরে ফেলবে। আমি মরদটাকে সাইজ করবো।

বন্ধ দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ওরা গর্জে উঠল। কে আছিস, বের হ! কিন্তু নিস্তব্ধ। ওদের হুংকার ওদের কানেই ধ্বনিত হলো। অন্ধকারে হাতড়ে খোঁজাখুঁজি করল, কোন মানুষজন পেলো না। ঝুপড়ি ভুল হয়েছে ভেবে ওরা সেখান থেকে অন্য ঝুপড়ির খোঁজে বেরিয়ে গেল।

ততক্ষণে আল হাকাম স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শহরের বাইরে চলে এসেছে।

"আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র জমিনও বুঝি সংকীর্ণ হয়ে গেছে।" হতাশ কণ্ঠে বলল আল হাকাম।

"অধৈর্য হয়ো না সুবক্তগীনের বাপ। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর আর না কর কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা এমন কোন পাপতো করিনি যে জন্যে আমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আমি সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তানকেই ভূমিষ্ঠ করেছি যার ইশারা আমি পেয়েছিলাম।"

"তুমি একটি বদ্ধপাগল। তোমার জন্যে-ই আমাদের এই শাস্তি।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল আল হাকাম। "সম্পূর্ণ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত রয়েছ তুমি। বিরাট ওলী-বুযুর্গ জন্ম দিয়ে ফেলেছো, এই বিশ্বাস দেমাগ থেকে দূর না করলে তোমার কপালে দুর্ভোগ শেষ হবে না। কুরআন শরীফকে তাবীজ মনে করো না। তোমাকে বিয়ে করাটাই আমার ভুল হয়েছে। গরীবের বউ অসুন্দর হলেই শান্তিতে থাকা যায়। এখন আমি তোমাকে পাহারা দেব না পেটের আহার যোগাব?"

"আমার হেফাযত আমিই করবো, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি কুরআন পড়তে জান, অর্থ বোঝ, এরপরও মুখে এমন কথা কিভাবে উচ্চারণ কর!"

স্ত্রীর জবাবে কোন কথা বলল না আল হাকাম। রাগে-ক্ষোভে, নিঃশব্দে ভাগ্যের মুণ্ডপাত করছিল আল হাকাম। ইসলাম ও আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সে এখন নিরাশ।

চল ফিরে যাই।

কোথায়?

তোমাদের কবিলায়। হয়তো ওখানে, নয়তো আশেপাশেই পাওয়া যাবে তাদের। বলল হাকাম।

"ওখানে না গিয়ে বরং ঘোড়াওয়ালা মনিবের কাছেই চল। আমার শরীর বিক্রি করে তোমাকে কাড়ি কাড়ি টাকা এনে দেবো। তুমি আরাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাবে আর আত্মপ্রসাদে মেতে থাকবে এই ভেবে, বউটা আমার সুযোগ্যই বটে! শুনি, কোন ধাতের পুরুষ তুমি? দেখো, আমি আমার ছেলেকে তোমার মতো কাপুরুষ হতে দেবো না।" ক্ষুব্ধ বাঘিনীর মতো ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বলল স্ত্রী।

"আগে তোমার ছেলে বাঁচুক সেই দু'আ কর। তারপর না হয় শাহনশাহ বানাবে।" তিরস্কারের সুরে বলল আল হাকাম।

"আমার ছেলে বেঁচে থাকবে। দেখো, একদিন ইবরাহীমের মতো তোমাকে বলবে, আব্বু, আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তা তোমাকে দেওয়া হয়নি। তুমি আমার হেদায়েত মতো চলো, আমি তোমাকে কামিয়াবির পথ দেখাব।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের আদর্শিক লড়াই শুরু হয়ে গেল। পুরুষালী উদ্বেগ আর হতাশা হাকামকে কাবু করে ফেলেছিল। সেই সাথে স্ত্রীর মধ্যে বিরাজ করছিল নিজের স্বপ্নের প্রতি অবিচল আস্থা। স্বামীর বিরূপতায় ও স্বপ্ন পূরণের বিঘ্নতায় হতাশা তাকে বিব্রত করছিল, কিন্তু পূর্বাপর ঘটনা তাকে নিজের আত্মবিশ্বাসে আরো অবিচল করেছিল। ফলে দু'জনের দুই মেরুকরণে লাগামহীন হয়ে পড়েছিল ভাষা। পরস্পর বিতর্কের মাঝে পথ চলছিল তারা। এক পর্যায়ে চুপ হয়ে গেল আল হাকাম।

সেই রাত থেকে আবার তারা যাযাবর জীবনে ফিরে আসে। ব্যতিক্রম এতটুকু যে, আগে তারা থাকতো লোকালয় থেকে দূরে আর এখন থাকে লোকালয়ে। শহরের উপকণ্ঠে এখানে সেখানে। শহরে এটা ওটা করে পানাহার যোগাতে আল হাকামের তেমন কোন বেগ পেতে হয় না। দিন কোনমতে চলে যায়।

দুই বছর এক শহরে থাকার পর আল হাকাম অন্য এক শহরে পাড়ি জমাল। স্ত্রী তার কাছে বায়না ধরল, এখন আর ভবঘুরের মতো এখানে ওখানে থাকা নয়, কোথাও স্থায়ী ডেরা তোলো। ছেলেকে কোন মসজিদে পড়তে দিতে হবে, নয়তো ওরও আমাদের মতো এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাতে হবে।

বছর খানিক আগেই আল হাকাম ও তার স্ত্রী ছেলেকে কুরআন শরীফ পড়াতে শুরু করেছিল। মা লক্ষ্য করছিল, তার ছেলে অন্য যাযাবর শিশুদের চেয়ে ভিন্ন। সে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা চরিত্রের। কেমন যেন গম্ভীর, ভাবুক, কথা

বলে বুদ্ধিদীপ্ত। অন্য বাচ্চাদের মতো বাজে জিনিসের বায়না ধরে না, কোন জিনিসের জন্য জেদাজেদি করে না। মা এও লক্ষ্য করেছে, তার ছেলে পড়ালেখার প্রতি খুব মনোযোগী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তার পছন্দ।

এক পর্যায়ে মায়ের সে আশা পূর্ণ হল। আল হাকাম এখন মনস্থির করল, এখানে কিছুদিন থাকবে। ছেলেকে নিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট গেলে ইমাম সাহেব ছেলেকে মক্তবে ভর্তি করে নিলেন। ছেলেকে ইমাম সাহেব ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করায় আল হাকাম ও তার স্ত্রী ইমাম সাহেবের যথাসাধ্য সেবাযত্ন করতে লাগল।

প্রথম দিনের সবকে এ ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন, এই ছেলে অন্য দশটি ছেলের চেয়ে ভিন্ন। একেবারে প্রাথমিক স্তরের পড়া সে বাবা-মায়ের কাছেই শিখে ফেলেছিল। সাধারণত পাঁচ-ছয় বছরের শিশুদের যে ধরনের জ্ঞান থাকে এ ছেলের তার চেয়েও অনেক বেশি মেধা ও প্রজ্ঞা তিনি দেখতে পেলেন। তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়ে দিলেন। সেখানেও সে অন্যদের তুলনায় এমন কৃতিত্ব দেখাল যে, ইমাম সাহেব ভাবলেন, এ বাচ্চা অসাধারণ, অনন্য। এখানে শিশু সুবক্তগীন প্রায় চার বছর লেখাপড়া করল।

সুবক্তগীনের বয়স এখন দশ-এগারো। এর মধ্যে সে কুরআন শরীফ তরজমা ও তফসীরসহ পড়ে ফেলেছে। বেশ ক'টি হাদীসের কিতাবও সে ইমাম সাহেবের বিশেষ তত্ত্বাবধানে এরই মধ্যে পড়েছে। সুবক্তগীনের জ্ঞান-পিপাসা উস্তাদের জ্ঞান পরিধিকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। উস্তাদের কাছে সে এমন এমন জটিল সমস্যা তুলে ধরে যেগুলোর সমাধানে উস্তাদেরও হিমশিম খেতে হয়। এমন এমন জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন করে যা তাকে পেরেশান করে তোলে। উস্তাদ বুঝতে পারলেন, এর জ্ঞান-পিপাসা মিটানোর জন্য একে নিজের কাছে না রেখে বড় জ্ঞানীর নিকট কিংবা বড় প্রতিষ্ঠানে পাঠানো দরকার। সুবক্তগীন একদিন উস্তাদকে প্রশ্ন করে, 'উস্তাদজী! আমল ছাড়া এল্‌ম কি পূর্ণতা পায়? তরবারীর জোরে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)-এর পয়গামের প্রসার ঘটানো কি জায়েয? আমি যদি সারা দুনিয়াতে কুরআন-হাদীসের পয়গাম ছড়িয়ে দিতে চাই তবে এর পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?' এ ধরনের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে লাগলেন সুবক্তগীনের উস্তাদ। শিষ্যের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন আল হাকামকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি ছেলেকে বুখারা নিয়ে যাও। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেমের ঠিকানা দিয়ে বললেন, তোমার ছেলের মধ্যে আমি এলেমের যে তৃষ্ণা দেখেছি, তা নিবারণ করতে না পারলে ও পাগল হয়ে যাবে।

শুধু জ্ঞান-পিপাসাই নয় ওর মধ্যে আমি সুপ্ত যে বীরত্বের লক্ষণ দেখছি, ওকে যদি সমর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তবে এই ছেলে একদিন বিখ্যাত হবে। বর্তমানে চতুর্দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে। মুসলমান রাজা-বাদশাহরা পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত রয়েছে। এর সুযোগে কাফের-বেঈমানেরা মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে গোলামে পরিণত করছে। এই ছেলে এসব নিয়ে গভীর চিন্তা করে। সাধারণত গরীবের ঘরে এমন মন-মানসিকতার ছেলে-মেয়ে জন্ম নেয় না। বড় কিছুর আশা করাও গরীবের সন্তানের জন্য মানায় না। তবুও যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, কোন সুযোগ পায় তবে এই ছেলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন কায়েম করে ক্ষান্ত হবে। মুশকিল হলোঁ, ওর মধ্যে দারুণ নীতিবোধ কাজ করে। নীতি-আদর্শের উপর অটল থেকে জীবনে বড় কিছু করা বড়ই কঠিন, তবে নীতিবানের দ্বারাই বড় কিছু হওয়া সম্ভব। সুবক্তগীন এমন এমন নীতি-আদর্শের কথা বলে যা কখনও আমি তাকে বলিনি। হয়ত ওকে ওর জীবনে বহু ঝড়-তুফান মোকাবেলা করতে হবে।

'নীতি-নৈতিকতার কথা ওকে আমি বলেছি'— বলল আল হাকাম। আমার এলেম কালাম বেশি নেই। তবে আমি ন্যায়ের প্রতীক নওশেরোয়ার অধঃস্তন বংশধর। আমি বাপ-দাদা ও মুরব্বীদের কাছে যেসব ন্যায়নীতি ও ইনসাফের কথা শুনেছি, সে সব আমি ছেলেকে বলেছি। তাছাড়া বাড়িতে সারাক্ষণ ওকে কুরআন-কিতাব নিয়ে পড়তে দেখেছি। কিতাবাদি থেকেও সে আদর্শ বাণীগুলো রপ্ত করেছে।

"তুমি একে বুখারায় নিয়ে যাও! আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওখানে তোমার ভালো কর্মসংস্থানও হয়ে যেতে পারে। আর হ্যাঁ! একা যেয়ো না। ওই পথটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পথে ডাকাত, লুটেরাদের খুবই উৎপাত। তোমার তেমন কোন সহায়-সম্পদ না থাকলেও তোমার স্ত্রীই বড় রত্ন। এমন যেন না হয় যে, এই বিদূষী মহিলাকে জীবনের জন্যে হারিয়ে ফেল। তাছাড়া এ ধরনের শিশু-কিশোররাও খুব বেশি অপহরণের শিকার হয়। কাজেই কোন বণিক দলের সঙ্গী হবে। কিছুদিন অপেক্ষা কর, বড় কোন কাফেলা ওই দিকে গেলে আমিই তোমাকে খবর দেব।" বললেন মসজিদের ইমাম।

ওই যুগে দূরের কোন সফরে ডাকাত-লুটেরাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দল বেঁধে লোকজন সফর করতো। এক দু'জনকে পেলেই ডাকাত-লুটেরা দল সর্বস্ব লুটে নিত। কখনও পুরো কাফেলা আক্রমণ করতো ডাকাতেরা। অস্ত্রের মুখে ছেলে-মেয়ে ও নারীদের অপহরণ করে গোলাম দাসী হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দিত।

যাদের দায়িত্ব ছিল লুটেরা-ডাকাতদের আক্রমণ-অত্যাচার থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা, সেসব আমীর-উমরারা ডাকাতদের কাছ থেকে সুন্দরী মেয়ে ও ছোট শিশুদের দাস-দাসী হিসেবে কিনে নিতো। এতে ডাকাত লুটেরারা উৎসাহ পেত। ইমাম সাহেবের আশঙ্কা ছিল যথার্থ। আল-হাকামের স্ত্রী যেমন ছিল সুন্দরী, তার ছেলে সুবক্তগীনের ছিল বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার চেয়েও বড় কথা, ইমাম সাহেব বুঝেছিলেন, এই ছেলের মা কোন সাধারণ যাযাবর মহিলা নয়, তার ভেতরে অবশ্যই অসাধারণ গুণ রয়েছে যা অন্য মহিলাদের নেই। ভালো মা ছাড়া এ ধরনের শিশু জন্ম নিতে পারে না। সুবক্তগীনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ইমাম সাহেব আল-হাকামকে সতর্ক করেছিলেন। ইমাম সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, ওর বাবার চেয়ে ওর মায়ের অবদান বিশেষ গুরুত্ব রাখে এক্ষেত্রে।

স্থানীয় কোন কাফেলার যাত্রা-সংবাদ দীর্ঘ দিনেও পাওয়া গেল না। একদিন দেখা গেল, তিনশ' জনের এক বিরাট কাফেলা নারী-শিশু ও বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে সমরকন্দ-বুখারার দিকে যাচ্ছে। কাফেলার অধিকাংশ তলোক সওদাগর মনে হল। ছেলের ভবিষ্যতের দিকে খেয়াল করে আল-হাকাম সওদাগর কাফেলার সাথে মিলে অভিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করল। সারা দিন বিরামহীন চলল কাফেলা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে একটি ময়দানে কাফেলা যাত্রা বিরতি করল। তাঁবু ফেলে রান্না-বান্না হল। ক্লান্ত-শ্রান্ত যাত্রীরা যে যার মতো গা এলিয়ে দিল ঘুমের কোলে। কয়েকজন তাঁবুর আশে-পাশে পাহারায় নিযুক্ত হল। তাদের হাতে তীর-ধনুক, ঢাল-তরবারী। তখন রাত প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ প্রহরীদের কানে ভেসে এলো অশ্বখুরের আওয়াজ। সতর্ক প্রহরীরা ধনুকে তীর যোজনা করল। ক্রমেই আওয়াজ নিকটতর হচ্ছিলো। এক সময় মনে হলো, এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এই দিকে ধেয়ে আসছে, হয়তো কোন দিকে যুদ্ধ যাত্রা করেছে কোন সৈন্যদল। আগন্তুকদের সংখ্যাধিক্য আন্দাজ করে প্রহরীরা কাফেলার শক্ত-সামর্থ্য কয়েকজনকে জাগিয়ে দিল। অন্যেরা তখনও ঘুমে অচেতন। জাগিয়ে তোলা ব্যক্তিদের মধ্যে আল-হাকামও ছিল। ভাবসাব দেখে প্রহরীরা নিশ্চিত হলো, আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। সৈন্যদল হলেও এরা বণিক কাফেলার মাল-সামান হস্তগত করবে, আর ডাকাত হলে তো সবই লুটে নেবে। ওরা সংখ্যায় বহু। তাই তারা অশ্বারোহী দলের আক্রমণ আশঙ্কায় কাফেলার নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হলো।

দেখতে দেখতে এক বিশাল বাহিনী মশাল জ্বালিয়ে দ্রুত বেগে অগ্রসর হচ্ছে তাঁবুর দিকে। তাঁবুর পাশে এসেই ডাকাত দল মশালগুলোকে তাঁবুতে ধরিয়ে

দিল। বীভৎস ডাক-চিৎকার শুরু করল। ডাকাতেরা ওদের ঘোড়াগুলোকে এভাবে বিক্ষিপ্ত হাঁকাতে শুরু করল যে, তাঁবুর লোকেরা ঘুম থেকে উঠে কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই ওদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে লাগল। মহিলা ও শিশুরা আর্তচিৎকার দিয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়াতে লাগল। মহিলারা কোলের বাচ্চাকে বুকে চেপে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ডাকাতদের তীব্র আক্রমণে কারো পক্ষেই নিরাপদ স্থানে যাওয়া সম্ভব হলো না।

আল-হাকাম ঘটনার আকস্মিকতায় স্ত্রীকে বগলদাবা করে টেনে একটা ঝোপের আড়ালে নিতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর মনে পড়ল, তাদের কলিজার টুকরো সুবক্তগীন তাদের সাথে নেই। স্ত্রী চিৎকার শুরু করল ছেলের জন্যে। আল-হাকাম ওকে অনেক কষ্টে বুঝাল যে, তুমি চেঁচালে ডাকাত তোমাকে নিয়ে যাবে। স্ত্রীকে আড়ালে রেখে নিরস্ত্র হাকাম বেরিয়ে পড়ল ছেলের খোঁজে। এদিকে তখন ডাকাত দল ঘোড়া থেকে নেমে দু'হাতে ধন-সম্পদ লুটে মেয়ে ও শিশুদের বেঁধে এক জায়গায় জড় করছে। কাফেলার লোকদের আর্তচিৎকার, মহিলাদের ক্রন্দকনরোল আর শিশুদের আর্তনাদে ময়দানে কেয়ামত নেমে এসেছে। ডাকাতদের প্রতিরোধ করার সামর্থ্য তাদের নেই। তীব্র আক্রমণে প্রহরীদলের সবাই নিহত হয়েছে। নিহত হয়েছে প্রতিরোধকারীরাও। পুরো কাফেলা এখন ডাকাতদের কব্জায়। সব মাল-সামান, নারী-শিশু, উট, ঘোড়া ডাকাতরা নিয়ে চলে গেল।

রাত পোহালো। আহতদের যারা আড়ালে গিয়ে কোন মতে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল তাদেরও আর বাঁচার আশা রইল না। রক্ত আর লাশে একাকার। কোন সক্ষম পুরুষকেই ডাকাতরা প্রাণে বাঁচতে দেয়নি। যেসব মহিলা ও শিশু ওদের নির্দেশমতো দাসত্ব বরণে গড়িমসি করেছে, সময় ব্যয় না করে হিংস্র জানোয়ারগুলো তাদেরও হত্যা করেছে। সকাল বেলা আল-হাকামের স্ত্রী স্বামী-সন্তানের জন্যে পাগলের মত চিৎকার করে ময়দান জুড়ে খুঁজতে থাকে, কিন্তু সে প্রিয় সন্তানটিকে খুঁজে পেল না। স্বামীকে পেল, সেও আর জীবিত নয় মৃত। আল-হাকামের দেহ তরবারীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল ডাকাতেরা। তার সারাদেহ রক্তে ডুবে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল, সে অনেক লড়াই করেছে, ডাকাতদের উপর্যুপরি আক্রমণে তার মৃত্যু হয়েছে।

সুবক্তগীনের মা ময়দানের সব লাশ ওলট-পালট করে দেখছিল, আর যাকেই পাচ্ছিল বলছিল, তোমরা কি আমার মানিক সুবক্তগীনকে দেখেছ? ও খুব সুন্দর। কাফেলায় আমার ছেলের মতো এতো সুন্দর আর বাচ্চা ছিল না। লাশের পর

লাশ ওলট-পালট করে স্বামীহারা স্ত্রী একমাত্র সন্তানের দেখা না পেয়ে পাগল হয়ে গেল।

বালিয়াড়ীর আড়ালে, ঝোপ ঝাড়ের ভেতর, টিলার চূড়ায় আর ময়দানে হাকামের স্ত্রী সন্তানের খোঁজে পাগলিনীর মতো দৌড়াচ্ছে। ডাকাতদের রেখে যাওয়া তাঁবু আর বিক্ষিপ্ত মাল-সামান ও প্রতিটি লাশকে বারবার ওলট-পালট করে দেখল, কিন্তু সুবক্তগীনকে পেল না। টিলায় চড়ে গলা চড়িয়ে ডাকল, সুবক্তগীন! বাবা, আমার কাছে আয়! বাবা সুবক্তগীন! আমার কোলে আয়। সুবক্তগীন! সুবক্তগীন! সুবক্তগীন!

লুটন্ত কাফেলার যারা বেঁচে ছিল, তারা সাক্ষাত মরণ থেকে রক্ষা পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত জীবনটা টেনে হেঁচড়ে কোন মতে লোকালয়ে ফিরে চলল। দেখতে দেখতে ময়দান জনশূন্য হয়ে গেল। শিয়াল, শকুন আর হিংস্র হায়েনাদের খোরাক হল মৃতদেহগুলো। আধমরা মানুষগুলোর ওপরও হুমড়ি খেয়ে পড়ল শেয়াল শকুনের দল। তখনও আল-হাকামের স্ত্রী ময়দান, বালিয়াড়ী ও ঝোপ ঝাড়ে তার সন্তানটিকে তালাশ করছিল। ডাকছিল— সুবক্তগীন! বাবা সুবক্তগীন। আমি এখানে, আয় বাবা সুবক্তগীন! আয় সুবক্তগীন!

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত যতো কাফেলা, ডাকাতদল, সৈন্যবাহিনী এ পথে গিয়েছে একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ আর সুবক্তগীন সুবক্তগীন ডাক তারা সকলেই শুনেছে। অনেকেই এই আওয়াজ নিয়ে নানা রূপকথার জন্ম দিয়েছে, আবার অনেকে এটাকে মনে করেছে কোন প্রেতাত্মার ডাক। দেখা গেলো, এই ডাকের ভয়ে এ পথে লোকের চলাফেরাই বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষ প্রেতাত্মার ভয়ে এ পথ এড়িয়ে অন্য পথে গেছে। কেউ সাহস পাচ্ছে না এ পথে চলতে। যদিও সুবক্তগীনকে ডাকা কোন নারীকণ্ঠ এখন আর ঐ টিলা থেকে ভেসে আসছে না। তবুও টিলার দিকে ভয়ে কেউ তাকাচ্ছেও না। আল-হাকাম নিহত হয়েছে। যদি সে জীবিত থাকত তাহলে এই মুহূর্তে স্ত্রীকে টেনে হেঁচড়ে নিরাপদে কোথাও নিয়ে যেত আর বলতো, আমি যা বলেছিলাম তা বুঝতে চাইছিলে না যে, গরীবের ছেলে সত্যের পূজারী হয় না, পেট পূজারী হয়। তোমার কল্পনার শ্বেত-শ্মশ্রুধারী লোকের সেই ঘটনা বাস্তব নয় অলীক, কল্পনা, অবাস্তব স্বপ্ন। ভোগ-বিলাসিতা, ধন-সম্পদ, মিথ্যা আর প্রতারণার যেখানে দাপট সেখানে সত্য ও ন্যায়নীতির মৃত্যু ঘটতে বাধ্য। আজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের পরিবর্তে পাষণ্ড, বেঈমান-বদমায়েশরাই সুখ্যাতি পাচ্ছে। সুবক্তগীনের মা! কুরআনের ইঙ্গিত আমাদের মতো ভবঘুরের সন্তানের ভাগ্যে ফলে না। সাধ হোক আর আকাঙ্ক্ষা

হোক, কল্পনা হোক আর বাস্তবই হোক। জনমানবহীন বিজন প্রান্তরে আল-হাকামের স্ত্রীর সুবক্তগীন, সুবক্তগীন আওয়াজ আর কেউ শুনল না। ইতিহাসের পাতা থেকে অন্ধকারে চলে গেল সুবক্তগীনের মায়ের অহাজারি ও কান্না।

ইসলাম মানুষকে দাসী-বাঁদীতে রূপান্তরের ব্যাপারটি প্রায় বিলুপ্তির নিকট নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু খেলাফতে রাশেদার পর রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আশ্রয়ে গোলাম-বাঁদীর বেচা-কেনা আবার জমে উঠল। বাদশাহ, শাহানশাহ ও সম্রাটরা ভোগ আহ্লাদে ডুবে গেল। মুসলিম শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র বেড়ে গেল। রাজতন্ত্রের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কবলে খেলাফত ভেঙ্গে খান খান হল। নামে মাত্র একজন খলিফা রইল। প্রকৃত খেলাফতের কিছুই অবশিষ্ট রইল না। রাষ্ট্র পরিচালিত হতে লাগল আমীর উমারার ইচ্ছেমত। আমীর শ্রেণীর হেরেমগুলো গোলাম-বাদীতে ভরে গেল। আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাসিতার আয়োজনে শাসক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দাস-দাসীরা পরিগণিত হলো আভিজাত্যের প্রতীকস্বরূপ।

বুখারার এক মাঠ লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য মানুষের ভীড়। হাঁক ডাক হচ্ছে। ডাক উঠছে। মানুষের মেলা। বনি আদম কেনাবেচার হাট। দলবেঁধে ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী ও মহিলাদের সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে। নিলাম হচ্ছে কয়েকটি কাঠের মাচাং-এ। উপরে তাঁবু টানানো? । একটি মাচাং-এ কয়েকটি তরুণী। আনকোরা। ডাক উঠছে,...ইনটেক, কুমারী, সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। সরাসরি ঘর থেকে নিয়ে আসা। উমদা তমাল দাম কম। মাত্র প্রতিটি একশ' দিনার। কে আছো বল....একশ' একশ' একশ'। দু'কিশোরীর কাঁধে হাত রেখে হাঁক ছাড়ল এক বিক্রেতা।

এই কিশোরী দল এখানে বিক্রিপণ্য। কাফেলা লুটের শিকার। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ওদের শরীর আর চেহারা পরখ করছে ক্রেতাদল। আমির-উমরার হেরেমের রক্ষিতা, আদম ব্যাপারী ও মেয়েদের ফেরীওয়ালা, যারা ওদের নাচ-গান শিখিয়ে বাজারে বাজারে ব্যবসা করে এমন লোকেরা এখানকার ক্রেতা।

একটু দূরে একটি টিলাসদৃশ জায়গায় আরেকটি জটলা। ওখানে বালক, শিশু আর পুরুষদের হাট। ক্রেতারা গরু-ছাগলের মতো ওদের নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী বালকদের দাম বেশি। দশ বারো বছরের কয়েকটি বালক অঝোর ধারায় অবিরাম কাঁদছে। একটি ছেলে ওদের ব্যতিক্রম।

অন্যেরা কাঁদলেও তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। নিরুদ্বেগ, গম্ভীর। এসব বালককে বণিক কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছে– যে কাফেলার সাথে আল-হাকাম তাঁর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বুখারার পথ ধরেছিল। নিরুদ্বেগ বালকটিই সুবক্তগীন। দেখতে সে অন্য বালকদের মতো ফর্সা না হলেও প্রাণবন্ত। সুস্থ সবল চেহারায় তার আভিজাত্যের ছাপ।

ক্রেতাদের মধ্যে হাজী নসর-এর প্রতিনিধিও উপস্থিত। হাজী নসর বুখারার উপকণ্ঠের এক জমিদার লোক। সে তার প্রতিনিধিদের বলেছিল, বয়স্ক গোলামের চেয়ে তার দরকার কমবয়েসী কয়েকটি বালক। যাদের তিনি নিজের মতো করে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলবেন, আস্থাভাজন হিসেবে নিজের বিশেষ কাজে ব্যবহার করবেন। সুবক্তগীনকে দেখে হাজী নসরের প্রতিনিধিদের পছন্দ হলো। তাকে খবর দিলো। হাজী নসর এসে বালকদের কান্না দেখে হতাশ হলেন, কিন্তু নির্বিকার শান্ত-সুবক্তগীনের চেহারায় তার দৃষ্টি আটকে গেল। রাশভারী গলায় তিনি বললেন, এসব বালকদের সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। তবে একে নিয়ে নাও। সুবক্তগীনের প্রতি অঙ্গুলি ইশারা করে বললেন তিনি। দাম মিটিয়ে সুবক্তগীনসহ আরো ক'টি বালককে টেনে নিয়ে এলো হাজীর লোকেরা।

ঘরে এসে সুবক্তগীনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন হাজী নসর, তোমার কী নাম?

সুবক্তগীন।

তোমার মা-বাবা কি জীবিত?

জানি না। আমরা তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলাম। ডাকাতরা তাঁবু আক্রমণ করল, আমি দৌড়ে পালাতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু এক লোক আমাকে ধরে অনেক লোকের সাথে একত্র করে হাত-পা রশিতে বেঁধে ফেলল। এরপর এখানে নিয়ে এল। আব্বু-আম্মু কোথায় আমি জানি না।

তোমার আব্বু কি কাজ করত?

আমীরদের ঘরে কাজ করতো।

তুমি কাঁদছো না কেন?

এর উত্তর দেয়ার আগে আমি জানতে চাই, আপনার ধর্ম কি?

আমি মুসলমান। আমি হাজী। বললেন হাজী নসর।

তাহলে আমার নয় আপনার রোদন করা উচিত।

আপনার হজ অর্থহীন। আমাকে আব্বু বলেছিলেন, কুরআনের নির্দেশ হলো, কোন মানুষ কোন মানুষকে গোলাম বানাতে পারে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস

করছেন, আমি কাঁদছি না কেন? আমি বুঝতে পারছি না এ অবস্থায় আমি কাঁদবো না হাসবো। আমার বয়স আপনার মতো হলে হয়তো এ কথার সঠিক জবাব আমি দিতে পারতাম।

হাজী নসর অবাক হয়ে গেলেন সুবক্তগীনের জবাব শুনে। এতটুকু বালকের মুখে এ ধরনের বিজ্ঞোচিত জবাব আর পাল্টা প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন এমনটি তিনি কল্পনাও করেননি।

এ ধরনের কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

আমার এক উস্তাদ আমাকে কুরআন-হাদীস পড়িয়েছেন। তিনি যে মসজিদের ইমাম ছিলেন, সেই ঠিকানা এবং বুখারায় পাঠানোর জন্যে লেখা তার চিঠির কথাও সে বলল। আরো বলল, তার বাবা নওশেরোয়ার বংশধর। সে তার বাবার মুখে ন্যায় ও ইনসাফের বহু কাহিনী শুনেছে। শুনেছে, তাদের পূর্ব পুরুষদের বহু কীর্তি-কাহিনী। এও বলল, আমার আম্মা প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন, তাকে শ্বেতশুভ্র এক দাড়ি-ওয়ালা বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, তুমি এমন এক ছেলের জন্ম দেবে যে বড় হয়ে অন্যায় রোধ করবে, আর দুনিয়াতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। বুযুর্গ এ কথাও বলতেন, সেই ছেলে যদি আমি নাও হই তবে আমার বংশে এমন ছেলে অবশ্যই জন্ম নেবে।

তুমিও তোমার মায়ের স্বপ্নে বিশ্বাস কর?

মায়ের কথায় কিভাবে বিশ্বাস করব। গোলাম দাসীদের আবার আত্মবিশ্বাস ও ঈমান-আকীদা থাকে নাকি? আপনি কি আমাকে জানোয়ারের মতো মনে করে টাকার বিনিময়ে কিনে আনেন নি? যারা কেনা গোলাম তাদের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের কোন মূল্য আছে কি?

তোমরা যদিও আমার কেনা গোলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে জীব-জন্তুর মতো রাখবো না। তোমাদেরকে আমি মানুষের মতো করেই গড়ে তুলব। হাজী নসর বললেন।

তুমি কোন কাজ জান?

আমাকে আব্বু-আম্মু বুখারায় নিয়ে আসছিলেন পড়ালেখার জন্যে। বলল সুবক্তগীন।

আমি তোমাদেরকে আমার ছেলেদের গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দিচ্ছি।

তুমি তার সেবাযত্ন করবে, আর লেখাপড়া করতে চাইলে তাও করতে পারবে।

সুবক্তগীন রচিত 'পান্দে নামা' নামক একটি পুস্তক থেকে জানা যায়, সুবক্তগীন তিন বছরকাল হাজী নসর-এর বন্দী দশায় ছিলেন। কিন্তু সেখানে দৃশ্যত গোলাম হলেও তার জীবন গঠনে হাজী নসর-এর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল কল্যাণকামী অভিভাবকের মত। হাজী নসর অধিকাংশ সময় সফরে কাটাতেন। ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব যে, প্রকৃতপক্ষে হাজী নসর কোন আমীর শাসক ছিলেন না, শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তবে একথা বোঝা যায়, হাজী নসর অন্যদের তুলনায় অনেকটা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

সুবক্তগীন গৃহশিক্ষকের হাতে ন্যস্ত হলেও গৃহশিক্ষক প্রথমে তাকে গোলামের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন নি। কিন্তু প্রথম দিনেই সুবক্তগীন গৃহ শিক্ষককে বুঝিয়ে দিন, সে জন্মসূত্রে গোলাম নয়, ভাগ্য বিড়ম্বিত এক বালক। দুর্ভাগ্যক্রমে সে এখানে ভৃত্যে পরিণত হয়েছে।

হাজী নসরের এক ছেলে কুরআন শরীফ ভুল পড়ছিল। সুবক্তগীন তার ভুল নিজে না শুধরিয়ে গৃহশিক্ষকের কাছে গিয়ে বলল, সাহেবজাদা ভুল পড়ছে। গৃহশিক্ষক সুবক্তগীনের উপস্থিতবুদ্ধি ও বিদ্যা দেখে বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, এই পুঁচকে ভৃত্য কুরআন শরীফের ভুলও ধরতে পারে! তিনি সুবক্তগীনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কুরআন শরীফ পড়া কোথায়, কার কাছে শিখেছ? জবাবে সুবক্তগীন গৃহশিক্ষককে তার মা-বাবা, উস্তাদ এবং তার অপহরণের সব ইতিবৃত্তই শোনাল। গৃহশিক্ষক সুবক্তগীনের আচরণ ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেন এবং তার প্রতি একটু বেশি মনোযোগী হয়ে পড়লেন। কিন্তু হাজী নসর এদের এতটুকুই লেখাপড়া শিখাতে ইচ্ছুক ছিলেন যতটুকু করলে সৈনিক ও সিপাহী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এদের জন্য এর বেশি শিক্ষাকে তিনি নিজের জন্যে ক্ষতিকর ভাবছিলেন।

নিজ সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেও হাজী সাহেবের একটা সীমা নির্ধারিত ছিল। যতটুকু লেখাপড়া করলে ধর্মের জরুরী জ্ঞান লাভ করা যায় আর যে সব কলাকৌশল রপ্ত করলে তেজস্বী অশ্বারোহী, বীর সেনাপতি আর বাহাদুর যোদ্ধা হওয়া সম্ভব ছেলেদেরকে তিনি এই পরিমাণ যুদ্ধকৌশল ও বিদ্যা শেখানোর জন্যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন গৃহশিক্ষকের উপর। কিন্তু হাজী নসর-এর ছেলেদের কেউই সুবক্তগীনের মতো দূরদর্শী এবং মেধাবী ছিল না। যুদ্ধ বিদ্যা, তীর চালানো, ঘোড় সওয়ার কি পুঁথি-পুস্তক কোন ব্যাপারেই খুব একটা আগ্রহ ছিল না হাজীপুত্রদের মধ্যে। পক্ষান্তরে কিছু দেখে, কিছু শুনে এবং কিছুটা নির্দেশনা পেয়েই সুবক্তগীন দ্রুত যুদ্ধ কৌশল, ঘোড় সওয়ার ও তীর ধনুক-তরবারী চালনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছিল।

গৃহশিক্ষক যেমন সুবক্তগীনের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন, অন্য ছেলেরাও সুবক্তগীনের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিল। সে কথা বলতো সহাস্যবদনে। কখনো কাউকে কটাক্ষ করে কথা বলতো না। তার আচরণ ও মার্জিত ব্যবহার শিক্ষককে তার প্রতি মনোযোগী করে তুললো। শিক্ষক তার অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য উজাড় করে দিয়ে তাকে জ্ঞানের রাজ্যে ডুবিয়ে দিতে লাগলেন। মাত্র তিন বছরে হাজী নসরের আশ্রয়ে পরিপূর্ণ যোদ্ধায় পরিণত হয় সুবক্তগীন। শিক্ষক তাকে ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরও শিক্ষা দেন। অপরদিকে আয়েশী হাজীপুত্ররা সুবক্তগীনের কৃতিত্বে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয়ে ভোগ-বিলাসিতায় তলিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে হাজী নসর যখন সুবক্তগীনকে দেখলেন, তখন মনে হলো তিনি অন্য কাউকে দেখছেন। কৈশোর পেরিয়ে সে তখন পূর্ণ স্বাস্থ্যবান সুঠাম যুবকে পরিণত হয়েছে। একদিন হাজী নসর সুবক্তগীনের যুদ্ধকৌশল, তীরন্দাজী ও অশ্বারোহণ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। সুবক্তগীনের সমর নৈপুণ্যে হাজী নসর তাকে তার নিজস্ব রক্ষী বাহিনীর দলনেতা এবং গোলামদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুবক্তগীন হাজী নসর-এর ডান হাতে পরিণত হল।

সে সময় আলপ্তগীন বুখারার গভর্ণর ছিলেন। তুর্কী খেলাফতের মসনদে দ্বিতীয় আব্দুল মালেক সমাসীন। হাজী নসর আলপ্তগীনের খুব প্রিয়ভাজন ছিলেন। এক তথ্য মতে ৯৫৭ সাল মোতাবেক ৩৪৮ হিজরীতে একদিন হাজী নসর আলপ্তগীনের সাথে মোলাকাত করতে গেলেন। সে সময় সুবক্তগীনও সাথে ছিল। তখন সুবক্তগীনের বয়স বিশ-একুশ বছর। ইতিহাসে হয়তো এটাই প্রথম ঘটনা যে, কোন যাযাবরের অপহৃত ছেলে গোলাম হিসেবে বিক্রি হওয়ার পরও বুখারার গভর্ণর হাউজে প্রবেশাধিকার পেল। সাক্ষাতের পর আলপ্তগীন হাজী নসরকে বললেন, আপনি এই গোলামকে আমার হাওলা করে দিন। আলপ্তগীন বিভিন্ন সূত্রে হাজী নসর আশ্রিত সুবক্তগীনের কর্মকুশলতার সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। সাক্ষাতে সুবক্তগীনকে দেখেই তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন, এই যুবকের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আলপ্তগীনের কন্যা ছাড়া প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কোন যোগ্য উত্তরাধিকারও তার নেই। তিনি মনে মনে এমন যোগ্য এক উত্তরসূরি খুঁজছিলেন।

কিন্তু এমন দামী রত্ন হাজী নসর হাতছাড়া করতে কোন মতেই রাজী ছিলেন না। অনেক বলা কওয়ার পর অভাবনীয় উচ্চমূল্যের প্রস্তাব দিলে হাজী নসর সুবক্তগীনকে হস্তান্তর করতে সম্মত হলেন।

সে সময় আলপ্তগীন, সুবক্তগীন ধরনের নাম সাধারণত তুর্কীরা রাখতো। সুবক্তগীনের মা তুর্কী হওয়ার কারণে ছেলের নাম তুর্কী ধাঁচে রেখেছিল। সে সময় তুরস্কের শাসন ক্ষমতা ছিল অমুসলিমদের হাতে। শাসকদের অত্যাচার-উৎপীড়নে মুসলমানরা তুরস্ক ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছিল। দেশ ছাড়াদের মধ্যে সুবক্তগীনের মায়ের বাপ-দাদাও ছিল।

দৈহিক সৌন্দর্য আর মেধা-মননে তুর্কীরা ছিল অন্যদের তুলনায় আকর্ষণীয়। এ জন্য ডাকাত ও লুটেরাদের হাতে বন্দী হয়ে যে সব তুর্কী বিক্রির জন্য হাটে উঠত তাদের দাম অন্যদের চেয়ে বেশি হতো। বলখ, গজনী, বুখারা ও আশ-পাশের এলাকায় বহু তুর্কী গোলাম-বাঁদী পাওয়া যেতো। দেশ জুড়ে এদের গোলামীর সুখ্যাতি ছিল। এরা খুবই বিনয়ী, অনুগত ও বিশ্বস্ত। মুনিবের স্বার্থ রক্ষায় এরা অতুলনীয়।

তুমি কি সে সব গোলাম বংশের, যাদের বেলায় এই অঞ্চলের বেশ সুখ্যাতি রয়েছে? আলপ্তগীন সুবক্তগীনকে জিজ্ঞেস করলেন।

সুবক্তগীন তখন তার দরবারে মাথা নীচু করে ক্রীতদাস হিসেবে দণ্ডায়মান। মনিবের প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর।

তুমি আমাকে তোমার আদব-আখলাক দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছো যে, তুমি গোলাম হিসেবে খুবই বিশ্বস্ত হবে, তাই না?

আলপ্তগীন ধীর পায়ে গোলামের কাছে এসে পিঠে আলতো চপেটাঘাত করে জোর গলায় বললেন, বেটা! মাথা উপরে উঠাও, বুকটান করে দাঁড়াও, আমার চোখে চোখ রেখে দেখ, আমিও তুর্কী, তুমিও তুর্কী।

সুবক্তগীন মাথা তুলে মনিবের দিকে তাকাল। মনিব তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন, তুমি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সৎ ও কৌশলী যোদ্ধা। আসলে মানুষ শুধু জ্ঞানের দ্বারা আলেম হতে পারে না, শুধু আমল দ্বারাও পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। মানব জীবনে ইলম ও আমলের সমন্বয় থাকতে হয়। আরো একটা ব্যাপার আছে, ইলম থাকা সত্ত্বেও আমল বিশুদ্ধ হয় না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নির্দেশনামতো নিজেকে গঠন করে। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি জন্মসূত্রে ধর্মীয় চেতনা পেয়েছ আর দু'জন বুযুর্গ ব্যক্তির সংস্পর্শে দীক্ষা নিয়েছ। তোমার মধ্যে ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটেছে। এটা বড় গুণ।

আমার মধ্যে এমন কোন গুণ নেই যা দেখে বুখারার গভর্ণর মুগ্ধ হতে পারেন। বলল সুবক্তগীন।

এটাই তো তোমার বড় গুণ যে, তুমি একই সাথে তুর্কী ও গোলাম। তোমার মত আমিও তুর্কী এবং গোলাম ছিলাম। ছোটবেলায় আমাকেও এমন কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে যেমন কঠিন গোলামীর জীবন তুমি বয়ে চলেছ। তবে তুমি জন্মসূত্রে মুসলিম আর আমার মা-বাবা ছিলেন অমুসলিম। আমি গোলাম অবস্থায় মুসলমান হয়েছি। আমি দীর্ঘদিন একজন বুযুর্গ ব্যক্তির মুখে ইসলামের নীতি ও আদর্শের কথা শুনেছি। ইসলামের কথা শুনে শুনে আমার মন সত্যধর্ম গ্রহণের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একদিন সেই বুযুর্গের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলাম।

ইসলাম বলে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। কেউ কারো প্রভু অথবা গোলাম নয়, টাকায় বিক্রি হওয়ার পণ্য নয় মানুষ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে মানুষ। নিজের মর্জি মতো মানুষের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার কোন শাসকের নেই। শাসকরা প্রভু নয় সেবক। আমি যদি মুসলমান না হতাম, আমার মনে যদি ইলম ও আমলের তৃষ্ণা সৃষ্টি না হতো, তাহলে হয়তো আজো গোলামই রয়ে যেতাম, এ সম্মান ও ক্ষমতার আসন পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হতো না আমার।

সুবক্তগীন বললো, আমার আম্মু আমাকে বলতেন, তুমি বড় হলে অনেক সুনাম কুড়াবে। তোমার তরবারীর আঘাতে মিথ্যা অপসারিত হবে। তিনি আমাকে কুরআনের সেই আয়াত সম্পর্কে বলতেন যা হযরত ইবরাহীম তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "আপনি এই সব জড় পদার্থের পূজা করেন যেগুলো শোনে না, বলতে পারে না, কিছু করতে পারে না। আপনি আমার সাথে আসুন। আমি আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাব।" আর আমার মা আমাকে বলতেন, "তুমি সে সব মূর্তি পূজারীদের সেই পবিত্র মা'বুদের পথ দেখাবে যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল (স.)।" আমার মা'র এসব কথা শুনে আব্বা বলতেন, "তোমার মা'র আকীদা সঠিক কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা অলীক। কারণ, গরীবের সন্তান সুখ্যাতি পায় না, ওদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, বীরত্ব থাকে না, তারা হয় পরমুখাপেক্ষী ও কাপুরুষ। সুখ্যাতি অর্জন করতে হলে বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠ হতে হয় এবং শাসক রাজা-বাদশাহদের সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে হয়। ন্যায় নিষ্ঠা দিয়ে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে হয় কিন্তু গরীবের সন্তনদের চরিত্রে এসব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে না, ঘটাতেই পারে না, সৎ গুণাবলী অর্জনের সুযোগই তারা পায় না।"

আলপ্তগীন বললেন, তবে আমি বিশ্বাস করি, গরীবের সন্তানও বড় হতে পারে। কেন পারবে না, আরবের বেদুইন উট ও মেষ রাখালরা যদি সত্যের

আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আধা পৃথিবীর রাজত্ব করতে পারে তাহলে তুমি কেন পারবে না? বুঝতে হবে, যাযাবরের সন্তানরা এবং গোলাম হওয়ার পরও তুমি এখন আমার সাথে পাশাপাশি বসে আছ। কোন জাত-গোলাম এমনটি স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আমার মনে হয়, তোমার মায়ের স্বপ্ন সফল হবে। তোমার বিশ্বাস, আস্থা ও কর্মনিষ্ঠা তোমাকে এ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আমি তোমার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। তুমি যদি চেষ্টা কর তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে অবশ্যই।

আমার নিজের জন্যে কোন চাহিদা নেই। কোন পদ-পদবীর আগ্রহ আমার নেই। তবে আমি অবশ্যই একটা কিছু প্রত্যাশা করি, কিন্তু সেটা কি তা বুঝাতে পারবো না। বলল সুবক্তগীন।

হেসে ফেটে পড়লেন আলপ্তগীন। বললেন, এমন অবস্থা আমারো গেছে। আমিও বুঝে উঠতে পারতাম না আমার কি করা উচিত। সময়ই আমাকে বলে দিয়েছে আমার কি করণীয় ও কর্তব্য। তুমিও অচিরেই বুঝতে পারবে, কি তুমি চাও, কি তোমাকে করতে হবে। আজ থেকে তুমি নিজেকে আর গোলাম মনে করো না। এখন থেকে তুমি স্বাধীন। শুধু স্বাধীন নও, আমার প্রশাসনের একজন সম্মানিত জিম্মাদার ব্যক্তি।

সুবক্তগীনের হৃদয়ে ছিল এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। মিথ্যাকে দূর করে সত্যের বিজয় কেতন উড়ানো, মানুষের বিশ্বাসের নোংরামি দূর করে তাদের সঠিক পথের দিশা দেয়া এবং সুন্দরের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে চাইত কিন্তু পরিস্থিতি তাকে দমিয়ে রাখতো। এতটুকু সে বুঝতো, একটি নির্ভেজাল, সুন্দর, সত্য দিন দিন তার মধ্যে পুষ্ট হচ্ছে, বেড়ে উঠছে। তারুণ্য যৌবনের তাড়না তার মাঝে ছিল না এমন নয়, কিন্তু তা কখনও তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারত না। সে প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছে, বিপ্লব তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এক যুদ্ধ-বিজয় তার হৃদয়ে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে।

পরদিন পড়ন্ত বিকেলে আস্তাবল থেকে একটি তাজী ঘোড়া নিয়ে ভ্রমণের জন্যে বেরিয়ে গেল। শহর থেকে বেরিয়ে সুবক্তগীন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং জোরছে ঘোড়া ছুটাল। ধুলি উড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সওয়ারী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো নারী কণ্ঠে আর্তনাদ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, এক সওয়ারী ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছে, লাগামহীন ঘোড়া ছুটছে, ঝুলে রয়েছে মহিলা আরোহী। সুবক্তগীন বুঝতে পারল, ঘোড়ার জীন ঢিলে হওয়ায় সওয়ারী এদিক

সেদিক হেলে পড়ছিল। ঘোড়া এই সুযোগে সওয়ারীকে ফেলে দিয়েছে। মগড়া স্বভাবের ঘোড়া সাধারণত এমনটিই করে থাকে অথবা সওয়ারী এদিক ওদিক হেলে পড়ার কারণে ঘোড়া ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সওয়ারী ফেলে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এ কাণ্ড করেছে। সুবক্তগীন তার ঘোড়া মহিলার দিকে ছুটাল।

ঘোড়াটি এলোপাতাড়ি দৌড়াচ্ছিল। মহিলা শুধু চিৎকারই করছিল আর বলছিল, রিকাব থেকে অমার পা ছাড়িয়ে দাও, লাগামটা ছিঁড়ে ফেল, কিন্তু ভড়কে যাওয়া ঘোড়া ওর পিছনে অন্য সওয়ারীর আগমনে বেসামাল হয়ে এদিকে ওদিকে এঁকে বেঁকে প্রাণপণে পলায়নের চেষ্টায় দ্রুত গতিতে দৌড়াতে শুরু করল। পাশেই ছিল বহতা নদী। দিকভ্রান্ত ঘোড়া শেষ পর্যন্ত নদীর দিকেই ধাবিত হল। সুবক্তগীন নিজের ঘোড়াকে আরো তীব্র বেগে ছুটাল। বিদ্যুত গতিতে তার ঘোড়া পলায়নপর ঘোড়াকে তাড়িয়ে ছুটল। এক পর্যায়ে সুবক্তগীনের ঘোড়া মহিলার ঘোড়ার গতিরোধ করতে আগে বেড়ে পথ রোধ করতে চাইল। সুবক্তগীন তখন লক্ষ্য করল, এতো সাধারণ কোন মহিলা নয়। এতো আমীর বা রাজকন্যা হবে। উদ্ভিন্ন যৌবনা, উর্বষী তরুণী। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলেছে, ওড়না রেকাব আর লাগামে পেঁচিয়ে বেচারীর দুর্দশা আরো বাড়িয়েছে। সুবক্তগীন চকিতে হাত বাড়িয়ে রেকাবে আটকে যাওয়া তরণীর পা ছাড়িয়ে দিল এবং ত্বরিৎ গতিতে তরুণীর ঘোড়ার লাগাম ওর মুখের কাছ থেকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল। তরুণীকে সে নির্দেশের সুরে বলল, তুমি লাফ দিয়ে আমার ঘোড়ায় উঠে আস। মুখের কথা শেষ না হতেই সে নিজের ঘোড়া থেকে নেমে ওই ঘোড়াটাকে বাগে আনার চেষ্টা করল। ইত্যবসরে তরুণীর ঘোড়া হেচকা টান মেরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টানের তীব্রতা সামলাতে না পেরে তরুণীও ছিটকে পড়ল পানিতে।

পাহাড়ী নদী। প্রচণ্ড স্রোত। তরুণী পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে সাঁতরাবার চেষ্টা করছিল। ঘোড়া ওকে ফেলে থমকে দাঁড়ায়। সুবক্তগীন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণীকে উদ্ধার করতে। তার ধারণা ছিল তরুণী হয়তো সাঁতরে উঠতে পারবে না। সে তরুণীকে নিজের কাঁধে তুলে তীরে রাখা ঘোড়া দু'টিকে ধরে একসাথে এনে দাঁড় করাল। এমন দুরবস্থার শিকার হয়ে যে কোন তরুণীর ঘাবড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তরুণী ভীত হওয়া তো দূরে থাক সুবক্তগীনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

তুমি বোকা না দুঃসাহসী! আজ তোমার মৃত্যু অবধারিত ছিল। বলল সুবক্তগীন।

আমি এমন বাপের বেটি যিনি বোকা নন সাহসী। বলল তরুণী। আমি বুখারার শাসক আলপ্তগীনের কন্যা। চলো, তোমাকে পুরস্কার দেবো। তুমি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছো।

না, আমার এই পুরস্কারই যথেষ্ট যে, আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর কন্যাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছি। আমি তোমার ঘোড়ার জীন বেঁধে দিচ্ছি।

তরুণী আর সুবক্তগীনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান তেমন নয়। উভয়েই তরুণ। টগবগে যুবক-যুবতী। তরুণী প্রাণোচ্ছল, সুদর্শনা, পটলচেরা চাহনী, মসৃণ ত্বক ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারিণী। সুবক্তগীনের গায়ের রং পোড়ানো তামাটে হলেও তার দেহের গড়ন পৌরুষদীপ্ত, সুঠাম ও আকর্ষণীয়। উভয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পাশাপাশি বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে। পথে যেতে যেতে তরুণী যুবককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, কি তার পরিচয়, তার ঠিকানা কোথায়। সুবক্তগীন তার জীবন ও এখানে আগমন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে তরুণীকে বলল।

রাতে আব্বা তোমার কথাই বাড়িতে আলোচনা করেছিলেন। তিনি হয়তো সেনাবাহিনীতে তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করবেন।

নিজের সেনা বাহিনী! সেনাবাহিনী তার হয় কি করে, সেনাবাহিনী তো থাকে কেন্দ্রীয় শাসকের অধীনে!

তোমার কথা ঠিক, কিন্তু আব্বা হয়তো অন্য কিছু ভাবছেন। তিনি হয়তো হুকুমত নিজের কব্জায় নিতে চাচ্ছেন। এ জন্য বুখারাতে যে সেনা ইউনিট রয়েছে এদের মধ্যে নিজস্ব লোকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় শাসন এখন শিথিল হয়ে গেছে, তারা আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসে ডুবে আছে। এরা ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তি করছে, ধর্ম সম্পর্কে এদের অনাস্থা মাত্রা ছড়িয়ে গেছে। তিনি এই জমিনে প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় একান্ত আগ্রহী। গত রাতে তোমার সম্পর্কে তিনি বলছিলেন, যুবকটি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও কুশলী।

বাড়ির সদর গেটে উচ্চ পদবীর এক লোককে তারা অতিক্রম করছিল। লোকটি তরুণী ও সুবক্তগীনকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল। তরুণী ও সুবক্তগীন উভয়ের কাপড় ভেজা, তখনো কাপড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। তরুণীর ভেজা কাপড় সেঁটে গিয়েছিল গায়ের সাথে। তার নারী অঙ্গগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সিক্ত বসনে। মাথার চুলগুলো ছড়ানো পিঠে-কাঁধে। তার চেহারা রক্তিম। রাগে গড়গড় করছিল লোকটি। চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। উভয়ে লোকটির কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তরুণীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল লোকটি। এই ছোকড়া কে?

হু, আপনি কে যে একেবারে হাকিমের মতো জেরা শুরু করেছেন? তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল তরুণী। আমার ঘোড়া বেসামাল হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, রেকাবীতে পা আটকে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। এ লোক আমাকে উদ্ধার করেছে। বুঝলেন হাকিম সাহেব! কিছুটা তাচ্ছিল্য বর্ষণ করে তরুণী সুবক্তগীনের বাজু ধরে তাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

এ লোক কে? তরুণীকে জিজ্ঞেস করল সুবক্তগীন। আমার বাগদত্তা। এখন থেকেই আমার উপর তিনি কর্তৃত্ব চালাতে চাচ্ছেন, কথায় কথায় হুকুম করেন, আগ বেড়ে খবরদারী চালান। কিছুটা শ্লেষমাখা কণ্ঠে বলল তরুণী। তুমি একে পাত্তা দিও না, ভয় করারও কিছু নেই।

হঠাৎ তরুণী সুবক্তগীনের বাজু ধরে বলল, তোমার কি স্ত্রী আছে, তুমি কি বিবাহিত?

না।

কোন মেয়েকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? কারো সাথে কি তোমার ভাব নেই?

না। মেয়েদের প্রতি আমি কখনও দৃষ্টি দেই নি। এই সুযোগও আমার নেই।

তরুণী আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, আমাকে কি তোমার ভালো লাগছে না? নিরুত্তর সুবক্তগীন। তরুণীর কথায় সে দৃষ্টি অবনত করে ফেলল।

হু, তুমি আমাকে বেহায়া মনে করছো, তাই না? বলো, বলো সুবক্তগীন! যদি তুমি আমাকে বেহায়া ও বখাটে মেয়ে ভেবে থাকো তাহলে আর কখনও তোমার দৃষ্টিসীমায় আসবো না।

তোমাকে ভাল লাগা না লাগার কি আছে, তুমি তো আরেকজনের বাগদত্তা!

এটা আমার পারিবারিক পছন্দ। ওই না-মরদটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। সে আমাকে দাসী বানাতে চায়। সে আমাকে ঘোড়-সওয়ারী হতে বারণ করে। সে চায়, আমি শুধু তার হেরেমের শোভা বর্ধন করি। চার দেয়ালের ভেতরে আবদ্ধ হয়ে থাকি। ওসব আমার অসহ্য। আমি চাই এমন লোক যে তোমার মতো সুপুরুষ, যে আমার পাশাপাশি ঘোড়া দৌড়াবে, নদীতে ঝাঁপ দেবে। ওসব আয়েশী রাজা-বাদশাহদের বুঝিয়ে দিতে চাই, নারী শুধু হেরেমের শোভা বর্ধনের উপকরণ নয়, নারীর দেহ শুধু পুরুষের কামরিপু

চরিতার্থ করার ক্ষেত্র নয়। তারা নারীকে ভোগের দাসী বানিয়ে নিজেরা মদে ডুবে থেকে ইসলামের অপমান করছে। আমি বুঝিয়ে দেব, ইসলাম নারীকে দিয়েছে মাতৃত্বের সম্মান, স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার। সমাজ-সংসারে নারীরও দায়িত্ব আছে। সেও দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে ভাববার দাবিদার। আমি ওদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই, হেরেমের বাইরে বের হলেই নারী নষ্ট হয়ে যায় না, এতে নারীর শাশ্বত সত্তার পবিত্রতাও নষ্ট হয় না। ওরা চায়, নারীরা হেরেম নামের জিন্দান খানায় বাইজী হয়ে বহু পুরুষের ভোগের সামগ্রী হোক। ওদের ধারণা, নারী হলো শুধুই ভোগের বস্তু। তারা মনে করে, কর্তৃত্ব আর বীরত্বের তকমা গলায় বেঁধে দাস-দাসী ও বাইজীর আসর জমানোই হলো বীরত্ব। নারীও যে সত্যিকার অর্থে বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে, পারে ইসলামের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দীনের স্তম্ভকে শক্তিশালী করতে তা ওরা ভুলে গেছে। আজ মুসলিম নেতৃবর্গ ইজ্জত নয় জিল্লতির জীবন যাপন করছে। কেন, এর কারণও ওরা খুঁজে দেখতে চাচ্ছে না। মু'মেন নারী যে বিরাট শক্তির আধার তা নতুন করে ওদের আমি জানিয়ে দিতে চাই।

সুবক্তগীন! মদে-মাতাল ওসব শাসকের হেমেরে কখনও বীরপুরুষ জন্ম নিতে পারে না, ওদের ঘরে কাপুরুষই বেড়ে ওঠে। ইসলামের পতাকা বহন করার হিম্মত ওদের হয় না। ওদের জন্মই ইসলাম অবমাননার কারণ। আমি এমন সন্তানের মা হতে চাই, যে ইসলামের খাদেম হবে, ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করবে। শুধু আলেম ও মুবাল্লিগের বেশে নয় বিজয়ী বীরের বেশে। কূটনীতিতে সে সফল হবে, যার তরবারীতে শক্তি বেশি থাকবে। একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ক্ষোভে উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল তরুণী।

আমার মাও তোমার মতোই স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের ছেলে দাস হিসেবে আদম বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে।

ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী তোমার মতো গোলাম আর আমার আব্বুর মতো আদর্শবান দাসরাই হতে পারে। কেন, আমার আব্বু তোমাকে বলেননি যে, তিনিও তোমার মতোই আদম বাজারে দাস হিসেবেই বিক্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের কর্মনিষ্ঠা ও সততার জোরে আজ তাঁর অবস্থান এবং মর্যাদা দেখো। দেখো তাঁর কর্মতৎপরতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

তোমাকে কে বললো যে, তোমার গর্ভে যে ছেলের জন্ম হবে সে বাহাদুর আর দীনের সিপাহসালার হবে। এটা তোমার তারুণ্যের আবেগ, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা।

এটা আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘ দিনের লালিত বাসনা। এটা আমার অস্তিত্বের চাওয়া, আমার নারী মনের আর্তি। আমার এই আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধকে তুমি যৌবনের আবেগ, শব্দের ব্যঞ্জনা আর খেয়ালীপনা মনে করো না সুবক্তগীন! হ্যাঁ। তুমি আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে পারো, কিন্তু আমার ইচ্ছা ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে অপমান করো না। আমি ওই গবেটটাকে কিছুতেই স্বামীত্বে বরণ করতে পারবো না। আবেগ ও উত্তেজনায় কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে ফেলল তরুণী।

সুবক্তগীন ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। মনের মধ্যে তার তুমুল ঝড়। জীবনের গতি সম্পর্কে এখনও সে স্থির নয়। বুঝে উঠতে পারছিল না, আশৈশব লালিত তার আকাঙ্ক্ষা ও মায়ের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করবে কিনা। এমন সময় এই তরুণীর কথা তার হৃদয়ে চেপে থাকা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে তুলল। সুবক্তগীন কল্পনাও করতে পারেনি, কোন রাজ হেরেমে এমন ঈমানদীপ্ত তরুণী থাকতে পারে, ইসলামী ঈমান আকীদার দুর্গরূপী এমন মেয়েও জগতে আছে।

বহুদিন পরে তার সুপ্ত বেদনা আবার উথলে উঠল, স্মৃতিগুলো ভাস্বর হয়ে দৃশ্যমান হতে থাকল। জীবনে মা ছাড়া তার অনুভবে কোন নারীর অস্তিত্ব নেই। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় মায়ের কোলের উষ্ণতা পেলে প্রশান্তিতে ভরে যেতো তার দেহমন। মা তাকে পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ঘুম পড়াতেন, কোলে নিয়ে আদর করতেন, তার স্বপ্নের কথা বলতেন, খ্যাতিমান হওয়ার সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতেন। আর আজ এই তরুণী তার মায়ের স্বপ্নেরই পুনরাবৃত্তি করছে। একই আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ওর কণ্ঠে।

অথচ সে এই যুবতীকে যখন পিঠে করে নদী থেকে উদ্ধার করেছিল, তখন তরুণী তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল দু'হাতে, তার ভেজা বসন লেপ্টে গিয়ে শরীরের ভাঁজ ও নারী-চিহ্নগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু একটি বিপদাপন্ন তরুণীকে উদ্ধারের ব্রত ভিন্ন কিছুই তখন ভাবতে পারেনি সুবক্তগীন। তরুণীর তপ্তশ্বাস ও হৃদয় মোহিনী হাসিও তার মধ্যে কোন তারল্যের উদ্ভব ঘটাতে পারেনি। কিন্তু এখন কী হলো, সব কিছুই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। অজানা ভবিষ্যত, আবাল্য স্বপ্ন, মায়ের সাধ আর তরুণীর নিবেদনে কেমন যেন উদভ্রান্ত করে তুলছে তাকে প্রতিক্ষণ। প্রচণ্ড এক আলোড়ন অনুভব করছে মনের মধ্যে সুবক্তগীন। তরুণীর কথাগুলো বারবার কানে বাজছে তার। সে ঠিকই বলেছে, সম্পদ ও ক্ষমতার সুযোগে আমীর-উমারার হেরেমগুলো জাহান্নামে পরিণত

হয়েছে। যে নারী ছিল প্রশান্তির আধার, তাদের আজ শারীরিক উত্তেজনা উপশমের উপাদানে পরিণত করা হয়েছে।

পুরুষ আজ আর এক নারীতে তৃপ্ত নয়। ধৈর্য, স্থিরতা, নীতি, আদর্শ, বীরত্ব, বাহাদুরী সবই শাসক শ্রেণীর লোকেরা মদ আর নারী ভোগে খুইয়ে ফেলেছে। শুধু নারীসঙ্গ ভোগের জন্যে মুসলিম সমাজের মাথাগুলো রাজা-বাদশাহকে তোষামোদ করে দামী উপঢৌকন দেয়, শাসকদের মধ্যে বিরোধ বাধায়, নিজের জাতি-ধর্মের ইজ্জত হুরমত ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে ঈমানের সওদা করে। তারপরও যখন স্বস্তি পায় না, নিশ্চিত করতে পারে না দূরাকাঙ্ক্ষা, তখন কওম ও জাতির সর্বনাশ করতে গিয়ে দুশমনদের ভূতখানায় হাজিরা দিয়ে স্বস্তি আর সুখ নিশ্চিত করে। অধঃপতনের এসব কিছুর শুরুটা নারীর থেকেই ঘটে। মুসলিম মাতৃত্বকে হত্যা করে পুরুষের ঔরসকে কলঙ্কিত করে আমীর-উমরা শ্রেণী শুধু নিজেদের অস্তিত্বের ভিতে ধস্‌ই নামায় না, মাযহাব ও মিল্লাতের ভিত্তিকেও গুঁড়িয়ে দেয়। আমিও কি সে পথেই অগ্রসর হচ্ছি? অবশ্য ভোগবাদীরা সমূলে ধ্বংস করতে চাচ্ছে এই শক্তিটাকে।

"নারী কোন সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিলাস সামগ্রী নয়, নারী নির্মলতার প্রতিচ্ছবি, অফুরন্ত জীবনী শক্তির আধার।" তরুণীর আবেগাপ্লুত এই কথাগুলো তোলপাড় সৃষ্টি করে সুবক্তগীনের মনে।

সুবক্তগীনের মনে পড়ল তার মায়ের স্মৃতি। এক আমীর বহু মূল্য, বিলাস-ব্যসন ও মণি-মুক্তার টোপ দিয়ে তার মাকে খরিদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পূতঃপবিত্র মা সোনাদানা মণিমুক্তা আর বিলাস ব্যসনকে লাথি মেরে ঝুপড়িতে ফিরে এসেছিলেন ভিখারিণীর বেশে। নিজের আদর্শ ও পবিত্রতা রক্ষায়, ইসলাম ও ঈমানের শুভ্রতা রক্ষায় সর্বস্ব ফেলে পথে নেমেছিলেন স্বামীকে নিয়ে। তবুও নিজের বিশ্বাস ও পবিত্রতাকে কলঙ্কিত হতে দেননি। জাগতিক সুখের সওদা করেননি ঈমানের রত্ন দিয়ে। আলপ্তগীনের মেয়ের মতো তার মাও চেয়েছিলেন এক বাহাদুর সন্তানের মা হতে। রক্ষিতা হতে চাননি কারো। তার মনে বাবার মতোই সংশয় দোলা দিল, "মেয়েরা কি তাহলে এমন স্বপ্নবিলাসী, কল্পনাপ্রবণই হয়ে থাকে?" পরক্ষণেই মনে পড়ল উস্তাদজীর কথা। উস্তাদজী বলেছিলেন, "ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক নওশেরোয়াও মায়ের উদরেই জন্ম লাভ করেছেন। নারীকে যদি তামাশা আর ভোগের পণ্য বানিয়ে ফেলা হয় তবে তাদের গর্ভে আর জন্ম নেবে না তারেক, মুসা ও নওশেরোয়া।"

গভর্ণর হাউজ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে অধমুখে আস্তাবলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ইত্যাকার ভাবনায় ডুবে যায় সুবক্তগীন। সেই সাথে তরুণীর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করল মনের গহীনে। মনে মনে বলল, অনন্য এই তরুণী। ওর সাথে অন্য হেরেমের অন্য ললনাদের তুলনাই অর্থহীন। তরুণী তাকে বলেছে, সে আবার আমার সাথে দেখা করতে অবশ্যই আসবে। এসব কথা ভেবে তরুণীর মধ্যে কেমন যেন আস্থা অনুভব করল সুবক্তগীন।

এই দাঁড়াও!

আধো প্রেম, আধো সংকট, আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে আনমনে হাঁটছিল সুবক্তগীন। জগতের অন্য কিছুর প্রতি খেয়ালই ছিল না তার। হঠাৎ কর্কশ ডাকে সম্বিত ফিরে দেখল, তরুণীর বাগদত্তা দ্রুত পায়ে তার দিকে আসছে। সে দাঁড়াল।

রক্তচক্ষু আগন্তুকের। গর্জে উঠে সুবক্তগীনের উদ্দেশে বলল, হাজী নসর-এর বিক্রিত গোলামকে যেন আর কোনদিন শাহজাদীর আঙ্গিনা মাড়াতে না দেখি। তুমি যদি বুখারার শাসনকর্তার মেয়েকে নদী থেকে উদ্ধার করেও থাকো, সেটা তোমার আহামরি কোন বাহাদুরি নয়। এ ছিল তোমার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করলে বরঞ্চ আমরা তোমাকে জেলখানায় আটকে না খাইয়ে হত্যা করতাম। এ কাজের জন্যে পুরস্কারের যোগ্য নও তুমি।

আমি গোলাম নই, স্বাধীন। বরঞ্চ গোলাম আপনি। খুব মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল সুবক্তগীন।

অ্যা! এত স্পর্ধা! ছোট মুখে বড় কথা! শুনে রাখ, আর কোনদিন অনুমতি ছাড়া আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে পারবে না! ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল তরুণীর বাদগত্তা।

তুমি তো নসরের গোলাম– বলল সুবক্তগীন।

তোর দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলব! কোমরে বাঁধা তরবারী কোষমুক্ত করে বাঘের মতো গর্জে উঠল ভাটাপড়া যৌবনের অধিকারী পৌঢ়-প্রায় লোকটি।

সুবক্তগীনের কোমরেও খঞ্জর ছিল। সে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে কোমর থেকে খঞ্জর বের করে বলল, দেড়হাত লম্বা তরবারী যদি আধহাত খঞ্জর দিয়ে আমার পায়ের নীচে না ফেলতে পারি, তবে তোমার তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেবো। আমার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দিও আপত্তি নেই, কিন্তু এর আগে তোমার বাগদত্তা শাহজাদীকে জিজ্ঞেস করে এসো যে, সে তোমাকে ভালোবাসে, না ঘৃণা করে!

লোকটি সুবক্তগীনের সাহস ও আত্মবল পরখ করল। কিছুক্ষণ দূর থেকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে রাগে গড় গড় করে তরবারী কোষবদ্ধ করে স্থান ত্যাগ করল। সুবক্তগীন পুনরায় খঞ্জর কোমরে গুঁজে ঘোড়ায় চড়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার আঁধার চতুর্দিকে ছেয়ে গেছে। আস্তাবলে ঘোড়া রেখে মাত্র নিজের থাকার ঘরে প্রবেশ করেছে সুবক্তগীন। তখনই এক লোক খবর দিল, গভর্ণর আপনাকে তলব করেছেন। ভেজা কাপড়েই গভর্ণর হাউজের দিকে রওয়ানা হল সুবক্তগীন।

আবু ইসহাকের সাথে কি নিয়ে ঝগড়া করলে? জিজ্ঞেস করলেন গভর্ণর আলপ্তগীন।

সুবক্তগীন তাকে ঘটনা বিস্তারিত বলল। একথাও বললো, যা তার মেয়ে তার উদ্দেশ্যে বলেছে। সুবক্তগীনের অকপট ও অকৃত্রিম বক্তব্য ভাল লাগল গভর্ণরের কাছে।

আমার একটা অনুরোধ জাঁহাপনা। আপনার আদুরে মেয়েকে আমার মতো হতচ্ছাড়ার হাতে তুলে না দেওয়াই ভাল। কিন্তু আমি আপনাকে করজোড়ে নিবেদন করছি, ওই লোকের হাতে ওকে সোপর্দ করা মোটেই ঠিক হবে না। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন গভর্ণর। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন, এখন তুমি গিয়ে আরাম কর সুবক্তগীন। পরে তোমাকে ডাকব।

জাঁহাপনা! আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করার মত কোন অপরাধ আমি করিনি। মিথ্যা কথা আমি কখনো বলি না।

আলপ্তগীন মুচকি হেসে তাকে চলে যাওয়ার জন্যে ইশারা করলেন। সুবক্তগীন গভর্ণর হাউজ থেকে নিজের থাকার ঘরে চলে এল।

পরদিন আলপ্তগীনের কন্যা প্রতিদিনের মতো ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সুবক্তগীনও আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে নদীর তীরের দিকে চলল। প্রথম দিকে দু'জন দু'দিকেই ঘোড়া দৌড়াল। অনেক দূর গিয়ে উভয়ে নদীর তীরের দিকে গতি ঘুরিয়ে দিল। নদীর তীরে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে এসে উভয়ে মুখোমুখি হল এবং ঘোড়া থেকে নেমে নদীর তীরের সবুজ ঘাসের উপর গিয়ে বসল।

ওই গবেটটা আমার কাছে গিয়েছিল। বাগদত্তা সম্পর্কে বলল তরুণী। খুব রেগে ছিল। আমাকে বলল, 'আমি সেনাবাহিনীর কমান্ডার। তুমি একটি

গোলামের সাথে আমার সম্পর্কে কটুক্তি করে বলেছো, তুমি আমাকে পছন্দ করো না। আমাকে এমন অপদস্ত করার হেতু কি?' সে প্রথমে আমাকে খুব ধমকালো, পরে আবার হাতজোড় করে মিন মিন করতে লাগল। আমি ওকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, 'পিতার মর্যাদা রক্ষার খাতিরে আমি তোমার বাগদত্তা হতে রাজী হয়েছিলাম। তাকে বললাম, এ ব্যাপারে তুমি আব্বার সাথে কথা বল।'

রাতে আব্বা আমাকে একাকী ডেকে বললেন, সুবক্তগীন আমার কাছে তোমাদের পূর্বাপর সব ঘটনা বলে দিয়েছে। আব্বা তোমার অকপট সত্যবাদিতায় দারুণ খুশি হয়েছেন। তোমার সাহসী উচ্চারণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমি আব্বাকে বলে দিয়েছি, এই বাগদত্তা আমার একদম সহ্য হয় না। অবশ্য সে খুব বড় অফিসার। মনে হয় আজ দিনের কোন এক সময় সে আব্বার সাথে এ নিয়ে কথাও বলেছে।

সুবক্তগীন তরুণীকে গভীরভাবে দেখছিল। গতকালের চেয়ে আজ তাকে আরো বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছিল। তরুণী সুবক্তগীনের হাত তার হাতে নিয়ে খেলছিল আর সুবক্তগীনও গভীর দৃষ্টিতে তাকে পরখ করছিল। তারা পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল। তরুণী তার শরীর ঘেঁষে বসে চোখে চোখ রেখে অনর্গল কথা বলছিল। সুবক্তগীন তরুণীর কথা ও রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলল, "তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে।"

"তোমার ছেলেও এই কথাই বলবে।" বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল তরুণী।

সূর্য নদীর ওপারের টিলার আড়ালে শেষ আলো বিকিরণ করে ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিমাকাশে সূর্যের লালিমা ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। আর এপারে দু' যুবক-যুবতী হাতে হাতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনছে।

মাসখানিক পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে আলপ্তগীনের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিল সুবক্তগীন। আলপ্তগীন তাকে একান্ত সচিবের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে বললেন, "মুসলিম জাতির চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে। শাসকশ্রেণী আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। রাজ্যগুলো প্রতিদিন টুকরো টুকরো হচ্ছে। বেঈমান আমীররা প্রধান শাসককে ভোগবাদে নিমজ্জিত করে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করছে জাতির মাঝে। আমাদের নেতারা বেঈমানদের দেয়া পুরিয়া গিলে পরস্পর খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়েছে। যে খেলাফত ছিলো মুসলমানের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র তা এখন খেয়ালী রাজার সিংহাসনে পরিণত হয়েছে। সুলতান আব্দুল মালেক আমাদের কেন্দ্রীয় শাসক। তিনি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন।

অথচ তার সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকারদের মধ্যে এখনই বিবাদ শুরু হয়ে গেছে। আমরা চাচ্ছি, সুলতানের অবর্তমানে তার কনিষ্ঠ ছেলেকে সিংহাসনে বসাব। কিন্তু বড় সাহেবজাদা আমীর মনসুর তা কখনও হতে দিতে চাইবেন না। এই ফাঁকে আমি গজনীকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা ঘোষণা করব।"

আপনার সেনাবাহিনী বিশেষ করে যারা বুখারায় আছেন তারা আপনার সহযোগিতা করবে? জানতে চাইলো সুবক্তগীন।

এখানকার সেনাপতি কেন্দ্রের চেয়ে বেশি আমার অনুগত। কেন্দ্রের প্রতি সে খুবই ক্ষুব্ধ। আমার নির্দেশ পালনে সে গর্ববোধ করে, আমার নীতি-আদর্শের প্রতি সেনাপতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। আমি আশা করি, গজনীকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এ অঞ্চলের ছোট ছোট রাজ্যগুলো একত্রিত করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হবো। আমরা যদি এটা করে যেতে না পারি তাহলে আমার ভয় হয়, টুকরো টুকরো মুসলিম রাজ্যগুলো কাফেরদের চক্রান্তে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। ওদের বিজয় স্রোতে মদ, নারী আর বিলাসিতায় আচ্ছন্ন মুসলিম আমীররা খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাবে। এই জমিন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মুসলিম শাসনের নাম নিশানা। আমি শুনতে পেলাম, হিন্দুস্তানের মহারাজা খায়বার গিরিপথ দিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছে।

গজনীর তখত উল্টে ফেলার কাজটা আমাকে সোপর্দ করতে পারেন। এজন্য তেমন কোন সৈন্য সমাবেশের দরকার হবে না। মনসুর ও মনসুর-এর সহযোগী শাসকদের গ্রেফতার করাও তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দিকগুলো আরো গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সম্ভাবনা ও আশংকাগুলো চিহ্নিত করে সামনে এগুতে হবে আমাদের। বললো সুবক্তগীন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুবক্তগীন আরো বলল, "এখনও উপযুক্ত সময় হয়নি। এ ধরনের পরিকল্পনার সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে গোপনীয়তার উপর। আপনার মেয়ের মুখে আপনার পরিকল্পনার কথা আমি শুনেছি। অথচ এ সব ব্যাপার তাদের জানার কথা নয়। আপনাকে আরো গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে। আপনার পরিকল্পনা যদি প্রকাশ না পায়, আর অন্যদের তৎপরতার আগাম খবর যদি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে যুদ্ধের অর্ধেক বিজয় এমনিতেই হয়ে যায়।"

আলপ্তগীনের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যে, সুবক্তগীন যোগ্য সালার ও বুদ্ধিদীপ্ত যুবক। কিন্তু সে এতোটা দূরদর্শী তা আগে অনুধাবন করতে পারেননি। যুদ্ধ পরিকল্পনায় তার ভুলগুলো সুবক্তগীন এমন সরল ও সুনিপুণভাবে বুঝিয়ে দিল, যার ফলে আলপ্তগীন আস্থার সাথে যুদ্ধকৌশল নির্ধারণের কাজ তার উপর ন্যস্ত করলেন। কিন্তু সুবক্তগীন তার অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার কথা সামনে তুলে ধরে বলল, পরিকল্পনা আপনি করুন, আমি নিজেকে এ কাজে উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত আছি।

দীর্ঘ পর্যালোচনার পর নতুন একটি রণকৌশল চূড়ান্ত করা হলো। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারটি আবারো আলপ্তগীনকে স্মরণ করিয়ে দিল সুবক্তগীন।

ওদিকে যখন গজনীকে ইসলামী সালতানাতের কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো, এদিকে তখন সুবক্তগীনকে হত্যার পরিকল্পনাও পাকা হয়ে গেছে। এ পরিকল্পনার নায়ক আলপ্তগীনের কন্যার বাগদত্তা আবু ইসহাক। এরা রাতে একটি সামরিক মহড়ার পরিকল্পনা করল। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি সামরিক মহড়ায় সুবক্তগীনকে দাওয়াত দেয়া হল। আবু ইসহাক নিজেও সেই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করবে।

অনেকগুলো রথ-গাড়ীতে ঘোড়া জুড়ে দেয়া হল। আবু ইসহাক ও সুবক্তগীনের জন্য বরাদ্দ করা হলো প্রথম সারির বিশটি রথের দু'টি। মহড়া শুরু হল। বাতাসের বেগে তাজী ঘোড়া রথ নিয়ে দৌড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবু ইসহাক সুবক্তগীনের রথকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে তার রথ এগিয়ে নিল। সুবক্তগীন লক্ষ্য করল, আবু ইসহাক উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে একদিকে চেপে রাখতে চাচ্ছে, আর বারবার সে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন পরখ করছে। রথের ঘোড়া দৌড়াচ্ছে ঊর্ধশ্বাসে। ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে ভেবে সুবক্তগীন তার ঘোড়া আগ বাড়িয়ে আবু ইসহাকের রথকে ঠেলে সোজা চলতে তৎপর হলো। সাধারণ দর্শকরা একে দুই বড় কর্মকর্তার লড়াই ভেবে চিৎকার করে ময়দান মুখরিত করে তুলল। সারা ময়দান জুড়ে বিশেষ মহড়া দেখার জন্যে অসংখ্য লোক সমাগম হল। সকলের মুখে উল্লাস ও হর্ষধ্বনি। সারা ময়দান অসংখ্য মশালে উদ্ভাসিত, উৎসব মুখর।

সুবক্তগীন অবস্থাদৃষ্টে বুঝে ফেলল, আবু ইসহাকের দৃষ্টি মহড়ায় বিজয়ী হওয়ার চেয়ে তাকে এক পাশে রাখার প্রতি নিবদ্ধ। সুবক্তগীন তার রথ নিয়ে আবু ইসহাকের রথের আগে আগে দৌড়াতে লাগল। আবু ইসহাকের গতিপথ

ঠেলে সোজা চালাতে বাধ্য করছিল। এক পর্যায়ে আবু ইসহাক ঘোড়াতে আঘাত করার হান্টার দিয়ে সুবক্তগীনের মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করল, কিন্তু সুবক্তগীনের রথ তখন আবু ইসহাকের রথ ঠেলে আগে চলে গেছে। হান্টার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আবু ইসহাক চিৎকার দিয়ে বলল, খোদার কসম! তুমি এদিক থেকে সরে যাও! সুবক্তগীন তার ঘোড়াকে দ্রুতগতিতে অপরদিকে ঘুরিয়ে নিল। ইত্যবসরে আবু ইসহাকের ঘোড়া জমিনে ধসে গেল। রথ ছিঁড়ে উপরে উঠে উল্টে জমিনে আছড়ে পড়ে অগ্রভাগ ধসে গেছে। আবু ইসহাক তাল সামলাতে না পেরে শূন্যে উঠে গিয়ে উল্টে যাওয়া রথের নীচে চাপা পড়ল। দ্রুত পিছনে ছুটে আসা রথগুলোকে চালকেরা সামলাতে পারল না। সেগুলো আবু ইসহাকের উল্টে যাওয়া রথকে মাড়িয়ে চলে গেল। আবু ইসহাক রথের চাপে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল। সে আর দাঁড়াতে পারল না। ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হল। সুবক্তগীন নিজের রথকে ঘুরিয়ে যাত্রাস্থলে ফিরে এলো। উৎসব মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল, নেমে এলো বিষাদের ছায়া। হাহাকার বয়ে গেল সবার মুখে। কী হলো? কী হলো?

সবাই দৌড়ে গেল অকুস্থলে। রথের চাকা ও ঘোড়ার খুরের আঘাতে নিহত হল আবু ইসহাক। দেখা গেল, আবু ইসহাকের ঘোড়া গভীর গর্তে ধসে গেছে। উপরে বড় বড় গাছের পাটাতন। অথচ গতকাল পর্যন্ত কেউ কোন গর্ত এখানে দেখেনি। হঠাৎ গর্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। দুর্ঘটনার তদন্ত তখনই শুরু হয়ে গেল। কিভাবে এখানে গভীর গর্ত হল, কি আছে এই দুর্ঘটনার অন্তরালে?

আলপ্তগীন জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এই গর্ত ও দুর্ঘটনার কারণ অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে। কেউ যদি এই গর্তের উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে, তবে তাকে রাজকীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

পরদিন বেলা ডোবার আগেই রহস্য বেরিয়ে পড়ল। জানা গেলো, এই রাতের মহড়ার আয়োজক যেমন আবু ইসহাক, গর্তের নায়কও সে। আবু ইসহাক তার এক বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে সুবক্তগীনকে মহড়ায় অংশ গ্রহণে সম্মত করিয়েছিল, আর অতি সংগোপনে রাতের আঁধারে বিশাল গর্ত খুঁড়ে মাঠে মাটি ছড়িয়ে গর্তের উপরিভাগে গাছের পাটাতন দিয়ে তাজা ঘাস ও মাটি দিয়ে তা ঢেকে দেয়া হয়েছিল। যাতে কেউ গর্তের অস্তিত্ব ঠাহর করতে না পারে। জায়গাটি নিজে চেনার জন্যে একটি আলামত রেখেছিল আবু ইসহাক। এজন্যই দৌড় শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই সে সুবক্তগীনের রথকে ঠেলে গর্তে ফেলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বিচক্ষণ সুবক্তগীন আবু ইসহাকের চক্রান্তের আশঙ্কা আঁচ

করে আগাগোড়া দৌড়ের মধ্যে থেকেও নিজেকে সচেতন রেখেছিল সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে। দুর্ভাগ্যবশত নিজের খনন করা গর্তে আবু ইসহাক নিজেই কুপোকাত হল। আবু ইসহাক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলেছিল, মহড়ার মোড়কে সুবক্তগীনকে হত্যা করে সে আলপ্তগীনের কন্যাকে বিয়ে করবে। পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়ার জন্যেই আবু ইসহাক আয়োজন করেছিল ষড়যন্ত্রের এই সামরিক মহড়া। কিন্তু নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই ফেঁসে গেল।

"আল্লাহ তোমার দ্বারা বড় কোন কাজ নেবেন, এজন্যই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তোমাকে।" বললেন আলপ্তগীন। আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আমার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্যে তুমি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলে সে অনুযায়ী এখনি কাজ শুরু করতে হবে। তুমিই আমার মেয়ের জামাতা হবে, এজন্যে আমি গর্বিত।"

এ ঘটনার প্রায় এক বছর পর গজনীর শাসক আব্দুল মালেক মৃত্যুবরণ করলেন। আলপ্তগীন প্রাণান্ত চেষ্টা করেও আব্দুল মালেকের কনিষ্ঠ পুত্রকে গদীনশীন করাতে ব্যর্থ হলেন। বড় ভাই মনসুরের বর্তমানে বাস্তবায়িত হলো না তার এই স্বপ্ন। দু'দিন পর সুবক্তগীন তিনশ' নির্বাচিত অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে গজনী উপস্থিত হল। সে দৃশ্যত ভাব দেখাল যে, তারা বুখারার গভর্ণরের পক্ষ থেকে নতুন গদীনশীনকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছে। কিন্তু রাজপ্রাসাদে ঢুকেই তারা মনসুরকে গ্রেফতার করল। আর তার সাথীরা পূর্ব নির্দেশনা মতো প্রতিরক্ষা বাহিনীর চৌকিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গজনী বাহিনীকে নিরস্ত্র করে ফেলল। পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্রুত বেগে আলপ্তগীন শহরের প্রধান প্রধান স্থাপনাগুলো দখল করে নিলেন। তিনি অগ্রভাবে সুবক্তগীনকে পাঠিয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শহরের বাইরে অপেক্ষমান ছিলেন, যাতে প্রথম অপারেশনের পর দ্বিতীয় পর্যায় দ্রুততার সাথে সমাধা করা যায়। হাটে-বাজারে, অলি-গলিতে প্রচার করা হলো, "জালেমদের শাসন শেষ, এখন থেকে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন চলবে। আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানমতো শাসন কাজ চালাব"। প্রথম দিন থেকেই ইসলামী অনুশাসন চালু করা হল। দিন যত যেতে লাগল, মানুষ দেখতে পেল, সত্যিকার অর্থেই জুলুম ও নিপীড়নের পরিবর্তে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের মন থেকে জুলুম-অত্যাচারের আতঙ্ক দূর হয়ে গেছে। শাসকদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধা জন্মাতে শুরু করেছে। গজনীর অধিবাসীরা নতুন শাসকদের মোবারকবাদ জানাল হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা উজাড় করে।

ঐতিহাসিকদের মতে ৯৬২ ইংরেজী মোতাবেক ৬৫১ হিজরী সনে আলপ্তগীন গজনীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি সুবক্তগীনকে প্রধান উজীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পর তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেল। পরের বছরই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর ছেলে ইসহাক পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু পিতার মতো ন্যায় ও ইনসাফের পরিবর্তে সে মোসাহেব ও তোষামোদকারীদের বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাকে দিয়ে সুবিধাজনক সব নির্দেশ জারী করিয়ে নিতে থাকলে দেশে আবার অশান্তি দেখা দেয়। জনগণ আবার নতুন হয়রানির কবলে পড়ে।

সুবক্তগীনকে আবার দুঃসাহসী ভূমিকা নিতে হয়। তিনি বাধ্য হয়ে নীতি ও আদর্শচ্যুত শাসক ইসহাককে বন্দী করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন। দেশের মানুষ যখন শুনল, বিপথগামী ইসহাককে বন্দী করে আমীরুল উমারা সুবক্তগীন ক্ষমতাসীন হয়েছেন তখন তারা স্বস্তিবোধ করে এবং শান্তির আশায় আশ্বস্ত হয়।

ইসহাককে ক্ষমতাচ্যুত করাটা সুবক্তগীনের জন্যে ছিল কঠিন বিষয়। এই সুকঠিন ও অসম্ভব কাজটিকেই তিনি সম্ভব করতে পেরেছিলেন মানুষের ভালোবাসা ও আস্থার জোরে।

তাঁর উন্নত চরিত্র, ন্যায় নিষ্ঠা ও সদাচারে সেনাবাহিনীর সিপাই থেকে সালার পর্যন্ত সবাই ছিল তার প্রতি সশ্রদ্ধ ও অনুগত। ন্যায় বিচার ও সততার দ্বারা সাধারণ নাগরিকের হৃদয়ের মণিকোঠায় নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন সুবক্তগীন। নাগরিকরা তার শাসনে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করার অধিকার পেয়েছিল। যার ফলে তার প্রতিটি হুকুম ও নির্দেশ বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষ নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে আশপাশের রাজ্যগুলোকে নিজের কব্জায় নিতে সক্ষম হয়েছিলেন সুবক্তগীন। গঠন করতে পেরেছিলেন এক জীবনবাজী সেনাবাহিনী। গজনীর অবস্থা কিছুটা স্থিতিতে এনেই তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন হিন্দু শাসিত অত্যাচরিত ভারতীয়দের প্রতি।

এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন সুবক্তগীন, তার ঘরের ছাদ ভেদ করে একটি গাছ বেড়ে উঠছে। বাড়তে বাড়তে গাছটি এমন বিশাল ও বিস্তৃত হলো অর্ধেক পৃথিবী সেই গাছের ছায়া ঢেকে নিলো।

স্বপ্ন দেখে খুব বিচলিত হলেন সুবক্তগীন। স্ত্রীকে বললেন স্বপ্নের কথা। স্ত্রী নীরবে শুনলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। এ দিনই তার ঘরে জন্ম নিল প্রথম সন্তান; স্বপ্নের সুবিস্তৃত মহীরুহ। পুত্রের আগমনে তার উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল। এবার স্ত্রী তাকে বললেন, আপনার দেখা স্বপ্ন আপনার চোখের সামনে বাস্তব হয়ে

দেখা দিয়েছে। আমি সেই পুত্রটি প্রসব করেছি যে পৃথিবী থেকে মিথ্যা দূর করবে। আজ মুহররম মাসের দশ তারিখ। আল্লাহর ইঙ্গিত অনুধাবন করে আমাদের তাঁর দরবারে অবনত মস্তকে বিগলিত হৃদয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত।

সুবক্তগীন ছেলের নাম রাখলেন মাহমূদ। দেখতে তার ছেলে খুব একটা হৃদয়গ্রাহী চেহারার অধিকারী না হলেও পিতার সব চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহের কেন্দ্র ছিল এই সন্তান।

অতি শৈশবে-ই পিতা ছেলেকে কুরআন শরীফ হিফ্‌য করালেন। বার বছরের মধ্যে জরুরী কিতাবাদির ইলম শেখার পর্ব শেষ করিয়ে ফেললেন। পনের বছরে পদার্পণ করলে সুবক্তগীন ছেলেকে হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়ে বললেন, "তোমাকে মূর্তিসংহারী হতে হবে।"

গজনীর শহরতলী থেকে একটু দূরে মাঠের মধ্যে একটি মনোরম বাগান। বাগানের মাঝখানে এক দৃষ্টিনন্দিত বালাখানা। বাগানের মনোহারী গাছগাছালি, রঙ বেরঙের হাজারো ফল-ফুলের সমারোহ আর এর পরিপাটি সাজানো গোছানো পরিবেশ বহুদূর থেকেই মানুষের নজর কাড়ে। প্রথমেই তারা ভাবত আলীশান এ কাজ কোন সাধারণ জমিদারের নয়। অবশ্য কোন শাহজাদা কিংবা উজির গড়ে তুলেছে এ বাগান ও সুরম্য সৌধ। অথচ কিছুদিন আগেও জায়গাটা ছিল ধূ ধূ প্রান্তর, ছিল গাছপালা শূন্য। গজনীর মানুষ দল বেঁধে এই বাগান ও বালাখানা দেখতে যেতো, পথিকরা এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতো, পথিক এখানে এসে থমকে দাঁড়াতো। দর্শকদের মুখে সুবক্তগীনের পুত্র মাহমূদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন শুনে জনতা তার প্রতি আরো সশ্রদ্ধ হতো।

এই বাগান বাড়ি, অবকাশ কেন্দ্র মাহমূদ তার বাবা সুবক্তগীনের অজ্ঞাতে তার মায়ের অনুমতি নিয়ে গড়ে তুলেছিল। মাহমূদ ছিল তার মা-বাবার কদাকার ও বেঢপ চেহারার কাঙ্ক্ষিত পুত্র। মাহমূদের তুলনায় তার ছোট ভাই দৈহিকভাবে ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। কয়েক বছর আগে মাহমূদ যখন মাকে বলেছিল, সে একটি মনোরম বাগানবাড়ি বানাচ্ছে, একথা শুনে মা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

মায়ের চোখে পানি দেখে মাহমূদ বলল, মা আমি যদি একথা বলে আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে মাফ করে দিন। আমি আর বাগানবাড়ি বানাচ্ছি না।

না বেটা! বাগানবাড়ি তোমাকে আমিই বানিয়ে দেব। তাহলে আপনার চোখে পানি কেন?

বেটা! আমার মনে পড়ছে সেই স্মৃতি। তোমার বাবার সাথে তখন আমার বিয়ে হয়নি। আমি ছিলাম এক বড় কর্মকর্তার বাগদত্তা। কিন্তু তোমার বাবার প্রতি আমার মনে প্রচণ্ড টান অনুভব করছিলাম। আমি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমি বাগদত্তাকে এজন্য পছন্দ করতে পারছিলাম না, সে আমাকে হেরেমের চার দেয়ালে বন্দী রাখতে চেয়েছিল। সে হেরেমের সৌন্দর্য বর্ধনের সামগ্রী মনে করতো নারীকে। আমার ঘুরে বেড়ান, ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া ও সাঁতার কাটায়ও তার ছিলো চরম আপত্তি। আমি নিজেকে হেরেমের শোভা করে রাখতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি তোমার আব্বাকে বলেছিলাম, আমি এমন স্বামী চাই, যে আমার সাথে ঘোড়া দৌড়াবে, নদীতে সাঁতার কাটবে।

আমি তোমার আব্বুকে বলেছিলাম, হেরেমের রক্ষিতা-নারীদের গর্ভজাত সন্তান কখনো ইসলামের প্রহরী হয় না। আমি এমন ছেলের মা হতে চাই, যে সুদূর ভারত পর্যন্ত ইসলামের পয়গাম প্রচার ও ইসলামী সালতানাত সম্প্রসারিত করবে। মুবাল্লিগের বেশে নয় বিজয়ী সুলতান বাহাদুর হিসেবে, শুধু কূটনীতির বলে নয় তরবারীর জোরে। তোমার আব্বু হেসে বলেছিলেন, "তোমার মতো আমার আম্মুও এ কথাই বলতেন, কিন্তু আমি তো দাস-দাসীর হাটে বিক্রি হওয়া এক গোলাম।" তোমার আব্বুকে আমি বলেছিলাম, "ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী তোমার মতো কর্তব্যনিষ্ঠ গোলামরাই হতে পারে। দৌলতওয়ালা আমীর-উমারা শ্রেণী ইসলামের রক্ষক হবে তো দূরে থাক ইসলামকে তারা ডুবাচ্ছে। দেখ না, আমার আব্বাও তোমার মত হাটে গোলাম হিসেবে বিক্রি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের কর্মনিষ্ঠা ও চেষ্টায় আজ বুখারার শাসক পদটি অলঙ্কৃত করে আছেন। আরো একটি কথা আমি তোমার আব্বুকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, আমি যে মহানায়কের কথা ভাবি, সেই সন্তান তোমার ঔরসে আমার গর্ভে সঞ্চারিত হোক, তা আমি একান্তভাবে কামনা করি। আমি সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তানের গর্বিত মা হতে চাচ্ছি। তোমার আব্বুর প্রতি আমার এই আকর্ষণ ও ভালবাসায় বিন্দুমাত্র যৌবনের তাড়না আর কৈশোরের উন্মাদনা ছিল না। ছিল নির্ভেজাল পবিত্র আকাঙ্ক্ষার হৃদয়তন্ত্রী ছেঁড়া যন্ত্রণার জীবন্ত ছবি আঁকার এক বিনীত নিবেদন। আমার মনের গহীনে আশৈশব লালিত স্বপ্নের বাস্তবচিত্র দেখতে মনটা বেকারার ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় ও তোমার আব্বার দূরদর্শিতায় আমার সাথে তার বিয়ের সব বাধা অল্পতে দূর হয়ে যায়। দাসের হাটে বিক্রিত গোলাম সুবক্তগীন একদিন গজনীর সুলতান হিসেবে আমার আব্বার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

তোমার আব্বুকে আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়কর এক স্বপ্ন দেখালেন। এর পরদিনই তুমি জন্মগ্রহণ করলে। আমি তাকে বললাম, আপনার গতকালের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আজ মূর্তি না হয়ে আমার কোলে ঘুমিয়ে আছে। সেদিন ছিল আশুরা। দশই মুহররম। তোমার আব্বুকে আমি বললাম, আজ দশই মহররম, ইতিহাসের বহু শ্রেষ্ঠ ঘটনা আজ ঘটেছে। আমার এই ছেলের জীবন-কাহিনীও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সেই বাহাদুর কাঙ্ক্ষিত ছেলের জন্ম দিয়েছি, যে পৃথিবীতে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করবে, বাতিল ধ্বংস করবে, মূর্তিসংহারী হবে।"

"মা! এসব কাহিনী এর আগেও আপনি আমাকে শুনিয়েছেন কিন্তু আজ আপনি এত আবেগাপ্লুত কেন?"

"বাবা আমার চোখ থেকে আজ পানি ঝরছে এই আশঙ্কা করে যে, তোমার মন যেন বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েশ, সুন্দর বাগান আর অট্টালিকার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। তুমি শাহজাদা হলেও আমি চাই, তোমার আকর্ষণ থাকবে ময়দানে, যুদ্ধে, পাহাড়-মরুর কঠিন রণক্ষেত্রে। আমি তোমাকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রাসাদ সরগরম ও সুসজ্জিত করার জন্যে তোমার জন্ম নয়। তুমি দুনিয়াতে এসেছো ময়দানে লড়াই করতে। বাগানবাড়ি গড়ে তোলায় আপত্তি নেই। আমি তার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে যুদ্ধ শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে গজনী ফিরবে তখন এখানে তুমি আরাম করবে। আমার কাম্য এটাই।

মায়ের অনুমতি ও সহায়তায় বাগাবাড়ি তৈরি শুরু করে দিল মাহমূদ। বিভিন্ন এলাকা থেকে অট্টালিকা ও বাগান তৈরির অভিজ্ঞ লোকদের আনা হল। দ্রুতগতিতে শেষ করা হলো অবকাশ যাপন কেন্দ্রের কাজ। রাজা জয়পাল যখন গজনী আক্রমণ করতে এল তখন বাগান বাড়ির মনোরম দৃশ্য ও সুরম্য অট্টালিকার চারপাশে বাহারী রঙের ফুলের সমারোহ ও সবুজের মেলা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল গজনী আক্রমণ করে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হল। সুবক্তগীনের বাহিনী আগাম খবর পেয়ে শহরের বাইরেই রাজার বাহিনীকে মোকাবেলায় বাধ্য করে। জয়পালের বাহিনী গজনী অবরোধের সময়টুকুও পায়নি। জয়পালের সাথে সুরতান সুবক্তগীনের কঠিন লড়াই হল। কিন্তু জানবাজ সুবক্তগীনের সেনাবাহিনী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে জয়পালের বিশাল সমর সজ্জাকে গুঁড়িয়ে দেয়। ডজন ডজন হাতি, হাজারো অশ্বারোহী–যোদ্ধা ও তোপ কামানের সহযোগিতা নিয়েও গজনীর সুবক্তগীনের রণকৌশলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হয় জয়পাল।

সুবক্তগীনের আশাতীত এ বিজয়ে এতো বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত হস্তগত হয় যে, জয়পালের রেখে যাওয়া হাতি, অসংখ্য ঘোড়া ও মাল-আসবাব গোছাতে পনের দিনেরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। বিজয়ী সুবক্তগীন যুদ্ধ শেষে গজনী ফিরে এলে মাহমূদ তাকে জানাল তার অবকাশ কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে। মনোরম বাগান বাড়ি দেখে আপনি অবশ্যই মুগ্ধ হবেন। আব্বু, আপনি কি একবার বাগান-বাড়িটি দেখতে যাবেন? আরজ করল মাহমূদ।

মাহমূদের মা সুবক্তগীনকে বাগানবাড়ি সম্পর্কে আগেই অবহিত করেছিলেন। পিতা ভেবেছিলেন, খেয়ালের বশে ছেলে হয়তো কিছু গাছগাছালি রোপণ করে ওখানে একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করেছে। কিন্তু মাহমূদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাগান দেখতে গিয়ে তিনিও বিস্মিত হলেন। সুরম্য অট্টালিকা আর রাজসিক উদ্যানের কারুকার্য ও বিন্যাস মাহমূদের উন্নত কর্মকুশলতার স্বাক্ষর বহন করছিল। মুগ্ধ হলেন সুলতান সুবক্তগীন। ছেলের উদ্দেশে বললেন—

"মাহমূদ! তোমার এই উদ্যান, মহল ও আয়োজন মোবারক হোক। স্থাপত্যকলায় তোমার রুচি ও দক্ষতা প্রশংসার যোগ্য। তোমার এ কাজ এক শাহজাদার পরিচয় বহন করছে, কিন্তু মনে রেখো, তুমি শুধু একজন শাহজাদা নও। তোমাকে আমি ইসলামের তরে নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হিসেবে দেখতে চাই। তুমি মা'মুলী কোন রাজকুমারও নও, এক মুসলিম যোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান। তুমি ভুলে যেয়ো না, প্রকৃতপক্ষে তুমি নগণ্য এক গোলামের ছেলে। আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে তোমার বাবাকে গজনীর সালতানাতের আসনে অভিষিক্ত করেছেন। সেই সাথে জন্মসূত্রে এক মহান দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হচ্ছে, যা আমার বাবার সাথে বিয়ে হওয়ার অনেক আগে থেকেই আমার মা বহন করছিলেন। এ গুরুদায়িত্ব জাগতিক সবকিছুর চেয়ে আমার কাছে বেশি প্রিয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, আল্লাহ তা'আলা এই মহান কর্তব্য পালনের দায়িত্ব আমার ও আমার উত্তরসূরিদের কাঁধে ন্যস্ত করেছেন। তোমার মা ও আমার মুখে বহুবার তুমি শুনেছো যে, তোমার জন্ম অন্য সাধারণ শাহজাদাদের মতো আদৌ মা'মুলী নয়। তোমার জন্মের ইঙ্গিত তোমার দাদু ও তোমার দাদী বহু পূর্বে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিন পুরুষ ধরে আমার বাপ-দাদা তোমার আগমন আকাঙ্ক্ষায় ধীর অপেক্ষায় সময় কাটিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস ও আশা, তুমি মূর্তিসংহারীরূপে ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী শাসক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি বয়ে আনবে।"

আব্বু! আপনি বলছেন যে, এই সুরম্য অট্টালিকা আর হৃদয়কাড়া বাগানবাড়ি তৈরি করা আমার উচিত হয়নি! একটু ম্লান মুখে বলল মাহমূদ।

না মাহমূদ! এই বাগানবাড়ি তৈরি করা তোমার উচিত, কি উচিত নয়, সে ভিন্ন কথা। আমি তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি, যে কোন সম্পদশালী লোকের পক্ষেই এমন প্রাসাদ ও উদ্যান তৈরি খুব সহজ, কিন্তু তোমার কাঁধে যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তা যে কারো পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। রাজা-বাদশা ও শাহজাদারা উঁচু প্রাসাদ, মহল, অট্টালিকা ও স্মৃতিস্মারক এ জন্যই তো তৈরি করে যে, মানুষ তাদের দীর্ঘদিন মনে রাখবে। কিন্তু মনে রেখো, ইট-পাথরের এসব দালান-কোঠা চিরস্থায়ী নয়। মাটির উপরে নয়, মানুষের হৃদয়ে এমন স্মৃতি সৌধ নির্মাণ কর যার জন্য মানুষ তোমাকে অনাদিকাল স্মরণ করবে। ইতিহাসের পাতায় তোমার কীর্তি চিরদিন জীবন্ত হয়ে বিরাজ করবে। চার দেয়ালে ও ইটপাথরের দালানে নিজের জীবনকে আবদ্ধ করো না। নিজের মেধা ও কর্ম দিয়ে ইতিহাসের পাতা দখল কর। নিজের নাম এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত কর যা কোনদিন ম্লান হবে না, রঙ হারাবে না, নষ্ট হবে না। মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে চিরকাল।

মাহমূদ! সম্পদের প্রাচুর্য, সুন্দরী নারী আর সুরম্য প্রাসাদ সৎ নেতৃত্বের জন্যে বড় বাধা। মানুষের বড় দুর্বলতা, এসবের মধ্যে কেউ নিজেকে আটকে ফেললে সে ভোগ-বিলাসিতার শিকলে বাঁধা পড়ে যায়, সে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এখন তুমি পূর্ণ যুবক। তারুণ্য ও যৌবনের মিলন মোহনায় তুমি উপনীত। এ এক কঠিন ক্রান্তিকাল। অধিকাংশ মানুষ এই সময়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়, জীবন ও কর্মের পরিণতি ভুলে যায়। তুমিও যদি এ সময়ে আরাম আয়েশ, রঙিন স্বপ্ন ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দাও, ভোগের গভীরে নিজেকে তলিয়ে দাও, তবে সেখান থেকে ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। বিলাসী শরীরের তন্ত্রীগুলো মরে যায়, এই মরা মানুষ দিয়ে কি পৃথিবীর ইতিহাস গড়া যায়? এজন্য প্রয়োজন ত্যাগী মানুষ। জীবন্ত মানুষ। তোমাকে আমি আদর্শ মানুষরূপে দেখতে চাই।

এ সব কথা শুনে মাহমূদ বললো, আব্বু! আপনি আমাকে ওই বাগান বাড়িতে আর দেখবেন না। আমি আমার পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার কখনও বিস্মৃত হব না। আমার হৃদয়ে এ কথা গেঁথে নিয়েছি, আমি ময়দানের লোক, রণাঙ্গনের লড়াকু সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্র আমার আসল ঠিকানা।

তুমি যদি ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করতে গিয়ে লড়াই করে শাহাদাত বরণ কর, তবে আমি তোমার তৈরি উদ্যানে তোমাকে সমাহিত করবো, তোমার

কবরের চারপাশে বাহারী রঙের অগণন ফুলের সমারোহ ঘটাবো। এই বাহারী বাগানে চিরসুখে শুয়ে থাকবে। এ বাগান হবে তোমার চির সুখনিদ্রার ঠিকানা।

পিতার উপদেশ ও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছিলেন শাহজাদা। সুবক্তগীনের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল তার জীবনে। সতের বার ভারত আক্রমণের স্মৃতিবাহক সতেরো স্তম্ভের এখন আর কোন খোঁজ নেই। সুলতান মাহমূদের বাগান বাড়িরও কোন হদিস নেই। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয় আছে সুলতান মাহমূদ ও তার ঐতিহাসিক ভারত অভিযান। এখনও পৌত্তলিক হিন্দুদের কাছে, মূর্তিপূজারীদের কাছে সুলতান মহাতঙ্ক, মূর্তিসংহারী, বিজয়ী অবয়ব। পৃথিবীর মানুষ তাকে স্মরণ করবে চিরকাল।

কিছুদিন আগে রাজা জয়পাল যখন পেশোয়ার হয়ে গজনীর দিকে যাচ্ছিল, তখন তার রাজকীয় জৌলুস ও জাঁকজমক দেখে পাহাড়-নদীও যেন কুর্নিশ করে তার চলার পথ করে দিতো। সাধারণ মানুষ জয়পালের হস্তিবাহিনী ও বিশাল অশ্বারোহী সৈন্যদের দেখে ভয়ে দূরে চলে যেতো। আর আজ গজনী থেকে পালিয়ে আসা রাজাকে দেখে পেশোয়ারের প্রজারা বিস্মিত হলো। তারা চিনতেই পারছিল না, এ লোক কি তাদের রাজা না এটা রাজার প্রেতাত্মা!

রাজার বিশাল সামরিক বাহিনী বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বেহাল অবস্থায় ফিরে আসে। যে সব হাতি রণসাজে মাথা উঁচু করে যুদ্ধযাত্রা করছিল, সেগুলোর মাথা ছিল ক্ষত বিক্ষত অবনমিত। এদের চলার গতি দেখে মনে হচ্ছিল, এরা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে এখনই।

পেশোয়ারের রাজপ্রাসাদে রাজাকে অভ্যর্থনা জানাতে নাকারা বেজে উঠল। দুই সারিতে নিরাপত্তা রক্ষীরা দাঁড়িয়ে গেল দু'পাশে। রাজা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, এসব বাদ্য-বাজনা বন্ধ কর। একান্ত রক্ষীদের একজনকে বলল, "পণ্ডিত দু'টোকে এক্ষুনি আমার সামনে হাজির কর।"

পেশোয়ার রাজমহলে নেমে এলো মৃত্যুর বিভীষিকা। রাজমহলের বাসিন্দারা যেন সব মৃতবৎ। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। মাত্র দু'তিনজন হাঁক ডাক করছিল, "পণ্ডিত কোথায়, কোথায় পণ্ডিত মহারাজ?"

রাজা একটি বদ্ধ কক্ষে রাগে, ক্ষোভে, অপমানে, আত্মগ্লানিতে টলছিল। নিজের উরুতে নিজেই থাপ্পড় মারছিল আর দু'হাত কচলাচ্ছিল। কখন দু'পণ্ডিত তার খাস কামরায় প্রবেশ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছে সে দিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

সবচেয়ে বড় পণ্ডিত বাটাণ্ডায় থাকতো। রাজা যখন গজনী আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় তখন পণ্ডিত মহারাজও লাহোর আগমন করে। এই পণ্ডিতই রাজাকে গজনী অভিযানের শুভক্ষণ বলে দিয়েছিল। পণ্ডিতরা রাজাকে এই নিশ্চয়তাও দিয়েছিল যে, পৃথিবীর কোন শক্তি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না, রাজার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

"মহারাজ! আমরা আপনার দরবারে হাজির হয়েছি"– বলল বড় পণ্ডিত। চকিতে রাজা ঘুরে দাঁড়াল। তার চেহারা অপমান, ব্যর্থতা আর ক্ষোভে পাণ্ডুর, গোস্বায় তার চোখ দু'টি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। সত্য আর মিথ্যার দোলাচলে দোদুল্যমান রাজার মন।

"তোমরা মিথ্যা বলেছিলে, না যে পুঁথি দেখে তোমরা শুভ দিন নির্ধারণ করেছিল ওগুলোতে মিথ্যা লেখা হয়েছে?" গম্ভীর আওয়াজে পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করল রাজা।

আমরাও মিথ্যা বলিনি, পুঁথির কথাও মিথ্যা নয়। তারকা কখনও মিথ্যা নির্দেশ দেয় না মহারাজ! এক পণ্ডিত বলল। আমরা আপনাকে এখনো শুভক্ষণটা হিসেব কষে দেখাতে পারব।

"তোমরা লক্ষবার হিসাব করোগে! কিন্তু আমার সামনে চরম অবমাননাকর পরাজয়ের বাস্তবতা বিদ্যমান। আমি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছি। ধ্বংস হয়ে গেছে আমার সেনাবাহিনী।"

"তোমাদের ওসব ভবিষ্যদ্বাণীর কি হলো? তোমরাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছিলে, শুভ এই অভিযান। তোমরাই তো শোনালে আমাকে দেবতার আশীর্বাদের দৈববাণী। তোমরাই পণ্ডিতদের সাথে নিয়ে যেতে বলেছিলে এবং উপদেশ করেছিলে, লড়াই শুরু করার আগে এই মূর্তি আর কৃষ্ণ দেবতাকে সিপাইদের সামনে রেখে পূজা-অর্চনা করে লড়াই শুরু করতে। এসব করলে আমার সৈনিকরা পাহাড় ধসিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তোমাদের কথামতো সব আয়োজনই আমি করেছিলাম। লড়াই শুরু করার আগে মূর্তি আর দেবতাদের পূজা-অর্চনা শুরু হলো, কিন্তু তা শেষ না হতেই মুসলিম সৈন্যরা আমাদের উপর ঝড়ের বেগে হামলা করল। প্রচণ্ড তুফানের মতো এসে ওরা সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলল, আমরা খড়কুটোর মতো পিষ্ট হতে লাগলাম। ওরা আমাদের দেবতা, অবতার আর মূর্তিগুলোকে ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দিল। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখে এসো, আমাদের দেবমূর্তিকে মুসলমানরা কিভাবে পায়ে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে!

তোমরা হয়তো মনে করবে, ওরা বিশাল বাহিনী নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করেছে। না, রাতের বেলায় আমরা যখন সৈনিকদের সামনে কৃষ্ণ আর দেবমূর্তি রেখে প্রার্থনা শুরু করেছি, পণ্ডিতরা শ্লোক গাইতে শুরু করেছে, এ সময় মাত্র শতাধিক মুসলিম আমাদের সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু তছনছ করে দিল। এরপর দিনের বেলায় আর আমরা শত্রু সৈন্যদের মোকাবেলায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। আমার সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। পণ্ডিতরা পালিয়ে গেল। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আমিও পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। অথচ আমার বাহিনীতে তিন লাখের বেশি সৈন্য ছিল। ওরা ছিল আমাদের এক চতুর্থাংশেরও কম।"

"আমরা আবার হিসাব কষে বলব মহারাজ। মনে হয় তারায় তারায় সংঘর্ষ হয়ে গেছে।"

রাজা জয়পালের ক্ষোভ তখন চরমে। চরম অপমান, লজ্জা, তিক্ত পরাজয়ের বাস্তবতা তার সামনে। আর ওসব পণ্ডিত ব্যস্ত রয়েছে তাদের জ্যোতিষীপনার সত্যতা প্রমাণে। রাজা তিন লাখের বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পুরো আফগানিস্তানকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গজনী বিজয়ের আশায় অভিযান চালিয়েছিল। তার স্বপ্ন ছিল মহাভারতের সীমানার মধ্যে সে হিন্দুকুশ পর্বতমালাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হলো, বিরাট সেনাবাহিনীকে সে সুবক্তগীনের মর্জি আর কৃপার সামনে ত্যাগ করে এসেছে। নিজের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। পেশোয়ার পৌছার আগ পর্যন্ত পিছন ফিরে দেখার সাহসটুকু সে হারিয়ে ফেলেছিলো। তার জন্যে আরো বিপর্যয়কর বিষয় হলো, সে শুধু তার নিজের সৈন্য নিয়ে গজনী যায়নি, বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশ-পাশের আরো পাঁচ-ছয়টি রাজ্যের সৈন্যদেরকেও সঙ্গী করেছিল। সে সব রাজার কাছে মুখ রক্ষার কিছুই আর জয়পালের অবশিষ্ট থাকলো না।

এছাড়া তৎকালীন ভারতে রেওয়াজ ছিল, কোন রাজা যদি পরপর দু'বার শত্রু বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় তবে তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হতো। রাজা জয়পালের পরাজয়ের সংখ্যা সেই মাত্রা অতিক্রম করে ফেলেছে। এখন তার পক্ষে সিংহাসনে টিকে থাকার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্যান্য রাজারা চাপ দিলে ছেলের হাতে রাজক্ষমতা ত্যাগ করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। জয়পালের ছেলে আনন্দ পাল তখনও কিশোর। সুবক্তগীন যেমন মাহমূদকে যুদ্ধকৌশলে দক্ষরূপে গড়ে তুলেছিলেন তেমনি আনন্দপালকেও রণবিদ্যার বহু কৌশল রপ্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু আনন্দপালের রাজ্যপাট সামলানোর মতো বয়স

হয়নি। আনন্দপালের হাতে রাজ্যপাট ন্যস্ত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার সময় এখনো আসেনি। উপরন্তু অন্য রাজারা তাদের বিপুল সৈন্য ও রসদ ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ দাবী করে বলতে পারে, এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সিংহাসন ও রাজ্য আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এসব চিন্তায় রাজা জয়পালের মাথা বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম। এমতাবস্থায় যখন পণ্ডিতেরা পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ের জন্যে আবার তারার অবস্থান হিসেব করে কোথায় ভুল হয়েছে তা খতিয়ে দেখার কথা বলল তখন ক্ষোভে-অপমানে রাজা কাঁপতে শুরু করল।

"আমি তোমাদের পরিষ্কার বলছি যে, মুসলমানরা তোমাদের মতো যুদ্ধের গনা শুনে আসেনি। ওরা তারার গতিপথ দেখে গণক-জ্যোতিষীদের কথামতো বিজয়ের শুভ-অশুভ যাত্রা দেখে আসেনি। আমাদের হাতে মুসলিম সৈন্য খুব কমই বন্দী হয়ে এসেছে। তন্মধ্যে দু'জন অফিসার রয়েছে। এদেরকে তোমরা দেখ, ওরা তোমাদের মতো মুসলিম মৌলভীদের কোন বিজয়-আশ্বাস নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল কি? আমার তো সন্দেহ হয়– মুসলমানদের কথা সত্য মনে হয়। ওরা বলে— কাদামাটি আর পাথরের তৈরি এসব দেবতা মিথ্যা; আর ওরা যে খোদার ইবাদত করে তাই সত্য।"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ মহারাজ! মুসলমান ম্লেচ্ছ। ওদের নাম উচ্চারণ করাও অশূচি। আপনার পরাজয়ের কারণে দেবতাদের মিথ্যা আখ্যা দেয়া মহাপাপ হবে। এই পরাজয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। পরাজয়ের কারণ এই নয় যে, মুসলমানদের ধর্ম সত্য, আমাদের দেব-দেবীরা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।"

কারো ঘরে ডাকাত পড়লে সেই ঘর উজাড় হয়ে যায়। বলল অপর পণ্ডিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ডাকাতদের খোদা সত্য আর লুণ্ঠিতদের খোদা মিথ্যা।

"আমি তো আমার ধর্মকে সত্য জেনেই মুসলমানদের দেশে এই সত্য ধর্মকে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলাম। দেবতারা আমাকে কেন সহায়তা করল না? মুসলমানরা আমাদের দেবতাদেরকে টুকরো টুকরো করে উপহাসে মেতে উঠল। এসব কি সহ্য করার মত?" বলল রাজা জয়পাল।

"মহারাজ! আমাদেরকে আবার যাচাই করে দেখার সুযোগ দিন।"

আমি আবার তোমাদের গণনা যাচাই করে দেখার সুযোগ দিচ্ছি। একথা বলে রাজা জয়পাল গমনোদ্যত পণ্ডিতদের বলল, তোমরা একটু বস। আমি মুসলিম কয়েদীদেরকে তোমাদের সামনে হাজির করছি। রাজা তার খাস কামরায় ঝুলানো ঘণ্টা বাজাল। এক দারোয়ান ভেতরে প্রবেশ করলে রাজা

দু'তিনজন সিনিয়র জেনারেলের নাম বলে দারোয়ানকে হুকুম দিলেন বিশেষ কামরায় বন্দী দু'জন কয়েদীকে নিয়ে জেনারেলদের এখানে হাজির হতে বল।

রাজা জয়পাল সিংহাসনে সমাসীন। দরবারের দস্তুর মতো দুই পণ্ডিত রাজার ডানপাশে এবং তাদের পাশে দুই জেনারেলকে বসানো হল।

সুদর্শন, সুগঠিত দেহ, দীর্ঘকায় দু'জন বন্দীকে ভেতরে আনা হল। তাদের হাতে হাতকড়া, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী বাঁধা। কয়েদী হলেও তাদের চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ পরিস্ফুট। তারা নিরুদ্বিগ্ন। কোন ধরনের ভীতির ছাপ নেই তাদের চেহারায়। কেননা তারা বিজয়ে গর্বিত, তারা সুলতান সুবক্তগীনের বাহিনীর সৈনিক। পদবীতে কমান্ডার। তারা শেষ যুদ্ধে রাতের আঁধারে দুঃসাহসী গেরিলা হামলা করে শত্রুপক্ষের ব্যূহে ঢুকে পড়ে গ্রেফতার হয়েছিল। এদের সেনারা শত্রুপক্ষের বহু ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদেরও কুরবানী দিতে হয়েছে প্রচুর।

রাজা জয়পালের দরবারের এক লোক গজনীর ভাষা জানতো। রাজা তার সহায়তায় বন্দীদের সাথে কথা বলল, "আমি তোমাদের কাছে যুদ্ধের কোন গোপন কৌশলের কথা জিজ্ঞেস করব না। তোমরা শুধু আমাকে একথা বলবে, যুদ্ধ যাত্রার আগে সুলতানকে কোনদিন যাত্রা করলে শুভ হবে, তারার অবস্থান গুনে তোমাদের মৌলভী কিংবা জ্যোতিষীরা কি এরূপ কিছু বলে?"

"না, আমাদের ধর্মীয় গুরুরা এসব কিছু বলেন না।" বলল নেজাম আউরিজী নামের বন্দী কমান্ডার।

"আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের মোকাবেলায় লড়াই করি। আমাদের শত্রু আপনারা, খৃষ্টান ও ইহুদীরা। আমাদের স্বধর্মীয় লোকদের মধ্যেও আমাদের শত্রু রয়েছে। আমরা যে যুদ্ধ করি আমাদের দৃষ্টিতে এটিকে জেহাদ বলা হয়। আমরা রাজ্যের পরিধি বিস্তারের জন্যে যুদ্ধ করি না, আমরা আল্লাহর জন্য আল্লাহর সত্য ধর্মের বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ যাত্রা কিংবা যুদ্ধ শুরুর জন্যে বিশেষ কোন ক্ষণ বা দিনের জন্যে আমরা অপেক্ষা করি না। প্রত্যেক দিন বা সকল মহূর্তকেই আমরা শুভ মনে করি। দিন হোক রাত হোক, ঝড়-বাদল, শীত-গ্রীষ্ম সবই আল্লাহর। এই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা যুদ্ধ করি। অপারেশনে নেমে পড়ি। আল্লাহর প্রতিটি দিন ও মুহূর্ত শুভ ও সুন্দর। এটাই আমাদের বিশ্বাস।"

তোমাদের মসজিদগুলোতে কি তোমাদের মৌলভী ও ইমাম সাহবেরা তোমাদের জন্যে বিশেষ কোন দু'আর আয়োজন করে?

প্রত্যেকেই জিহাদে গমনকারীদের জন্যে দু'আ করে।

আমাদের ছোট-বড় ছেলে-বুড়ো সবাই সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলতে পারে। বলল নিজাম আউরিজী।

আচ্ছা! তোমরা কি জান তোমাদের বিজয়ের রহস্য কি? তোমরা কি আমার সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে আগে জানতে? জিজ্ঞেস করল রাজা।

আপনার সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারটি জানা-না জানার বিষয়টি আমাদের সুলতান এবং সেনাপতিদের দায়িত্ব। ওসব নিয়ে আমরা ভাবি না। আমাদের সাফল্যের রহস্য হলো আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহর জন্যে। আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হই বাঁচার জন্যে নয় শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

তা আমি জানি। বলল রাজা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আমার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমরা এতো অল্পসংখ্যক লোক কিভাবে বিজয়ী হলে? তোমাদের যুদ্ধের কৌশল কি?

এটা একান্তই গোপনীয় বিষয়। এ ব্যাপারে আমি যেমন আপনাকে কিছু বলতে পারব না, আমার সাথীও আপনাকে কিছু বলতে পারবে না। তবে একথা বলতে পারি, আল্লাহর উপর ঈমানদার কোন ব্যক্তি তারার গতিবিধিতে বিশ্বাস করে না। যতক্ষণ ঈমান মজবুত থাকে, ততক্ষণ মু'মেন আকাশের বিজলীর ন্যায় দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে চলে। আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হিন্দু ও পৌত্তলিকরা কাদামাটি ও পাথরের মূর্তির পূজা করে। ওদের বিশ্বাস দুর্বল এবং অক্ষম ওদের দেবদেবীরা। আমরা আপনাকে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছি, হাতে গড়া কাদা-মাটি ও পাথরের দেবদেবী প্রকৃত খোদার সাথে টক্কর দিলে ধুলোর সাথে মিশে যায়। আপনি কি দেখেননি, আপনার সৈনিকরা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল বহু দেবদেবী, সে সব কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি? আপনার একজন সৈন্যও কি অক্ষত ফিরে আসতে পেরেছে?

এই ম্লেচ্ছ আমাদের দেবদেবীকে অপমান করছে মহারাজ! রাগতস্বরে বলল এক পণ্ডিত।

এই গবেট এখনও বুঝতে পারছে না যে, সে আমাদের বন্দী, বলল রাজা। এরা তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে বেখবর। এরা যদি যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে আমাকে ওদের গোপন রহস্য প্রকাশ না করে তাহলে আমি ওদের চামড়া তুলে ফেলব। তখন দেখবে, যন্ত্রণায় গড়গড় করে সব বলে দেবে।

আমাদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে মহারাজ! বলল অপর বন্দী। আমাদের হত্যা করেও আপনি রহস্য জানতে পারবেন না এবং আপনার লজ্জাকর পরাজয়কেও বিজয়ে পরিণত করতে সক্ষম হবে না।

এদের নিয়ে যাও! শিকলে বেঁধে রাখো। আর অন্যগুলোকে হত্যা করে ফেল। রাজা হুকুম দিল।

উভয় কয়েদীকে খাস কামরা থেকে নিয়ে গেল প্রহরী। রাজা পণ্ডিতদের উদ্দেশে বলল, আমি পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে চাই। তোমরা জেনে শুনে জলদি বল এ কাজ কিভাবে করা সম্ভব।

পণ্ডিতরা চলে যাওয়ার পর রাজা জয়পাল তার দুই জেনারেলকে বলল, এ দুই কয়েদীকে লাহোর নিয়ে যাবো। আগামীকাল এখান থেকে আমরা রওয়ানা হব। এদেরকে নেয়ার ব্যবস্থা কর।

এদের কাছ থেকে আপনি কি রহস্য জানতে চান মহারাজ! জিজ্ঞেস করল এক জেনারেল।

আমাদেরকে পরাজয়ের রহস্য আবিষ্কার করতে হবে। সুবক্তগীন আমাদের রণপ্রস্তুতি আর আক্রমণের খবর আগেই জেনে ফেলেছিল। আগাম খবর নিয়ে মুসলমানরা ওঁত পেতে রাতের আঁধারে আমাদের সৈনিকদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। পাহাড়ের আড়ালে ওদের সৈনিকরা আগে থেকে ওঁত পেতেছিল আর রাতে গেরিলা হামলা করেছিল। সুবক্তগীনের গুপ্ত বাহিনী গেরিলা হামলার জন্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তখন আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

যুদ্ধের রহস্য উন্মোচন করতে হলে আপনাকে আগে খোঁজ নিতে হবে, আমাদের যাত্রা ও প্রস্তুতির খবর কিভাবে গজনী পৌঁছল। সুবক্তগীনের গোয়েন্দারা আমাদের আশেপাশে ঘাপটি মেরে আছে। এদের খুঁজে বের করার ব্যবস্থা আগে করতে হবে মহারাজ!

রাজা জয়পাল বার্ধক্যে উপনীত। উপরন্তু উপর্যুপরি পরাজয়ের গ্লানিতে তার দেমাগ বিগড়ে গিয়েছিল। অন্য কারো কথা বা পরামর্শ শোনার মতো মানসিকতা তার ছিল না। রাজা পরাজয়ের কারণ নিজে যা বুঝতে পেরেছিল সেরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা নিচ্ছিল। কিন্তু পরাজয়ের কারণ যে তার ধারণা ভিন্ন অন্য কিছু, হতে পারে এটা তাকে বোঝানোর ক্ষমতা কারো ছিল না। নেজাম আউরিজী যখন বলল, তাকে হত্যা করলেও যুদ্ধের রহস্য সে ফাঁস করবে না, এরপর রাজা এদের

মুখ থেকে রহস্য উদঘাটনের ফন্দি আঁটতে লাগল। যে করেই হোক রহস্য সে এদের মুখ থেকে বের করবেই।

লাহোরের সবচেয়ে বড় মন্দিরের প্রধান মূর্তি সরস্বতির সামনে আতর, গোলাব, ধূপ, লোবান, আগরবাতি জ্বালিয়ে একান্ত মনে পূজায় বসেছে পণ্ডিত। মন্দিরের ভেতর-বাহির ধুয়ে মুছে ঝকমকে করা হয়েছে। আলোকমালায় গোটা মন্দির ঝলমল করছে। আজ মন্দিরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিশ-পঁচিশটি কুমারী মন্দিরের ভেতরে ফুলের ডালি নিয়ে দাঁড়ানো। এরা বিশেষভাবে তৈরি পোশাকে সজ্জিত হয়ে মন্দিরের প্রবেশ পথে দু'সারিতে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের সদর দরজার সামনে রাজার বিশেষ নিরাপত্তা অফিসাররা টহল দিচ্ছে। ইত্যবসরে ঘোষণা শোনা গেল, মহারাজের সওয়ারী আসছে।

রাজার আগমনী সংবাদে বাদক দল বিশেষ সঙ্গীতের তুফান তুললো। বাজনার তালে তালে নেচে উঠল তরুণী দল। গোটা এলাকা হারিয়ে গেল কান ফাটা ঢাকঢোল আর বাদ্যযন্ত্রের শব্দে। রাজা সদর গেটে এলে কুমারীরা কুর্নিশ করে গমন পথে তার পদতলে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিল। তাজা ফুলের পাপড়ি মাড়িয়ে তরুণীদের বেষ্টনী পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল রাজা। প্রবেশ করল বিশেষ এক কক্ষে। যেখানে পণ্ডিত মহারাজ তন্ত্রমন্ত্র জপছিল। এক পণ্ডিত তাকে কুর্নিশ করে মাথায় তিলক পরিয়ে দিল। অন্য পণ্ডিতেরা ঘটি, শাঁখা বাজাতে শুরু করল। রাজা জয়পাল দু'হাত জোর করে সরস্বতীর পা ছুঁয়ে চোখে-মুখে হাত বুলাল। আর শপথ করল, যে করেই হোক সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবেই নেবে। প্রতিজ্ঞা করল মূর্তির সামনে, 'পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করে সুদূর বুখারা পর্যন্ত আমি দেব-দেবীর ডঙ্কা বাজাব। ইসলামের সূতিকাগার পর্যন্ত আমি সনাতন ধর্মের সীমানা বিস্তৃত করে ক্ষ্যান্ত হব। দেবদেবীদের মর্যাদা বুলন্দ করতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধেই আমি প্রাণ ত্যাগ করব।"

রাজার প্রার্থনা শেষ হলে শুরু হল পণ্ডিতদের পালা। পণ্ডিতেরা ওদের নিজস্ব সংস্কৃত ভাষায় অনেক কিছু বলল, যা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ঘণ্টা আর শাঁখা ধ্বনি আরো তীব্র হল। হঠাৎ ভীষণ গর্জন শোনা গেল– যেন আসমান ভেঙে পড়েছে। বাইরে যেন রাতের আঁধার নেমেছে। পরপর কয়েকবার গর্জন শোনা গেল। পণ্ডিতেরা পরস্পর চোখাচোখি করল, বুড়ো রাজা পণ্ডিতদের কাতর অবস্থা আর ভুবন কাঁপানো গর্জনে ভয়ে কেঁপে উঠল। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বড় পণ্ডিত দেবতার সামনে আরো জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে আর রোদন করছে। বাইরে নেমে এলো গভীর অন্ধকার। শুরু হল চেঁচামেচি, হাঁকডাক আর চিৎকার।

মহারাজ! দেবতা খুব নাখোশ হয়েছে। গজনীর যুদ্ধে দেবদেবীদের অপমান করা হয়েছে। এই অপমান দেবতা কখনও ক্ষমা করবে না। রাজার সামনে দু'হাঁটু গেড়ে নীচু গলায় বলল বড় পণ্ডিত।

এ সময় হঠাৎ আকাশে এমন বিকট বিজলী-গর্জন শুরু হলো যে, মন্দির কেঁপে উঠল, মূর্তিগুলো নড়ে গেল।

রাজা কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠল, পণ্ডিত!

জ্বী মহারাজ!

দেবী মা কি চায়? কতো মানুষের বলি চায় দেবী? যতো নরবলি চায় বলুক, আমি দেবীর পদতলে হাজারো নরবলী দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করব।

এ সময় রাজা জয়পাল, পণ্ডিত ও মন্দিরের সেবায়েতদের মধ্যে আকাশের অবিরাম বিকট গর্জন আর বিজলীর ভয়াবহ ঝলকানিতে ধুকপুকানি শুরু হয়েছে। ভিতরে ভিতরে ভয়ে সবার বুক শুকিয়ে গেছে।

মন্দিরের অনতিদূরে মুসলমান কৃষকরা নির্বিঘ্নে ক্ষেতে কাজ করছিল। তাদের খুশি দেখে কে। দীর্ঘদিন পর কাঙ্ক্ষিত মুষলধারার বৃষ্টিতে আনন্দ উচ্ছ্বাসে তারা বলাবলি করছিল, "এবার ফসল ভালো হবে, আল্লাহ্ রহম করেছেন। ভাইয়েরা! বাড়ি গিয়ে সবাই নফল নামায পড়ো, শুকরিয়া আদায় করো।" মুসলিম কৃষকদের আনন্দ উল্লাস আর হর্ষধ্বনি মন্দির থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

মুসলমানদের জন্যে যা ছিল আল্লাহর দয়া মন্দিরের মূর্তিপূজকদের বিবেচনায় তা ছিল দেবতার ক্রোধ, ভগবানের গযব। মুসলমানরা ভারী বর্ষণ-বৃষ্টিকে আল্লাহর রহমত ভেবে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে নফল নামায পড়ার জন্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মুসলমান শিশুরা বৃষ্টিতে ভিজে কাদা-পানিতে খেলতে নেমেছে, হৈ চৈ, চেঁচামেচি করে উল্লাস করছে। অপর পক্ষে রহমতের এই বারিধারা ও মেঘের গর্জনে মন্দিরের পূজারী ও রাজার চেহারা মলিন হয়ে গেছে। গযবের আশঙ্কায় মন্দিরের সর্বত্র ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

বড় পণ্ডিত হাতজোড় করে বড় দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল, এদিকে রাজাও ভগবানের শাস্তি আশঙ্কায় কাতর। বাইরে সারি বেঁধে দাঁড়ানো যুবতীরা দ্বিতীয়বার আকাশের গর্জনে ভীত হয়ে দৌড়ে মন্দিরে এসে কাঁপতে শুরু করেছে।

দীর্ঘক্ষণ পর এক পণ্ডিত মুখ তুলে বলল, মহারাজ! এক কুমারীর বলিদান!

মাত্র একটি?

জ্বী মহারাজ! মাত্র একটি কুমারী হলেই চলবে। বলল পণ্ডিত।

কোন মুসলমান কুমারীকে ধরে এনে এক্ষণই আমার সামনে বলি দিয়ে দাও। হুকুম করল রাজা।

না-না মহারাজ! ভগবান কোন ম্লেচ্ছ বলিদান গ্রহণ করবেন না। খাঁটি বামুন কুমারী চাই।

রাজা জয়পালের দৃষ্টি পড়ল পাশে দাঁড়ানো কুমারীদের প্রতি। এরা সবাই মন্দিরের চিরকুমারী! সেবায়েত এই চিরকুমারীরাই একটু আগে তার গমন পথে ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছিল।

এরাও তো কুমারী। এদের একজনকে বলিদানের জন্য রেখে দিন। পণ্ডিতের উদ্দেশে বলল রাজা।

রাজার কথা শুনে মেয়েরা পরস্পর চোখাচোখি করল এবং বাঁকা ঠোঁটে হাসল। পরক্ষণেই তাদের এই আচরণে পণ্ডিতদের ক্রোধাগ্নি আঁচ করতে পেরে দমে গেল সবাই। পণ্ডিতরা একটু চুপসে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা ইতস্তত হল। কারণ, এই মেয়েরা জনসাধারণের দৃষ্টিতে খুবই সম্মানের পাত্রী, মন্দিরের সেবাদাসী, দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গিত চিরকুমারী। মন্দিরে এদের অবাধ যাতায়াত। একাকী অথবা জোড়ায় জোড়ায় দল বেঁধে যখন ইচ্ছে এদের জন্যে মন্দিরে গমনাগমনে কোন বিধিনিষেধ নেই। বাইরের মানুষ এদেরকে সতি-সাধ্বী ভেবে ইজ্জত করলেও মন্দিরের পণ্ডিত আর ওরা জানে, তারা কোন ধরনের কুমারী। বারবার তাদের বাঁকা দৃষ্টি পণ্ডিতদের বিব্রত করছিল এবং তা কুমারীদল ও পণ্ডিতদের মাঝে এক জটিল সম্পর্কের ইংগিত বহন করছিল।

রাজা জয়পাল তন্মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির বাজু ধরে পণ্ডিতকে বলল, একে বলিদান করুন।

'আমি আপনার পায়ে জীবনোৎসর্গ করতে প্রস্তুত মহারাজ' স্বগতোক্তি করল মেয়েটি। আমি দেবীর পদতলে জীবন উৎসর্গ করবো তাতে আপত্তির কী আছে! কিন্তু মহারাজ! আমি যে কুমারী নই।

তোমার বিয়ে হয়েছে, তবে মন্দিরে এলে কেন?

"আমি কারো বিবাহিতা স্ত্রী নই মহারাজ। এই মন্দিরের দাসী। কিন্তু পণ্ডিতজী আমার সতীত্ব...। অপকটে বললো মেয়েটি।

বলিদানের জন্যে একটা বিশেষ ধরনের দৈহিক গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব আর কুমারী নারী দরকার মহারাজ! মেয়েটির কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল বড় পণ্ডিত। এই গুণ এখানকার কুমারীদের মাঝে অনুপস্থিত। বলিদানের জন্যে

উপযুক্ত মেয়ে আমরা খুঁজে নেব, এজন্য আপনি নিশ্চিত থাকুন। সেই কুমারীকে আমরা এই চাঁদের পূর্ণিমা থেকে আগামী চাঁদের পূর্ণিমা পর্যন্ত আমাদের হেফাযতে রাখব। ওকে বিশেষ ধরনের খানা, বিশেষ পোশাক পরাতে হবে এবং বিশেষ ধরনের তা'লিম দিতে হবে। সে নিজে থেকেই বলি হওয়ার জন্য আর্জি পেশ করতে থাকবে। সে আপনার আকাঙ্ক্ষা সফলের জন্য আশীর্বাদ করবে। তাকে এখানে নয় একটা বিশেষ স্থানে নিয়ে বলীদান করা হবে মহারাজ!

এ কাজ খুব জলদি হওয়া দরকার। বলল রাজা।

আপনি বলিদানের ইচ্ছে ব্যক্ত করার সাথে সাথেই দেবতা খুশি হয়ে গেছেন। তার রাগ কমে গেছে। দেখলেন না, আপনি বলিদানের কথা বলার সাথে সাথে দেবতা শান্ত-নিরব। বন্ধ হয়ে গেছে গর্জন। থেমে গেছে ঝড়। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

রাজা জয়পাল মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। বলি হওয়ার ভয়ে মেয়েদের চেহারা পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছিল। এরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পণ্ডিতের কথায় অন্য কুমারী বলিদানে রাজা সম্মতি দিল। এরা রাজার কথায় আশঙ্কা করছিল, না জানি তাদের মধ্যে কাউকে আবার বলিদানের শিকার হতে হয়।

আজ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, কেন আমরা তোমাদের কুমারীত্ব নষ্ট করেছি। না হয় আজ তোমাদেরই বলি হতে হতো। নির্লজ্জের মত বলল বড় পণ্ডিত। কুমারীত্ব নষ্ট না করলে একের পর এক তোমাদেরকেই বলিদান বরণ করতে হতো। তোমরা তোমাদের শরীর বলিদান করে জীবন দান থেকে মুক্তি লাভ করেছো। বড় পণ্ডিত কুমারীদের উদ্দেশে এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলছিল, যেন সে বেদ পুরানের কোন শ্লোক আবৃত্তি করছিল।

রাজা জয়পালের বহর ভারী বর্ষণের ফলে কাদা-মাটির মধ্য দিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে রওয়ানা হল। রাজার প্রস্থানে তার রক্ষী-প্রহরী সৈন্যরা মন্দির এলাকা ত্যাগ করল। বড় পণ্ডিত কুমারীদের পিছনের কামরায় চলে যেতে নির্দেশ দিয়ে নিজেও সেই কামরায় প্রবেশ করল। সদর গেট বন্ধ করে দেয়া হল।

রাজা যখন মন্দিরে গেলো তখন গজনীর দুই বন্দীকে রাজপ্রাসাদে আনা হল। রাজার হুকুম ছিল এখানে এদের হাজির করার। রাজার ফেরায় বিলম্ব দেখে একটি ঘরে তাদের বসিয়ে দেয়া হল। রাজার হুকুম ছিল, ওদেরকে কয়েদখানায় নিম্নমানের আহার না দিয়ে ভাল আহার দেবে, আরাম বিছানার ব্যবস্থা করবে।

রাজার চেষ্টা ছিল ওদের প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করে মুসলিমদের যুদ্ধ জয়ের গোপন রহস্য উদ্ধার করার। কারণ, রাজার কাছে তাদের যুদ্ধ কৌশলের রহস্য বলতে এরা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

রাজা তার জেনারেলদের বলেছিল, বন্দীদেরকে আরাম-আয়েশে রেখে তাদের মন জয় করার মাধ্যমে রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করতে হবে। তাতেও যদি কাজ না হয় তবে কঠিন শাস্তি দিয়ে ওদের পেট থেকে রহস্য বের করে আনতে হবে।

তাদের জন্যে যখন আহার আনা হল তখন তারা বলল, এই খাবার কে রেঁধেছে? তাদের বলা হল, রাজ মহলের বাবুর্চিরা পাকিয়েছে এই খাবার। তারা বলল, তারা কোন হিন্দুর পাকানো খাবার খাবে না। তাদেরকে কোন মুসলমানের রান্না করা খাবার দেয়া হোক এবং খাবার কোন মুসলমানকে দিয়ে পাঠানো হোক। রাজার যেহেতু নির্দেশ ছিল মেহমানের মতো এই দুই বন্দীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার, তাই রাজমহলের খানা ফিরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পর এক মুসলমানকে দিয়ে খাবার পাঠানো হল। বন্দীরা যখন নিশ্চিত হল, খানাবাহক প্রকৃতই মুসলমান তখন আগ্রহভরে আহার করল।

ওরা যখন আহার করছিল, তখন পাহারাদার সিপাই ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার পাশে চলে গিয়েছিল। এরা শিকলে বাঁধা, তাই পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। আহার বহনকারী মুসলমান কর্মচারী আহাররত বন্দীদের পাশে বসল। সে আড়চোখে দেখে নিল, প্রহরী ঘরের বাইরে চলে গেছে। সে নীচু স্বরে ফারসীতে বলল, তোমাদের খুব আদর-যত্ন করা হচ্ছে এই ভেবে তোমরা খুশি হয়ে যেয়ো না। এমন ব্যবস্থা ওসব বন্দীর বেলায়ই নেয়া হয় যাদের কাছে দামী কোন রহস্য থাকে।

উভয় বন্দী গভীরভাবে ওকে দেখল।

খানাবাহক বলল, আমার দিকে তাকিয়ো না, খানার দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে কথা বলো। এরা দেখলে সন্দেহ করবে, আমি তোমাদের লোক। যদি তোমাদের কাছে সত্যিই কোন রহস্য থাকে তবে তা কখনও প্রকাশ করো না, কিন্তু ওদের লোভ দেখাবে। ওদের ধোঁকা দিয়ে আস্থা অর্জন করো, যাতে ওরা তোমাদের পায়ের ডাণ্ডাবেড়ি ও কোমরের শিকল খুলে দেয়। সুযোগ পেলেই আমি তোমাদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। দেখো কোন প্রলোভনে পড়ে গোপন তথ্য ফাঁস করো না যেন। তাহলে তোমরা ফেঁসে যাবে। একবার

ফেঁসে গেলে আর রক্ষা পাবে না। এমন কঠিন শাস্তি দেবে পরাণ ঠোঁটের সাথে ঝুলে থাকবে। মরেও মরবে না।

এরা যখন কথা বলছিল তখন বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির শব্দে এদের কথার আওয়াজ বাইরে যাচ্ছিল না। বৃষ্টি থামতেই রাজা প্রাসাদে এলো এবং এদের ভিতরে নিয়ে বলল, আমি তোমাদের কাছ থেকে সুবক্তগীনের যুদ্ধ জয়ের রহস্য জানতে চাচ্ছি!

"আমরা পরাজয় চিনি না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে নতি স্বীকার করি না। আপনি ও আপনার জাতির লোকেরা মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা করাকে নেক কাজ মনে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মনে করেন বুদ্ধিমত্তা। এই ধূর্তামি আমরা জানি না। শিকলে বাঁধা অবস্থায় যদি আমরা আপনাকে রহস্য বলে দেই তবে এর অর্থ দাঁড়ায় গ্রেফতারীর যন্ত্রণায় আমরা কওমের সাথে বেঈমানী করেছি। বন্দী অবস্থায় আমরা আপনার সাথে কোন কথা বলতে পারব না।"

"রাজা শ্লেষ মাখা স্বরে বললো, তাহলে কি আমি তোমাদের অতিথি করে রাখবো?"

যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। শিকলে বন্দী থেকে আমরাই কি আপনাকে বন্ধু ভাবতে পারি? বলল এক বন্দী কাসেম বলখী। আপনি আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতৃস্থানীয় লোকদের কয়েদখানায় হত্যা করেছেন, আমাদের সুলতানের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। আমাদের মুখ থেকে রহস্য জেনে যাওয়ার পর আমাদের সাথেও এমন ব্যবহার করবেন না এর নিশ্চয়তা কি?

আমরা আপনাকে বলতে পারি, যতো বেশি সৈন্য নিয়েই আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন না কেন পরাজয় আপনার হবেই। অবশ্য আমরাই কেবল আপনাকে বলতে পারি বিজয়ের রহস্য কি। কিভাবে আমাদের পরাজিত করা সম্ভব।

আমি তোমাদের ডাণ্ডাবেড়ি ও শিকল খুলে দিচ্ছি। তোমাদেরকে কয়েদখানার বাইরে রাখার ব্যবস্থা করছি।

"আমরা যদি রহস্যের কথা আপনাকে বলি আপনি কি আমাদের ছেড়ে দেবেন? গজনী পর্যন্ত যেতে আমাদের বাহনের ব্যবস্থা করবেন?" প্রশ্ন করল নিজাম।

"তোমরা যা চাইবে তাই দেব, নিশ্চিন্ত থাক।"

আমরা এ ব্যাপারে কয়েক দিন চিন্তা করব। এরপর বলব। পরখ করে নেব, এই সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে আপনি কেমন আচরণ করেন। কারাগারের বাইরে আর ভিতরে আপনি আমাদের যেখানেই রাখেন আমরা পালিয়ে আর কোথায় যাব! একটা ব্যাপারে আপনি খেয়াল রাখবেন, আমরা মুসলমানের রান্না করা খাবার ছাড়া আহার করব না, আজও এক মুসলমানের রান্না করা খাবার আমাদের দেয়া হয়েছে। আমাদের আবদারে এক মুসলমান কর্মচারী খাবার দিয়ে গেছে আমাদেরকে।

পরাজয়ের গ্লানিতে বিপর্যস্ত রাজা বন্দীদের শর্ত মেনে নিল। হুকুম করল, আজ যে মুসলমান কর্মচারী বন্দীদের খাবার নিয়ে এসেছিল একেই তাদের তদারকিতে নিযুক্ত করা হোক।

বন্দীদের ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘরে রাখা হল। তাদের থাকার ঘরে মেহমানদের মতোই আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল। তবে তারা জানতে পারেনি যে, তাদের ঘরের বাইরে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একাধারে কয়েক সপ্তাহ ধরে সকল মন্দির ও শহরে-বাজারে প্রচার করা হচ্ছে, মুসলমানরা এদেশে আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। এরা কোন মন্দির ও পণ্ডিতকে জীবিত রাখবে না। কোন নারীর সতীত্বকেও অক্ষত রাখবে না। মুসলিম সেনাদের প্রতি হিন্দু প্রজাদের ঘৃণা বাড়ানোর জন্যে বোঝানো হল, বাপ-দাদার ধর্ম, নিজেদের মন্দির ও ধর্মগুরু বিশেষ করে মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে তাদের সরকারী কোষাগারে অকাতরে অর্থ-কড়ি দেয়া জরুরী। প্রতিটি মন্দির থেকে প্রচার করা হচ্ছে, মুসলিম আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে না পারলে হিন্দুদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। অপপ্রচারে কাজ হলো। প্রজাসাধারণ তাদের সম্পদের সিংহভাগ অকাতরে রাজকোষে ঢেলে দিল।

লাহোরের সবচেয়ে বড় মন্দির থেকে ঘোষণা করা হল, এখন বেশি করে প্রজাদের উচিত, মন্দিরে হাজির হয়ে ভগবানের ভজনা করা। সেই সাথে প্রত্যেকের কুমারী কন্যা-বোনদের নিয়মিত মন্দিরে নিয়ে আসা। কুমারীদের ভজনায় দেবতা বেশি খুশি হয়ে থাকেন।

পণ্ডিতরা একথাও প্রচার করল যে, মহারাজা এখন সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। তিনি দ্রুত মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন, যাতে মুসলমানরা লাহোর আক্রমণের অবকাশই না পায়। তাই প্রজাদের উচিত এই কঠিন সময়ে বেশি করে মন্দিরের পূজা-অর্চনায় শরীক হওয়া এবং যথাসম্ভব

রাজাকে সাহায্য করা। রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বার্থেই এখন ভজনা ও অর্থ সাহায্য উভয়টাই রাজার জরুরী।

মন্দিরের প্রচারণায় সুফল ফলল। হিন্দু প্রজারা কুমারী মেয়েদের মন্দিরে পাঠাতে শুরু করল। বড় পণ্ডিত কুমারীদের পূজা-অর্চনা পরিচালনা করতো। কিভাবে দেবতাদের সামনে হাতজোড় করে পূজো দেবে তা তদারকি করতো। আর কুমারীদের নিরীক্ষণ করতো। কারণ, তার একজন কুমারীকে দেবতার পদতলে বলিদানের জন্যে বাছাই করা জরুরী।

গজনীর দুই বন্দীর খোঁজ নেয়ার অবকাশ রাজার আর হল না। প্রতিবেশী রাজ্যের রাজারা সবাই লাহোর এসে হাজির হল। তারা প্রত্যেকে জয়পালের গজনী আক্রমণে সৈন্য ও রসদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। এতে দিল্লী, কনৌজ, গোয়ালীয়রের রাজার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। টানা কয়েকদিন পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হল। কিন্তু মুসলমানদের পুনরায় হামলা করে কিভাবে গজনী দখল করা যায় তর্ক-বিতর্ক এ পর্যায়ে আটকে রইল। পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে কিংবা পুনর্বার সহযোগিতা না করার কথা কেউই উচ্চারণ করল না।

আমরা গজনী দখল করতে পারলে ওখান থেকে আরব পর্যন্ত আক্রমণের পথ খুলে যাবে। বলল কালিঞ্জরের মহারাজা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল হওয়া উচিত যে, বিশাল মহাভারতের স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়ন করতেই হবে। মহাভারতের সীমানা ফোরাত ও দজলা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। এ কাজ আমরা না করতে পারলে আরব এলাকা খৃস্টানদের দখলে চলে যাবে। আমার কাছে খবর এসেছে, মুসলমান রাজারা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। এর অন্তরালে প্রধান ভূমিকা রাখছে খৃষ্টান গোয়েন্দারা। তারা মুসলিম আমীর-উমারাকে সুন্দরী মেয়ে ও মদের ঢোপ গিলিয়ে ওদের অন্দর মহল পর্যন্ত নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে।

আমাদেরও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বলল রাজা জয়পাল। মুসলমানদেরকে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যুদ্ধবিদ্যায় আমরা কত পারদর্শী। তবে এ মুহূর্তে আমাদের সৈনিকদের মধ্যে মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি প্রচণ্ড ভীতি রয়েছে। এরা মনে করে মুসলিম যোদ্ধারা দুঃসাহসী ও ভয়ঙ্কর। কখনো ওদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। এই ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে জনসাধারণের মাঝেও। তাই দ্রুত সুলতান সুবক্তগীনের সৈন্যদের পরাজিত করে আমাদের সৈন্য ও প্রজাদের মন থেকে এই আতঙ্ক দূর করতে হবে। গজনী আমাদের

দখলে চলে আসলে ওখান থেকে আমরা খৃষ্টানদের কৌশল অবলম্বন করে সহজে কাজ করতে পারব।

আমাদের মেয়েরা ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েদের তুলনায় বেশি সুন্দরী ও মেধাবী। বলল কনৌজের মহারাজ। আমাদের শত্রুদের পরাস্ত করতে, দেব-দেবীদের আদর্শ প্রচার ও প্রসারিত করতে, সর্বোপরি আমাদের প্রধান শত্রু মুসলমানদের ধর্মকে বিকৃত করার কাজে হাজারো মেয়েকে আমরা বলি দিতে প্রস্তুত রযেছি। আমাদের যে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুতে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে পারে তারা নিজের ধর্ম ও জাতির কল্যাণে জীবন দিতে মোটেও দ্বিধা করবে না। বস্তুত এ কাজে জীবন দেয়ার দরকার হবে না, সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুসলিম সৈনিক ও নেতাদের ভেড়া বানানোর খুবই সহজ কাজ। এটা আমাদের মেয়েরা সানন্দে করবে।

আমি একটি কুমারী বলিদান করছি। বলল জয়পাল। অন্য রাজারা রাজা জয়পালের পরাজয়ে ক্ষতিপূরণের দাবী না তুলে নতুন করে তারই নেতৃত্বে গজনী আক্রমণের ফয়সালা করে চলে গেল। জয়পাল সুবক্তগীনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রাতদিন নতুন সৈন্য সংগ্রহ, তাদের ট্রেনিং ও রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে গেল।

মন্দিরে মন্দিরে পণ্ডিতেরা সাধারণ মানুষকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত ও ক্ষুব্ধ করে তুলতে বিরামহীন কাজ করে চললো।

আর এদিকে নিজেরা মুসলিম সুলতানকে ধ্বংসের আয়োজনে পুরোদমে লেগে পড়ল। গজনীর আশপাশে মুসলিম রাজারা একজোট হয়ে একের পর এক সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অথচ যদি তিন লাখ হিন্দু বাহিনীর হাতে সুলতান সুবক্তগীন পরাজিত হতেন, তাহলে অন্য ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যগুলো জয়পালের সৈন্য-স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যেতো। সুলতান শুধু নিজের অধিকৃত রাজ্যই রক্ষা করেননি, তিনি জীবনবাজি রেখে ইসলাম ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যের মুসলমানদের ঈমান, ইজ্জত, জীবন ও জমিন রক্ষা করেছেন। তবুও কেউ তার সহযোগী হল না। সবাই তার ওপর বিরূপ। তার ছেলে মাহমূদ একমাত্র তার সহযোগী।

সুলতান সুবক্তগীন হিন্দুস্তানের জায়গায় জায়গায় গড়ে তুলেছিলেন নিবিড় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। হিন্দু রাজা-মহারাজাদের মতি-গতির খবর এরা তাকে খুব দ্রুত সরবরাহ করত। সুবক্তগীন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, জয়পাল আবার আক্রমণ করবে তার উপর। অবশ্য তিনি ধারণা করেছিলেন, এতো ক্ষয়ক্ষতি ও লোকবল হারিয়ে রাজা খুব তাড়াতাড়ি হামলা করার হয়তো সাহস পাবে না।

এদিকে তার নিজের সৈন্যবাহিনীর অবস্থাও ছিল শোচনীয়। বিশাল বাহিনীকে অল্পসংখ্যক সৈন্য দিয়ে মোকাবেলা করতে গিয়ে তারও বহু জানবাজ যোদ্ধা হারাতে হয়েছে। শুধু জয়পালের আক্রমণ আশঙ্কাই নয় আরো বহুবিধ সমস্যায় পতিত হয়েছিলেন সুবক্তগীন। প্রায় সকল প্রতিবেশী মুসলিম রাজা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাচ্ছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি দু'ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিলেন। সকল প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যে দূত পাঠালেন, তারা যেন সবাই হিন্দু আগ্রাসন মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। কিন্তু কেউ তার প্রস্তাবে সাড়া দিল না। সুলতান সুবক্তগীনের দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল, পেশোয়ারের উত্তর-পশ্চিমের ছোট ছোট দুর্গগুলোর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়া। তিনি সুনির্বাচিত ও দক্ষ কিছু সৈনিক নিয়ে এ অঞ্চলের আফগান ও খিলজী বংশজাত লোক অধ্যুষিত দুর্গগুলো দখল করে নেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রভাবিত করেন। আলেম-উলামার দ্বারা ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করে এ অঞ্চলের সবাইকে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করতে সক্ষম হলেন।

আফগানী ও খিলজীদের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী ছিল না। তারা সুবক্তগীনের সাথে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করল এবং তাদের প্রচুর সংখ্যক যুবককে সুবক্তগীনের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করাল।

এভাবে কেটে গেল আরো সময়। মাহমূদের বয়স এখন তেইশ বছর। সুলতান সুবক্তগীন তাকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তখন মুসলিম সালতানাতের অন্যান্য অংশে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। বুখারার বাদশাহ আবুল মনসুরের ইন্তেকালে তার ছেলে নূহ মসনদে আসীন হলে ফায়েক নামক এক হাকিম বিদ্রোহ করল। নূহের সৈন্যরা সুলতান সুবক্তগীনের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানাল। সুলতান সুবক্তগীন নিজে নূহের সাথে দেখা করে তার জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন।

সুবক্তগীনের নিজের রাজ্যেই বিদ্রোহ দেখা দিল। আমীর বু আলী হাসান খোরাসানের কিছু অংশ দখল করে নিল। সে বিদ্রোহী ফায়েককে আশ্রয় দিল। সুলতান সমঝোতা চুক্তির পয়গাম পাঠালেন কিন্তু আলী হাসান কোন পাত্তাই দিল না। ওদের শিকড় উপড়ে ফেলা ছাড়া সুলতানের আর বিকল্প কোন পথ রইল না। বিদ্রোহী মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ছাড়া তার আর উপায় রইল না। এদিকে বু আলী হাসান ও অন্যদের পর্দার আড়ালে থেকে খৃস্টানরা সার্বিক সহযোগিতা ও উস্কানী দিচ্ছিল। এরা বিধর্মীদের উস্কানিতে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে

আত্মগর্ভে বুঁদ হয়ে পড়েছিল। শেষতক সুলতান সৈন্য নিয়ে বলখ পৌঁছলেন, এদিকে নূহও তার সৈন্য নিয়ে সুলতানের সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন।

ফায়েক ও আলী হাসান জুরজানের শাসক ফখরুদ্দৌলাকে দলে ভিড়িয়ে নিল। ফখরুদ্দৌলার দারা নামের এক সেনাপতি ছিল। তার বীরত্বের কীর্তিগাঁথা দূর পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো।

এসব রাজা তাদের বাহিনী নিয়ে হেরাত পর্যন্ত অগ্রসর হল। সুলতান সুবক্তগীন ও তার বাহিনী হেরাতের একটি ময়দানে উপনীত হলেন। তার কাছে যুদ্ধের জন্য এ স্থানটি ছিল খুবই যুৎসই। এই শক্ত প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় সুলতানের সহযোগী একমাত্র বাদশাহ নূহ। সে কিশোর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে আমীর ফায়েক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এই আশায় যে, সে ভীত হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে। সুলতানের বড় শক্তি শাহজাদা মাহমূদ এখন কৈশোর পেরিয়ে এক টগবগে যুবক। ওদিকে সারা হিন্দুস্থানের রাজা-মহারাজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে প্রস্তুত। এদিকে নিজ ভূমিতে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে মুসলিম সেনারা পরস্পরের মুখোমুখি। একজন অপর জনের রক্তপিপাসু। এমন কঠিন সময়ে সুলতান সুবক্তগীন যখন যুবক মাহমূদ আর তরুণ নূহের দিকে তাকালেন তখন তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

"আব্বা আপনার চোখে পানি!" বিস্ময়মাখা প্রশ্ন মাহমূদের।

"ইসলামের কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ঝরানো ছাড়া আর কি করার আছে মাহমূদ!" ধরা গলায় বললেন সুলতান সুবক্তগীন।

"মুসলমানরা যখন ঐক্যবদ্ধ ছিল ইউরোপ-কুফরীস্তানেও তারা ইসলামের বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলমানদের অনৈক্যের কারণে ইউরোপ থেকে আজ ইসলাম নির্বাসিত। হিন্দুস্থানেও ইসলামের ঝাণ্ডা আজ ভূলুণ্ঠিত। বহু মুসলিম দেশ খৃস্টানরা দখল করে নিয়েছে, আরো দখলের চেষ্টা করছে। অপরদিকে হিন্দুরাও আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। তোমাদের দেখে আমার চোখে পানি এসে গেছে এই ভেবে যে, আমরা তো পরস্পর লড়াই করে একদিন শেষ হয়ে যাবো, সন্তানদের জন্যে কি রেখে যাচ্ছি! আমরা তো তোমাদের জন্য পতিত এক ইসলামী সালতানাত রেখে যাচ্ছি। ক্ষমতার লোভ, গৃহবিবাদ আর ঈমান কেনাবেচার বাজার আজ সরগরম। ঐ সব ঈমান বিক্রেতা, ক্ষমতালিপ্সুর সন্তানেরা ক্ষমতার লোভে ইসলামের শত্রুদের হাতে নিজের ঈমান-ইজ্জত বিক্রি করতে মোটেও দ্বিধা করবে না। কুফরীস্তানের মূর্তি ভাঙা ছিল আমার দায়িত্ব। বাতিল বিরোধী সংগ্রামের দায়িত্ব তোমাদের হাতে সোপর্দ করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আমার মুসলিম ভাইয়েরা– আমরা যারা একই খোদা, একই কা'বা, একই কুরআনের আদর্শে চলি– একই রাসূল (স.)-এর আনুগত্য করি তারাই আজ আল্লাহর পথ ভুলে বসেছি। বাবা! মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যত অন্ধকার। ক্ষমতা ও মসনদের লোভ আর মদ ও মেয়েতে ডুবে গিয়ে ওরা মুসলিম জাহানকে টুকরো টুকরো করছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রত্যেক মুসলিম রাজ্যে অবিশ্বাস, বিবাদ, প্রতারণা কিভাবে বিস্তার ঘটেছে। বর্তমান মুসলমানরা দৃশ্যত ঐক্যবদ্ধ হলেও এদের মনে প্রতারণার বীজ সুপ্ত রয়েছে। একে অন্যের প্রতি এরা ভীষণ অসহিষ্ণু। এরা মতভিন্নতাকেও মনে করে শত্রুতা। এরা শুভাকাঙ্ক্ষীকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। আমাদের উঁচু মহল থেকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নির্বাসিত হয়ে গেছে। খেলাফত আছে নামে মাত্র।" দীর্ঘক্ষণ কথা বলে সুলতান নীরব হয়ে গেলেন। এরপর মাথা উঁচু করে বললেন, "মাহমূদ ও নূহ! তোমাদের বাহিনীকে আমার সামনে এনে দাঁড় করাও।"

মাহমূদ ও নূহের সৈন্যরা সুবক্তগীনের সামনে এসে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। সুবক্তগীন নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আছেন। সুবক্তগীন যেখানে দাঁড়ানো সে জায়গাটি একটি টিলার মতো। সেখান থেকে আমীর ফায়েক, আলী হাসান ও ফখরুদ্দৌলার বাহিনীর তাঁবু দৃশ্যমান। সুবক্তগীন চোখ বুলালেন নূহ ও মাহমূদের বাহিনীর প্রতি। অনুক্ত যন্ত্রণায় তাঁর বুক ভারী হয়ে উঠল। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে সৈনিকদের প্রতি উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগলেন–

"আল্লাহর সিপাহীগণ! আমি তোমাদের মত একই ধর্মের অনুসারী, একই বেশ-ভূষায় সজ্জিত আরেকটি বাহিনী দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা আমাদের প্রতিপক্ষ। তোমরা আর ওরা যদি এক হয়ে যাও, পরস্পর শত্রুতা পরিহার করে ঐক্য গড়ে তোল তাহলে ইসলামের ঝাণ্ডা আবার তারেক বিন যিয়াদ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ তোমাদের ও ওদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। শত্রু ও চক্রান্তকারীরা আমাদেরকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে জীবনত্যাগী আর ওরা সিংহাসন ও ক্ষমতার পূজারী। তারা দীন, ঈমান, ইজ্জত ও হুরমতকে নিলাম করে দিয়েছে। হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা আমাদের উপর দু'বার হামলা করেছে, তোমরা ওদের তুলনায় অনেক কম লোকবল নিয়েও তাদের পরাজিত করেছো। বলতে পারো, কোন শক্তিবলে তোমরা এতো বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলে? সেই শক্তি হলো তোমরা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নাম বুলন্দ করার লক্ষ্যে মরণপণ যুদ্ধ করেছো। আর তারা ক্ষমতা, মসনদ ও তাগুতের জন্যে জীবনবাজি যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমরা

শাহাদাতের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, তাই বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করেছিলো।

এখন আমাদের প্রতিপক্ষে যারা দাঁড়িয়েছে এরা পৌত্তলিকদের মতোই খোদাদ্রোহী ও আল্লাহর দুশমন। এরা আল্লাহর দুশমনদেরই সহায়তা করছে; আমাদের নিঃশেষ করে ওরা আমাদের চিরশত্রু ও ইসলামের দুশমনদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে। তোমরা ওদের মুখে 'নারায়ে তাকবীর' শুনে বিভ্রান্ত হয়ে তরবারী কোষবদ্ধ করে ঘোড়ার গতি ঘুরিয়ে নেবে না। তোমরা এই প্রতারক-শত্রুদের দ্বারা বিভ্রান্ত হলে এই ভূখণ্ড থেকে ইসলাম চিরতরে বিদায় নেবে। এরা শয়তানের দোসর। এরা চাঁদ-তারা খচিত ঝাণ্ডা বহন করছে তোমাদের ধোঁকা দিতে। চেনা শত্রুদের আগে ছদ্মবেশী এই শত্রুদের নিঃশেষ করতে হবে। এরা ঘরের শত্রু বিভীষণ, ভাইয়ের বেশে হন্তারক, শত্রুপক্ষের ক্রীড়নক।

আমি ওদেরকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্যে চেষ্টা কম করিনি, কিন্তু তারা আমার বিনীত প্রস্তাব ও জাতির কল্যাণের কথা মোটেও বিবেচনা করল না। আমি আমার কোন ছেলের মৃত্যু মেনে নিতে পারি, কিন্তু ধর্মের অপমান সহ্য করা অসম্ভব। ইসলামের শক্তি অজেয় রাখতে আমরা জীবন বিলিয়ে দেব, কিন্তু শত্রুদের দূরাশা পূরণ করতে দেবো না।

আল্লাহর সৈনিকগণ! ইসলামের সৈনিকেরা রাজত্বের জন্যে লড়াই করে না, ইসলামের সৈনিকরা আল্লাহর হুকুমত মজবুত এবং গোমরাহ মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের শামিয়ানার নীচে একত্রিত করতে জীবনপণ জিহাদে অবতীর্ণ হয়। তোমরা কি ভুলে গেছো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো কাফেরদের কব্জায় চলে যাওয়ার পর সে সব মা-বোনের কথা, যাদের ইজ্জত নিয়ে বেঈমানেরা উল্লাস করেছিল? তোমরা কি চাও ওরা আমাদের কন্যাদের উপর নারকীয় বর্বরতা চালাক? অথচ তোমাদের বিপরীতে যেসব মুসলিম নামের কাপুরুষ আমীর-উমারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত তারা নিজ কন্যাদের ইজ্জত বেঈমানদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। যারা স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত-সম্ভ্রমের মূল্য দেয় না, তাদের কাছে ইসলাম ও ধর্মের মর্যাদা আর জাতির কল্যাণের আশা করা দুরাশা নয় কি? ইসলামের পরাজয় ও মর্যাদাহানিতে ওদের কিছুই যায় আসে না।"

আবেগ, উত্তেজনায় সুলতান সুবক্তগীনের ভাষণ আরো জোরালো ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছিল। তার অগ্নিঝরা বক্তৃতা শুনে নূহ ও মাহমূদের সৈনিকরা প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষোভে টগবগ করছিল। যোদ্ধাদের শরীরের রক্তে যেন আগুন

ধরে গিয়েছিল প্রতিপক্ষের সবকিছু তছনছ করে দিতে। কিন্তু যোদ্ধাদের এই উজ্জীবন ও উত্তেজনায় সুলতানের মধ্যে কোন আশার সঞ্চার করল না। তার মলিন চেহারার কালিমা দূর হল না। তার চেহারা তখনও দুঃখে কাতর, বিষাদে ভারাক্রান্ত। দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি সৈনিকদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের পর লড়াইয়ের কৌশল বলে দিলেন। সুবক্তগীন ও নূহ অবস্থান নিলেন বাহিনীর মাঝখানে। প্রতিপক্ষে দারা নামের এক বিখ্যাত যোদ্ধা রয়েছে। নিজ রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়েও বহু দূর-দূরত্ব পর্যন্ত মুখে মুখে ফেরে তার বাহাদুরি ও বীরত্বের কাহিনী। সে যখন সুলতানের বাহিনীকে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে দেখল, সাথে সাথে নিজ দলের সৈনিকদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। দারা জানতো, সে যদি সুলতানকে আগে আক্রমণের সুযোগ দেয় তবে বিজয়ী হওয়া কঠিন। একটু সুযোগ পেলেই সুলতানের বাহিনী সব তছনছ করে দেবে। সুলতানের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিল। দারা ছিল সদা সজাগ ও সতর্ক ব্যক্তিত্ব।

এক অভিনব কৌশল করল দারা। সে মাঝের সৈনিকদের স্থিতাবস্থায় রেখে অনেক ঘুরপথে এসে সুলতানের বাহিনীর দুই প্রান্তবাহুতে আক্রমণ করে বসল। দারার এই আক্রমণ ছিল ধারণাতীত এবং প্রচণ্ড।

সুলতানের জন্যে দারার এই চাল ছিল একেবারেই আন্দাজের বাইরে। আকস্মিক এই আক্রমণে সুলতানের বাহিনী বেঘোরে প্রাণ দিতে লাগল এবং ভড়কে গেল। দারার সেনাশক্তিও প্রচুর। তদুপরি সে নির্বাচিত ও দক্ষ বিপুল সৈন্য রেখেছিল মধ্যভাগে। সে জানতো, প্রতিপক্ষের দু'বাহু একই সাথে আক্রমণের শিকার হলে সুলতানকে দু'দিকেই সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। এতে মধ্যভাগের প্রতিরক্ষা ব্যূহ দুর্বল হয়ে পড়বে, আর এ সুযোগে সে প্রচণ্ড আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নেবে।

সুলতানকে দারার কৌশলের ফাঁদেই পড়তে হলো। পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠল। তখন তিনি মধ্যভাগের রিজার্ভ সৈন্যদের প্রান্ত বাহুকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তার রক্ষণভাগ দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি দিব্যি দেখতে পেলেন, মধ্যভাগেও আক্রমণ অত্যাসন্ন। তিনি মাহমূদ ও নূহকে বললেন, বেটা! হয়তো আজই আমার জীবনের শেষ যুদ্ধ, তোমরা সচেতন থাকো, অগ্রপশ্চাতে খেয়াল রেখো। যুদ্ধের গতি এখন শত্রুদের অনুকূলে। একটু অসতর্কতা বিরাট অঘটন ঘটাতে পারে।

সেই যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন, সুলতানের দৃষ্টিতে যখন পরাজয়ের ক্ষণ ঘনিয়ে আসছিল তখন ধূলি উড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে একজন

অশ্বারোহী সুলতানের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল। শত্রুসৈন্যদের ব্যূহ থেকে আসতে দেখলেও তার তরবারী ছিল কোষবদ্ধ, ঢালটি পিছনে বাঁধা ছিলো। আগন্তুকের অবস্থা বলে দিচ্ছিল, সে কোন প্রস্তাব নিয়ে আসছে। দূত বা বার্তাবাহক হয়তো হবে।

সে সুলতানের কাছে এলে সবাই বিস্ময়ে হতবাক। এতো কোন সাধারণ দূত বা বার্তাবাহক নয়— শত্রুপক্ষের সেনাপতি দারা নিজে হাজির। দারা সুলতানের কাছে এসে সামরিক অভিবাদন ও সালাম দিয়ে নিজের ঢাল-তরবারী সুলতানের পায়ের কাছে ফেলে দিল।

দারা বলল, সম্মানিত সুলতান! আমি ইসলাম-দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত, আপন ভাইদের বিরুদ্ধে আমি তরবারী চালাতে অক্ষম। আমি আমার দেহরক্ষীসহ সব অনুগত সৈন্যদের নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আমি যাদের সেনাপতি আজ তারা ক্ষমতার জন্যে লড়াই করছে। আমি সারাজীবন ইসলামের জন্যে জিহাদ করেছি। আমি আমার সারাজীবনের অর্জিত জিহাদের সওয়াব ও পুণ্য নষ্ট করতে চাই না। আমাকে আপনার বাহিনীতে জায়গা দিয়ে আল্লাহর দরবারে আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দিন, সুলতান!

দারা তার সাথে আসা বাহিনীকে নির্দেশ দিল, তোমরা আবার ঘুরে ক্ষমতালিপ্সু আমীর ফায়েক ও তার দোসরদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করো। দারা শুধু নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলো না, ত্যাজ্য বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ হানতে অনুসারীদের নিজে কমান্ড দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল। সুলতান সুবক্তগীন তার সকল রিজার্ভ সৈনিকদের দু'ভাগে বিভক্ত করে দুই প্রান্তবাহিনীকে সহযোগিতার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। মাহমূদকে দিলেন এক বাহুর কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব। নূহকে নিজের কাছে রাখলেন। সম্মুখ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ নূহকে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তিনি তার কোন বিপদ দেখতে চাননি।

অপরাধী কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কৃত অপরাধ অপরাধীকে তাড়া করে বেড়ায়। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার মতো মনোবল অপরাধীর থাকে না। আমীর ফায়েক ও বু আলী হাসান তার সৈন্যদের সুলতান সুবক্তগীন ও দারার দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। তাদের সাথে কিছু সৈন্যও পালাতে সক্ষম হল। এরা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, দৌড়িয়ে সুদূর জুরজানে গিয়ে থামল। জুরজানের বাদশাহ ফখরুদ্দৌলা তাদের আশ্রয় দিল। সেনাপতি দারার ঈমান ও আবেগ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল। তিনি ইসলামের গাদ্দারদের জুরজান পর্যন্ত তাড়া করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু

সুলতান সুবক্তগীন তাকে এই বলে নিবৃত্ত করলেন, তিনি এই গৃহযুদ্ধকে আর বিস্তৃত করতে আগ্রহী নন বরং তিনি তাদেরকে সমঝোতার জন্যে আহ্বান করতে চান। দারার মতো মাহমূদও গাদ্দারদেরকে তাড়া করে অগ্নিপ্রতিশোধ স্পৃহা নিবৃত্ত করতে উদ্যত ছিলেন। ছদ্মবেশী দুশমনকে নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হতে তার টগবগে তারুণ্য ও উদ্দীপিত ঈমান সায় দিচ্ছিল না, তবুও পিতার আদেশ অম্লান বদনে মেনে নিল।

সুলতান সকল সৈনিককে একত্রিত করে নূহকে তার সৈন্যসহ বুখারায় ফিরে যেতে বললেন। মাহমূদ তার নিয়ন্ত্রিত বাহিনী নিয়ে নিশাপুর রওয়ানা হলেন। সুলতান রওয়ানা হলেন গজনীর পথে। সেনাপতি দারাকে তিনি নিজের সঙ্গী করে নিলেন।

মাহমূদ নিশাপুর পৌছে নিঃশ্বাস নেয়ার আগেই তার এক সীমান্ত সেনা-দূত হন্তদন্ত হয়ে তাকে খবর দিল, ফখরুদ্দৌলার সাহায্যপুষ্ট হয়ে আমীর ফায়েক ও বু আলী হাসান যুদ্ধসাজে নিশাপুরের দিকে এগিয়ে আসছে। ফখরুদ্দৌলা পূর্ব থেকেই সুলতান সুবক্তগীনের যুদ্ধ-পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখছিল। যখন সে সংবাদ পেল, সুলতান অধিকাংশ সৈন্য সাথে নিয়ে গজনী গেছেন এবং মাহমূদের কাছে মাত্র কিছুসংখ্যক সৈন্য রয়ে গেছে। সে তখন মাহমূদের বাহিনীর উপর আক্রমণকে সুযোগ মনে করল। অকস্মাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল।

মাহমূদ সেই দূতকে দ্রুত সুলতানকে সংবাদ জানাতে পাঠিয়ে দিয়ে সৈন্যের কমান্ড নিজ হাতে নিয়ে ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন। ততক্ষণে প্রতিপক্ষের সৈন্যে ময়দান ছেয়ে গেছে। মাহমূদের বাহিনীকে ঘিরে ফেলে প্রতিপক্ষ। মাহমূদের দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ও যুদ্ধের অবসাদ দূর হওয়াতো দূরে থাক যাত্রা শেষ করার সুযোগটুকুও তার হয়নি। তার সৈন্য সংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় অতি নগণ্য। মাহমূদ প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। মাহমূদ পশ্চাদপসারণের চিন্তা করলেন। কিন্তু পিছনে ফেরারও তেমন সুযোগ নেই। শত্রুবাহিনীর ঘেরাও ছিল খুব মজবুত। বাহ্যত মাহমূদ ছিলেন মৃত্যু ও বন্দী হওয়ার মুখোমুখি।

মাহমূদের সংবাদবাহী দুই দূত উল্কার বেগে সুলতানের উদ্দেশে ছুটে চলে। মাহমূদের ভাগ্য সুলতানের সাহায্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর হয়ে আছে। কিন্তু পথ ছিল যেমন দুর্গম তেমনই দীর্ঘ।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরদিন আলী হাসান ও আমীর ফায়েক দেখল, তাদের পিছনের আগমন পথে ধূলি উড়ছে। তারা ভাবল, হয়ত ফখরুদ্দৌলা

তাদের জন্য আরো সাপোর্ট বাহিনী পাঠিয়েছে। তারা এখন নিশাপুরের সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা দুরাশায় পরিণত হলো। তারা দেখল, সুলতান সুবক্তগীনের সৈন্য দুই দিক থেকে তাদের বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে। তারা ধারণাই করতে পারেনি যে, সুলতান সুবক্তগীন এতো দ্রুত মাহমূদের সাহায্যে এত দূর পৌঁছে যাবেন। সুলতান ও দারা তাদের বাহিনীকে দুই বাহুতে প্রলম্বিত করে শত্রুদের ঘিরে ফেললেন। বিদ্রোহীরা যখন দেখল, তাদের পশ্চাদপসারণের পথ রুদ্ধ, তখন তারা নিজ বাহিনীকে একত্রিত করে সুবক্তগীনের মধ্য বাহিনীতে আক্রমণ করে বসল। পশ্চাদপসারণরত মাহমূদ ঘুরে প্রচণ্ড আক্রমণে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যুবক মাহমূদ এমনিতেই গাদ্দারদের প্রতি রাগে ফুঁসছিলেন। কিন্তু মুখোমুখি হওয়ার মতো অবস্থা তার ছিল না। তিনি সুলতানের আগমন প্রত্যাশায় কালক্ষেপণের জন্যে শুরু থেকে বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে পশ্চাদপসারণের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেখলেন, প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গতিতে সুলতান বাহিনী নিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘিরে ফেলেছেন, তখন তার ক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎগিরণ করতে শুরু করল। তিনি শত্রু বাহিনীর উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুবাহিনী তার অল্প সংখ্যক সৈন্যের আক্রমণেই ধরাশায়ী হয়ে গেল। কিন্তু কুচক্রী আমীর ফায়েক ও বু আলী হাসান কোন ফাঁকে পালিয়ে গেল কেউ টের পেল না। তাদের সৈন্যরা কচুকাটা হল। সাপের উদ্যত মাথা নীচু হয়ে গেল। এক বিশাল বিজয় সুবক্তগীনের পদচুম্বন করল।

এদিকে লাহোরের রাজা-মহারাজারা মিত্রবাহিনী প্রস্তুতিতে রাতদিন জোরদার তৎপরতায় ব্যস্ত। তারা গজনী, বুখারা, বলখ, খোরাসান দখল করার স্বপ্নে বিভোর। এবার শুধু সরকারী সেনারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না, হিন্দু প্রজা সাধারণ নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল পৌত্তলিক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লিপ্ত। নিজেদের ঘরে রক্ষিত সোনা-গহনা, উপার্জিত পুঁজি-পাট্টা, মাল-আসবাব, রসদ উপকরণ যে যা পারল সবই সুলতান সুবক্তগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিলিয়ে দিল। হিন্দু পণ্ডিত-পুরোহিতেরা নাগরিকদের মনে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। পুরোহিতরা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এই ধারণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিল, এখনই মুসলমানদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ওদের রাজ্য দখল করতে না পারলে ভবিষ্যতে ভারতে কোন হিন্দুর অস্তিত্বই থাকবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু রাজা-মহারাজাদের কর্তব্য নয়, প্রত্যেক হিন্দুর ধর্মীয় দায়িত্ব।

অপরদিকে ইসলামী ভূখণ্ডে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরস্পর খুনোখুনিতে লিপ্ত মুসলিম নেতৃত্ব। ক্ষমতালিপ্সু মুসলিম আমীরেরা মুসলিম রাজ্যগুলোকে টুকরো টুকরো করে পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিজেদের অমিয় শক্তি ক্ষয়ে লিপ্ত।

পেশোয়ার, লাহোর ও রাটাভায় সুলতানের গোয়েন্দারা জীবনবাজি রেখে রাজা-মহারাজাদের প্রতিটি পরিকল্পনা ও কার্যক্রম যথাসময়ে সুলতানকে অবহিত করছিল। তাদের ত্যাগ, বীরত্ব, সাহস ও দায়িত্ববোধের পরাকাষ্ঠা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এরা ছিল গুমনাম আত্মপরিচয় গোপনকারী ছদ্মবেশী– যারা কর্তব্য পালনের স্বার্থে নিজেদের নাম পর্যন্ত বদলে ফেলত। কিন্তু এদের অমূল্য অবদানকে ম্লান করে দিচ্ছিল হাতেগোনা কিছু সংখ্যক বেঈমান।

সুবক্তগীন রণক্লান্ত সৈনিকদের অবকাশ ও নিজেও কিছুটা বিশ্রামের জন্যে নিশাপুর থেকে বলখ চলে গেলেন। এরই মধ্যে তিনি নতুন সৈন্য ভর্তি ও সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু লাগাতার যুদ্ধ আর প্রশাসনিক কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ তার হয়নি। ইতোমধ্যে বার্ধক্য ও রোগ তার শরীরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। চিকিৎসকরা তাকে দীর্ঘ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসকরা তাকে যতো দ্রুত সম্ভব সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। অপরদিকে অসুস্থতা তার চেয়েও বেশি দ্রুত বেগে বাড়তে শুরু করল। এক পর্যায়ে তিনি গজনী চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং গজনীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে যাত্রা বিরতি করতে হলো। তার পক্ষে আর পথচলা সম্ভব হলো না। একদিন সুলতান সুবক্তগীন শাইখ আবুল ফাতাহকে অসুখের প্রচণ্ডতায় বলছিলেন, "আমরা অসুস্থ হলে সুস্থ হওয়ার জন্যে চিকিৎসা করি, এক সময় সুস্থও হই। আবার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হই, আবার চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হই। কিন্তু একদিন এমন আসে যখন আর সুস্থতা ফিরে আসে না। দুনিয়ার কোন চিকিৎসাই মৃত্যু থেকে মানুষকে রেহাই দিতে পারে না। কসাইরা যেমন খুব যত্ন করে খাসিকে ঘাস-পানি দেয়। খাসি কসাইয়ের আদর-যত্নে ভাবতে থাকে, সে চিরদিনই এমন আদর-যত্নেই থাকবে। কিন্তু হঠাৎ কসাই খাসির গলায় ছুরি চালিয়ে নিমিষে তার সকল আদর-যত্নের অবসান ঘটায়। মৃত্যুও কসাইয়ের মতো। যতো আরাম-আয়েশেই আমরা এখন থাকি না কেন, একদিন এই নির্মম মৃত্যু আমাদের জীবন কেড়ে নেবে, মৃত্যু থেকে কারো রেহাই নেই।" সমকালীন বুযুর্গ শাইখ আবুল ফাতাহকে একথা বলার ঠিক চল্লিশ দিন পর হঠাৎ সুলতানের অসুখ খুব বেড়ে গেল। তিনি কিছু বলার জন্য চোখের ইশারায় নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজছিলেন, তার বাকশক্তি রহিত

হয়ে আসছিল। নিরাপত্তারক্ষীর কমান্ডার তার সামনে এগিয়ে গেলে তিনি বলেন, "মাহমূদকে বলবে, তোমাকে মূর্তিসংহারী হতে হবে। তাকে কর্তব্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে।" একথা বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁর দেহ নিথর হয়ে গেল। মৃত্যুবরণ করলেন সুবক্তগীন।

সময়টি ছিল ৯৯৭ সালের আগস্ট মোতাবেক ৩৮৭ হিজরী সনের শা'বান। ৫৬ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন সুলতান সুবক্তগীন। ছিন্নমূল যাযাবর পুত্র, দাসের হাটে বিক্রিত গোলাম ইসলামি ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করে, মূর্তিসংহারী বিশ্বখ্যাত সন্তান জীবন্ত কীর্তি রেখে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইতিহাস তাকে চিরদিন সত্যের পূজারী ও মিথ্যার বিরুদ্ধে অকুতোভয় বীর যোদ্ধা হিসেবে স্মরণ করবে।

মাহমূদ পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে পিতার শিয়রে হাজির হলেন। মৃতদেহ নিয়ে গেলেন গজনী। সেখানে কাফন ও জানাযা শেষে তাঁকে কবরে সমাহিত করলেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুতে তাকেই কাঁধে তুলে নিতে হলো রাজ্যপাটের গুরুদায়িত্ব।

অভিন্ন ঔরসের দুই গর্ভজাত : দুই পথ

সুলতান সুবক্তগীনের মৃত্যুর পর মাহমূদ পিতার দাফন কাফন সেরে পুনরায় নিশাপুর চলে গেলেন। পিতার অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন মাহমূদ। তাছাড়া তাদের মোকাবেলায় চতুর্দিকের রণপ্রস্তুতি সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন তিনি। পিতার রেখে যাওয়া মিশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিতৃহারা শোককে তিনি শক্তিতে পরিণত করতে সৈন্যবাহিনীর প্রতি নজর দিলেন। গজনী গিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের রুটিন ওয়ার্ক করাটাকে তিনি গৌণ মনে করলেন। তার বিশ্বাস ছিল, প্রশাসনিক যন্ত্র ঠিকমতই কাজ করবে। কেননা তার পিতার জীবদ্দশায় প্রশাসনের কোথাও উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঘটতে তিনি দেখেননি। তাই রাজধানীতে গিয়ে রাজকীয় আয়েশে বিভোর হওয়ার কথা তার চিন্তায় মোটেও স্থান পায়নি। তার মনে হয়নি, কারো পক্ষ থেকে প্রশাসনে কোন ঝামেলা কিংবা অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। গজনী যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলেন মাহমূদ।

মাহমূদ ছোটবেলা থেকেই বিলাস বিমুখ। পরিশ্রমী, সত্যাশ্রয়ী। মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন মাহমূদ।

সমকালীন বিখ্যাত সূফী ও বুযুর্গ আবুল হাসান খারকানীর প্রিয়ভাজন মুরীদ ছিলেন মাহমূদ। আবু সাঈদ আব্দুল মালেক নামের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ আলেম ব্যক্তির সাথেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তিনি প্রায়ই কিরখানীর দরবারে উপস্থিত হতেন উপদেশ ও নসীহত নিতে। আর আবু সাঈদ প্রায়ই মাহমূদ-এর সাক্ষাতে আসতেন। বস্তুত আলেম, বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সংশ্রব ও সান্নিধ্য তিনি পছন্দ করতেন। তার সময়ে অস্থিরতার মধ্যেও ইলম্ ও জ্ঞানের চর্চায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অবারিত। ইলম্ তথা কুরআন-হাদীস-ফেকাহ্ ও ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন চর্চায় তাঁর সাহায্য ছিল মুক্তহস্ত। তাঁর দরবারে সর্বক্ষণ জ্ঞানী-গুণী ও আলেম-বুযুর্গ ব্যক্তিদের সরব পদচারণা ছিল। তাদের যথার্থ মর্যাদা ও সম্মান করা হতো। মাহমূদ কোন বুযুর্গ আলেমের সম্মানে সিংহাসন ছেড়ে রাস্তায় এসে তাকে স্বাগত জানাতেন।

পিতৃবিয়োগে শোকাতুর হওয়ার অবকাশ হয়নি মাহমূদের। রাজা জয়পাল ও জয়পালের প্রতিশোধ গ্রহণে মাহমূদ ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি জানেন, মূর্তিপূজারীরা শেষ লড়াইয়ে সকল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাকে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় মনোযোগী হতে হল। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেও পারেননি যে, তোষামোদ ও মোসাহেব গোষ্ঠী সালতানাতের ভিত্ কুরেকুরে ঘুণ পোকার মতো খেয়ে ফেলছে। তারা ভেতর থেকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে গজনীর সুলতানী, আর রাজকোষ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি যখন খবর পেলেন, গজনীর ক্ষমতায় এখন মাহমূদের বৈমাত্রেয় ভাই ইসমাঈল সমাসীন এবং সে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেছে আর মোসাহেবদের জন্য সে রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, রাষ্ট্রের সম্পদ তারা দু'হাতে লুটে নিচ্ছে। তখন পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এক গোয়েন্দা তাকে এ সংবাদ জানিয়েছিল।

ইসমাঈল ছিলেন সুলতান সুবক্তগীনের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। সুবক্তগীনের মৃত্যুশয্যায় পাশে ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী। অন্তিম মুহূর্তে আপন পুত্রের পক্ষে সুলতানীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির উইলে সুলতানের দস্তখত করিয়ে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী। মাহমূদ পিতার দাফন কাফন সেরে নিশাপুর চলে গেলে সুলতানের দ্বিতীয় স্ত্রী উইলপত্র দেখিয়ে কতিপয় মোসাহেব, আমলা ও স্বার্থপর শ্রেণীর যোগসাজশে মাহমূদকে অবহিত না করেই ইসমাঈলকে সুলতানের আসনে বসিয়ে দেয়া হল। উইলপত্রে সুলতানের মোহরাংকিত প্রমাণ ও স্বাক্ষর দেখে অনেকেই অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ দ্বিতীয় পুত্রকে সুলতানের উত্তরাধিকার

হিসেবে বিনা বাধায় মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের অজ্ঞতার পর্দা উন্মোচিত হতে বেশি দিন লাগেনি। কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপে আবির্ভূত হল ইসমাঈল।

প্রমাণ হয়ে গেল, একই পিতার ঔরসজাত হলেও দু'মায়ের গর্ভজাত দু'ভাইয়ের মত ও পথ ভিন্ন। ভিন্ন তাদের দৃষ্টি, রুচি এবং লক্ষ্য।

একদিকে মাহমূদ পিতার পদাংক অনুসরণ করে হিন্দুস্তান আক্রমণ ও হিন্দু আগ্রাসন প্রতিরোধে সৈন্যবাহিনী তৈরিতে রাত-দিন ব্যস্ত আর অপরদিকে ইসমাঈল বলখে তখতে আসীন হয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের ধুমধামে ব্যস্ত, মোসাহেবদের নিয়ে ভোগবিলাসে নিমজ্জিত।

সুলতান আলী মাকাম! গজনী থেকে আগত এক প্রবীণ গোয়েন্দা অফিসারের সম্বোধন।

খবর কি জনাব! গজনী থেকে কি জরুরী কোন খবর নিয়ে এসেছেন? আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলেন মাহমূদ।

জ্বী হ্যাঁ! আমি গজনী থেকে জরুরী সংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে আপনি রাত-দিন যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লিপ্ত রয়েছেন। ওরা আমাদের দেশ কব্জা করতে চায়, আমাদের ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু এখন আর হিন্দুস্তানের রাজাদের হামলা করার দরকার হবে না, আমরাই আমাদের ধ্বংসের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলেছি। আপনি আর আপনার মরহুম পিতা হিন্দুদের নাকানি চুবানি খাইয়েছেন। ওরা এখন প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। জাতি এখন কঠিন সন্ধিক্ষণ অতিবাহিত করছে।

অথচ ইন্তেকালের আগে আপনার পিতা নিজেই আমাদের সালতানাত ধ্বংসের সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

"আপনাকে মরহুম সুলতানের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আমি সুলতান বলে সম্বোধন করেছি, কিন্তু আপনি জানেন না, আমাদের সুলতান আপনি নন আপনার বৈমাত্রেয় ভাই ইসমাঈল এখন গদীনসীন। আমি আপনাদের একজন নগণ্য খাদেম। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমার নাক গলানো হয়তো অনুচিত। কে ক্ষমতায় আসীন হলো, ছোট ভাই না বড় ভাই তা মনোনীত করার দায়িত্ব হয়তো আমার কর্তব্যের আওতা বহির্ভূত। কিন্তু দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে দরবারে আগে সেনাপতি ও জেনারেলগণ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুলতানের দিক-নির্দেশনা ও শলা-পরামর্শের জন্য আসতেন, বর্তমানে সেই নিবেদিতপ্রাণ সেনাপতি জেনারেলদের স্থান দখল করেছে মোসাহেব, চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী আমলাশ্রেণী। আপনার পিতার সময় থেকে হক ও সত্যের পথের যাত্রী

এবং বিশ্বস্ত খাদেম হিসেবে বলছি, জানি না আপনার ছোট ভাইয়ের মূল পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা কে, তবে এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তার ঘাড়ে চেপে বসেছে স্তাবক, স্তুতিবাজ ও কুচক্রীমহল। ধান্ধাবাজ ও স্বার্থান্বেষী মহল এখন দরবারের গুরুত্বপূর্ণ পদে, কর্তব্যপরায়ণ ও যোগ্য লোকদের পরিবর্তে ধূর্ত ফাঁকিবাজরা পাচ্ছে পদোন্নতি, সৈনিকদের বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর কমান্ডিং পদে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। আমাকে ট্রেজারীর এক বিশ্বস্ত কর্মকর্তা বলেছে, রাজকোষ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।"

অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব মাহমূদের মাথায় যেন আসমান ধসিয়ে দিল। তিনি প্রবীণ এই কর্মকর্তাকে দিক নির্দেশনা এবং আরো গভীরের বাস্তবচিত্র সংগ্রহ করে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়ে গজনী যেতে বললেন। নিজে দ্রুত হাজির হলেন মায়ের কাছে। ঘটনার ইতিবৃত্ত তাকে শোনালেন। মাহমূদ বললেন, "মা! গজনী ত্যাগ করাই আমার উচিত হয়নি। কিন্তু মসনদের লালসা আমার মনে ছিল না, আমি তো সুলতানীর গদি দখলের চেয়ে জাতির মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধান গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছি।"

"না মাহমূদ! গজনী যাওয়া তোমার ঠিক হবে না। তোমার ভাই তোমাকে হত্যাও করতে পারে। ক্ষমতার লালসা আর নেতৃত্বের মোহ মানুষকে অন্ধ, উন্মত্ত করে তোলে। একথাও ভেবে দেখো, সেও তোমার পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তুমি তাকে সুলতান হিসেবে থাকতে দাও, তবে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিজের হাতে রাখ।"

"সে যদি সালতানাতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতো তাহলে আমি এতো পেরেশান হতাম না। মা! আপনি কি জানেন না, সে কত দুর্বল চরিত্রের মানুষ! আমাকে আমার পীর ও মুর্শিদ বলেছেন, অযোগ্য ও অপরিণামদর্শী নেতৃত্বের পাপের সাজা গোটা জাতিকে ভুগতে হয়। আমি সুলতান হতে চাই না মা! কিন্তু সালতানাতকে আমার বাঁচাতে হবে। আমার দেশকে একটি ইসলামী অপরাজেয় দুর্গে পরিণত করে হিন্দুস্তানের ভূতখানাগুলোতে ইসলামের আলো পৌঁছাতে হবে।

আমার ভাই কল্যাণকামী ও বুদ্ধিমান হলে তার অভিষেক অনুষ্ঠানে অবশ্যই আমাকে দাওয়াত জানাত। সে আমাকে দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা এ সংবাদ আমার জানার সব পথও বন্ধ করে দিয়েছে। তাতেই বোঝা যায়, তার উদ্দেশ্য সৎ নয়। আমাকে গজনী যেতেই হবে। আমার কাছে সংবাদ এসেছে, এ মুহূর্তে ইসমাঈল গজনী নয় বলখে রয়েছে।"

"তুমি তাকে এ মর্মে খবর পাঠাও– তুমি জানতে চাও, তুমি যে সংবাদ পেয়েছো তা সঠিক কি-না। অভিষেক অনুষ্ঠানে তোমাকে দাওয়াত না দেয়ার কারণ কি।" বললেন মাহমূদের মা। এরপর জবাবের অপেক্ষা কর।

"মাহমূদের দূত যখন ইসমাঈলকে তার পয়গাম পৌঁছাল তখন তিনি বলখে অবস্থানরত। ইসমাঈল পয়গাম লেখা কাগজটি না খুলেই তার এক অনুগতের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পড়ে শোনাও, আমার ভাই কি লিখেছে!"

নির্দেশ পেয়ে ইসমাঈলের অমাত্য কাগজ খুলে উচ্চকণ্ঠে পড়তে লাগল, 'প্রিয় ভাই!' এতটুকু শুনে ইসমাঈল ক্ষোভে উরুতে থাপ্পড় মেরে বলল, 'অ্যা! সে আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করল! সুলতান বলেনি?'

না! জিল্লে এলাহী! বলল-অমাত্য।

এই হতশ্রী চেহারাধারীর এতো বড় স্পর্ধা! ধৃষ্টতা!

এই অপমানের জন্যে তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত, সুলতান আলী মাকাম! বলল এক অনুগত অমাত্য।

"এমন গোস্তাখির জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া অপরিহার্য।"

আল্লাহ ও রাসূলের পরেই সুলতানের মর্যাদা। জিল্লে এলাহীর সওয়ারী যে পথে যায় মানুষ সম্মানে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, শত্রু আপনার নাম শুনে কাঁপতে থাকে।

"হু, সামনে পড়" বলল ইসমাঈল। মাহমূদ লিখেছে, "এ ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই যে, তুমি সালতানাতের মসনদে বসেছো। আল্লাহ তোমার এ মর্যাদাকে মোবারক করুন। কিন্তু সালতানাতের যে সব সমস্যা ও ঝুঁকি রয়েছে, দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার পর যে সব কর্তব্য অবশ্যম্ভাবী কাঁধে বর্তায়, হয়তো তুমি সে সম্পর্কে অবহিত নও। যদি অবগত হতে তবে মসনদকে ফুলশয্যা মনে করে আরাম-আয়েশে ডুবে যেতে না। সবার আগেই আমার কাছে আসতে, না হয় আমাকে ডেকে নিতে। তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে করতে, তাহলে একই পিতার সন্তান হিসেবে আমাকে অবশ্যই তোমার অভিষেক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে। অথচ তুমি মসনদে বসে অভিষেক অনুষ্ঠান করেছো, সবই আমার অজ্ঞাতে। এতে করে আমার সন্দেহ হয়, হয়তো তোমার মধ্যে কোন দুরাকাঙ্ক্ষা রয়েছে অথবা তোমার দরবারের কুচক্রীরা তোমার মধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। ওরাই তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে। তুমি তো জানো যে, সালতানাতের অভ্যন্তরেও আমাদের দুশমনরা ঘাপটি মেরে রয়েছে। তোমার সামনেই তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে। হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা আমাদের উপর দু'বার আক্রমণ করেছে, পুনরায় আক্রমণ চালানোর পায়তারা করছে। এই ক্রান্তিকালে আমাদের উচিত হবে না, মোসাহেব ও চাটুকারদের মুখে নিজেদের স্তুতি ও প্রশংসা শোনা। এ মুহূর্তে আমাদের ময়দানের তাঁবুতে থাকা কর্তব্য।

তুমি যদি মনে কর, সালতানাতের কাজকর্ম চালাতে সক্ষম হবে, তবে আমি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখছি। যুদ্ধপ্রস্তুতির দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া সময়ের দাবী। তোমাকে আমি এই শর্তে সুলতানী দায়িত্ব অর্পণ করতে পারি, তুমি ভালো-মন্দ, দোস্ত-দুশমন, সৎ-অসতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সচেষ্ট হবে। কিন্তু আমার ধারণা, তুমি এখনও সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারনি। তুমি অযোগ্য লোকদের পদোন্নতি দিয়েছো শুধু চাটুকারিতার যোগ্যতা বিবেচনা করে। তুমি সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে রাজকোষের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছো। তুমি ভুলেই গেছো যে, আমাদের উপরেও এক খলীফা রয়েছে, তুমি শুধু একটি ইসলামী রাজ্যের সুলতান মাত্র।

আমার একটি পরামর্শ মেনে নাও। তাহলে আমি মরহুম আব্বাজানের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবো। তুমি যদি নিজেকে সুলতানীর যোগ্য মনে কর, তবে বলখ ও খোরাসানের দায়িত্ব আমি তোমার হাতে ন্যস্ত করতে পারি কিন্তু তোমাকে কেন্দ্রের আসন ত্যাগ করতে হবে। আশা করি তুমি আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবে।"

ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই

মাহমূদ।

হুকুমবরদার যখন এই কথাগুলো পড়ছিল, ইসমাঈল ক্ষোভে টলছিল। পড়া শেষ হলে সে থেমে দরবারী পরামর্শদাতাদের দিকে তাকাল।

জিল্লে এলাহী! আমরা আপনার এই অপমান সহ্য করতে পারি না। বলল উজীরে আজম।

আপনি যদি শাসকের যোগ্য না হন তবে আর কে? বলল অপর অমাত্য।

ইসমাঈলের সকল দরবারী মাহমূদের বিরুদ্ধে ইসমাঈলকে উত্তেজিত করার জন্য যা যা বলা দরকার তা-ই বলল।

অবশ্য এদের সবাইকে ইসমাঈল পদোন্নতি দিয়ে নিজের উপদেষ্টা, উজীর, নাজির ইত্যাদি পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। এদের সম্পর্কেই মাহমূদ ইসমাঈলকে সতর্ক করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইসমাঈল তার বড় ভাইয়ের পয়গামকে গোপনে একাকী পড়ার প্রয়োজনই বোধ করেনি। দরবারী উমেদাররা চিঠির ভাষা অনুধাবন করে ইসমাঈলকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে তীব্র তোষামোদের ঝড়ে উত্তেজিত করে তুললো।

আপনার ভাই সৈনিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিতে আপত্তি করেছে। অথচ আপনার এই মহানুভবতায় গোটা বাহিনী আপনার ভক্ত হয়ে গেছে। আপনার একটু ইঙ্গিতে সারা ফৌজ জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছে। বলল উজীরে আ'লা।

আপনার বড় ভাই পয়গামে লিখেছে, সালতানাতের ভেতরে দুশমন রয়েছে এবং হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরাও আমাদের দুশমন। জিল্লে এলাহী! শপথ করে বলতে পারি, দেশের অভ্যন্তরে আমাদের কোন দুশমন নেই। আপনার আব্বা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শত্রু বানিয়েছেন এতে আপনার বড় ভাইয়ের মুখ্য ভূমিকা ছিল। সে চায় ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিতে। হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা আমাদের শত্রু হবে কেন? আমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে নিশ্চয়ই তারা আমাদের বন্ধুতে পরিণত হবে। কেন আমরা যুদ্ধ বিগ্রহের পথে অগ্রসর হব? এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ কি?

উজীরের সমর্থনে আরো কিছু মুখের হু হ্যাঁ রব শোনা গেল। কিন্তু এক বৃদ্ধলোক আগাগোড়াই নীরব ছিলেন। তিনি নীরবে ইসমাঈল এবং অমাত্যবর্গের নির্লজ্জ চাটুকারিতা দেখছিলেন। উজীর যখন বলল, "যুদ্ধ বিগ্রহের পথে কেন অগ্রসর হব?" তখন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন–

"যে নিজের ইজ্জত, মর্যাদা ও ঈমান বিক্রি করে দেয় তার আবার শত্রুর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার দরকার কি?" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন, 'ইসমাঈল বিন সুবক্তগীন! তোমার জন্ম হতে আমি দেখেছি, আমার চোখের সামনে তুমি ছোট থেকে বড় হয়েছ। তুমি এখনও ছোট এবং যেসব ঈমান বিক্রেতাদের খেলার ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছ, তারা তোমাকে পুতুল সুলতান বানিয়েছে। এরা দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে, তোমাকেও অন্ধ বানাতে চাচ্ছে। তুমি নিজে সালতানাতের সিংহাসন জবর দখলে নিয়েছ, তোমাকে কেউ সুলতানী সোপর্দ করেনি। জাতিও তোমাকে সুলতান হিসেবে বরণ করেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকেও মনোনীত নও তুমি। তোমার মধ্যে যদি জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে থাকে, সেই বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে আস্তিনে মুখ রেখে বল, সত্যিকার অর্থে কি তুমি

সুলতানী মসনদের জন্যে যোগ্য? তোমার ভাই ঠিকই লিখেছেন, সে সব লোকদের জন্য তুমি প্রসন্ন যারা তোষামুদে ও চাটুকার, এরা তোমাকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে যাবে। এরা নিজের উদরপূর্তির জন্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজাড় করছে, এরা তোমাকে আজন্ম শত্রু হিন্দুস্তানের ভূতপূজারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পরামর্শ দিচ্ছে। এরা চায়, যুদ্ধ না করে আরামে জীবন কাটাতে।" কথাগুলো তীব্র আক্রোশে বলে হাঁফাতে লাগলেন বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন কোষাগারের প্রধান কর্মকর্তা ফররুখ জাদ ইবরাহীম।

"সুলতান আলী মাকাম! এই বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে গেছে। তার মাথা ঠিক নেই। যেখানেই যায় এমন অলক্ষুণে বকতে শুরু করে। তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেয়া উচিত।" বলল উজীর।

"একে নিয়ে যাও!" গর্জে বলল ইসমাঈল।

ইসমাঈলের হুকুমে কয়েক অমাত্য বৃদ্ধের উপর হামলে পড়ল। তারা বয়োজ্যেষ্ঠ এই প্রবীণকে টেনে হেঁচড়ে দরবার থেকে বের করে দিল। বৃদ্ধের কণ্ঠে শোনা গেল, "ক্ষমতার লিপ্সায় যেখানে ভাই ভাইয়ের দুশমন হয় রহমত সেখান থেকে বিদায় নেয়। মিথ্যার পরাজয় ও সত্যের জয় হবেই।"

মাহমূদ নিশাপুরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ইসমাঈলের কাছে প্রেরিত পয়গামের উত্তরের জন্যে। দূতের আনা জবাবপত্র পড়ে তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। ইসমাঈলের জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত। ইসমাঈল লিখেছিল, "আমাকে আব্বা সালতানাতের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। সে পিতৃদত্ত দায়িত্ব অন্য কাউকে অর্পণ করবে না। এবারের গোস্তাখি ক্ষমা করা হল। আগামীতে সুলতানের বিরুদ্ধে এমন অবমাননাকর কিছু করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।"

ইতি

সুলতান গজনী

ইসমাঈল।

মাহমূদ তার মা ও মামা বু আজীজ ও ছোট ভাই নাসিরদ্দীন ইউসুফকে ডেকে পরিস্থিতি অবহিত করে বললেন, আপনারা ইসমাঈলকে জানেন, সে আমার পয়গামের যে লিখিত জবাব দিয়েছে তা তার কথা নয়। এমন কথা বলার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি তার নেই। দূত আমাকে বলেছে, আমার চিঠি বলখ দরবারে প্রকাশ্যে পড়া হয়েছে এবং চরম অবমাননাকর হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে আমার চিঠি নিয়ে। এরা ফররুখ জাদ ইবরাহীমের মতো বিশ্বস্ত ও প্রবীণ

কর্মকর্তাকে সত্য বলার অপরাধে টেনে হেঁচড়ে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দিয়েছে। তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছে। অথচ আব্বাজানও তাকে সম্মান করতেন। এর অর্থ হলো, গজনীর কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে ইনসাফের জায়গায় এখন জুলুম ঠাঁই করে নিয়েছে। আমি কোন দরবারী লোকের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেই না। আমার বড় উপদেষ্টা আপনারা। আমাদের সবার দেহে একই রক্ত প্রবাহিত। একই চেতনার ধারক-বাহক আমরা। আমার সন্দেহ হয়, ইসমাঈলের রক্তে কোন বদকারের মিশ্রণ রয়েছে।

"ও যদি আমার গর্ভজাত সন্তান হতো তাহলে ক্ষমতালিপ্সুদের পরামর্শ না শুনে আল্লাহর নির্দেশমতো চলতো। ইসমাঈল তোমার বাবার ঔরসজাত হলেও ওর মা ওর মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও নেতৃত্বের খাহেশ পয়দা করেছে।" বললেন বেগম সুবক্তগীন। তিনি আরো বললেন, 'মাহমূদ! আমি তোমার দুধের দাবী সে দিন ত্যাগ করব যেদিন তুমি হিন্দুস্তানে অভিযান চালিয়ে জালেমদের ধ্বংস করবে। আগ্রাসী হিন্দুদের পরাজিত করে ইট-পাথরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধুলায় মিশিয়ে দেবে।'

"মা! আমাদের অধিকাংশ সৈনিক এখন ইসমাঈলের অধীনে রয়েছে। সৈনিকদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে সব সৈনিককে তার ভক্ত বানিয়ে নিয়েছে। সন্ধি-সমঝোতার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। মা! আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন, যে অল্প সংখ্যক সৈন্য আমার অধীনে রয়েছে তাদের নিয়ে আমি বলখ আক্রমণ করি?"

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই'। বললেন মাহমূদের মামা বু আজীজ। তবে তোমার সৈন্য স্বল্পতা একটা বড় সমস্যা। হামলার আগে দেখে নেয়া দরকার গজনী ও বলখের সৈন্যরা কার প্রতি অনুগত ও সহনশীল!'

'আমার হাতে যাচাই বাছাই করা ও কালক্ষেপণের সময় নেই, মামা! হিন্দুস্তান থেকে যে সব খবর পাচ্ছি তা খুবই ভয়াবহ। হিন্দুস্তানের সৈন্যদের সাথে সে দেশের সাধারণ নাগরিকরা পর্যন্ত আমাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে গণবাহিনী। মন্দিরগুলোতে পণ্ডিত-পুরোহিতেরা গজনী দখলের জন্য নাগরিকদের সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ করছে। কথা চালিয়ে আর দূতিয়ালি করে সময় নষ্ট করার অবকাশ আমার নেই।'

"আহ্, মামা! এ মুহূর্তে আমাদের হিন্দুস্তানের পথে থাকা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই জাতির, আমার আব্বার মতো বীর শাসককেও স্বজাতির গাদ্দারদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে করতে কবরের পথে যাত্রা করতে হলো।

সীমানার বাইরে নজর দেয়ার সুযোগ তাঁর হলো না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না। আমাকেও পিতার মতই গৃহযুদ্ধের ফাঁদে পড়তে হলো!"

'বেটা! ক্ষমতালিপ্সুদের পরাজয় অনিবার্য। এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসমাঈল সালতানাতের ভীষণ ক্ষতি করেছে। দেশ আমাদের রক্ষা করতেই হবে। অল্পসংখ্যক সৈনিক যা-ই আছে এদের ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের বিকল্প পথ নেই'। বললেন মামা।

বলখে ইসমাঈলের কাছে খবর পৌঁছল মাহমূদ নিশাপুর থেকে সৈন্য নিয়ে গজনীর পথে রওয়ানা হয়েছে। নিশাপুরের তুলনায় বলখের অবস্থান গজনীর কাছে। ইসমাঈল তার সেনাপতি, কমান্ডার ও অমাত্যবর্গকে ডেকে বলল, 'আমার ভাই বিদ্রোহ করে গজনীর পথে সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়ে এগিয়ে আসছে। সে গজনী দখল করতে চাচ্ছে। আমি সৈনিকদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেয়ায় সে খুব ক্ষুব্ধ। সে গজনীর সেনাবাহিনীকে গোলাম বানিয়ে রাখতে চাচ্ছে। সকল সৈনিকের একথা জানিয়ে দাও এবং সকলে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হও।'

ইসমাঈলের অমাত্যবর্গ এই উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, এভাবে সৈনিকদের কব্জা করে তাদেরকে সালাতানাতের শত্রু দমনের চেয়ে ইসমাঈলের ব্যক্তি-শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহী করতে পারবে। উজীর ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহল সাধারণ নাগরিক ও সৈনিকদের মধ্যে প্রচার করল, মাহমূদ গজনী কর্তৃত্ব নিজের অধীনে নিয়ে হিন্দুস্তান আক্রমণ করতে চাচ্ছে। হিন্দুস্তান আক্রমণ করে সে তথাকার সোনা-দানা, মণি-মুক্তা দিয়ে নিজের কোষাগার বোঝাই করতে চায়। মাহমূদের অধীনে কোন সৈনিকের জীবন আর নিরাপদ নয়।

ইসমাঈলের সৈন্যরা গজনীর কাছে মাহমূদের সেনা অবস্থানের কাছে পৌঁছে গেল। মাহমূদের বড় দুর্বলতা ছিল, তার সৈন্য সংখ্যা অল্প। তাছাড়া মাহমূদের ইচ্ছে ছিল, ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে লোকক্ষয় না করে সমঝোতার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির মীমাংসা করা। মাহমূদ ইসমাঈলের কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন, লড়াই ত্যাগ করে দু'জনের মধ্যে একটা আপোস-রফার জন্যে উভয়ের একান্ত মোলাকাত হওয়া দরকার। গৃহযুদ্ধের দ্বারা শত্রুরাই বেশি উপকৃত হবে। আল্লাহ না করুন, আমাদের যুদ্ধকালে যদি দুশমনরা রাজধানী আক্রমণ করে বসে তবে তো দেশটাই শত্রুর দখলে চলে যাবে। এমতাবস্থায় রাজত্ব নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই অর্থহীন। আমাদের উচিত, পারস্পরিক এ ভ্রাতৃঘাতী লড়াই এড়িয়ে যাওয়া।

"আমি কেন তার কাছে যাব, সে একজন বিদ্রোহী। ওকে গ্রেফতার করে আমি বিদ্রোহের অপরাধে এমন মর্মন্তুদ শাস্তি দেবো, ভবিষ্যতে আমার দেশে কেউ বিদ্রোহের দুঃসাহস দেখাবে না।" দূতের পয়গামের জবাবে বলল ইসমাঈল।

'তিনি উভয়ের কল্যাণার্থে-ই এই প্রস্তাব করেছেন এবং আমাকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, আপনাদের সাক্ষাতের জন্যে আমি আপনাকে উৎসাহিত করব।' আমাকে বার্তাবাহক হিসেবে নয় দূত করে পাঠানো হয়েছে। বলল মাহমূদের দূত। "আপনি তাকিয়ে দেখুন! গৃহযুদ্ধের দ্বারা আমাদের ক্ষতি ছাড়া কি উপকার হবে? গৃহযুদ্ধ এ দেশের রেওয়াজে পরিণত হতে যাচ্ছে। আজ এক বাপের দু'ছেলে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের মুখোমুখি। এই উন্মত্ত খুন পিপাসা আমাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে বৈ কি! আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, গভীরভাবে মাহমূদের প্রস্তাব চিন্তা করে দেখুন। তার এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন কুটিলতা নেই।" বলল মাহমূদের দূত।

"হু", আমি তার সমঝোতা-প্রস্তাবের রহস্য ভাল করে জানি। তার সৈন্য সংখ্যা সীমিত এজন্য সে সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছে, নয়তো সে সন্ধি প্রস্তাব কেন পাঠাবে? সে তো নিশ্চিত পরাজয় ও মৃত্যুর বিভীষিকা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে। আমি তার সৈন্য পিষে ফেলব আর তাকে বন্দী করে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবো। যাও, তাকে গিয়ে বল, আমার আর তার সৈনিকদের মোলাকাত হবে ময়দানে, আমার সাথে তার মোলাকাত নয়।"

দূত তার ঘোড়ায় এক লাফে চড়ে ইসমাঈলের উদ্দেশে বলল, ক্ষমতার লালসা আর মসনদের আকাঙ্ক্ষা বহু ক্ষমতাবান রাজা-মহারাজাকেও পরাজয়ের তকমা পরিয়েছে। মনে রাখা উচিত, অহঙ্কারীর পতন অনিবার্য— একথা বলেই সে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল।

পিতার মতো ময়দানে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে মোনাজাত করলেন মাহমূদ। বললেন, "আয় প্রভু! আমি যদি ভ্রান্তপথে থাকি তবে এখনই আমাকে ধসিয়ে দিন, আর যদি আমি সঠিক পথে থাকি, আপনার কাছে যদি আমার আকাঙ্ক্ষা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, আমি যদি দুনিয়ার যশ-খ্যাতি ও ক্ষমতার লোভে এখানে না এসে থাকি, হিন্দুস্তানের ভূতখানাগুলোতে ইসলামের আলো পৌছানোর আকাঙ্ক্ষা যদি আমার সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে পথের সকল বাধা দূর করার তৌফিক দিন। আমার ভাই

আমার পথে বড় বাধা, এ বাধা আমাকে অপসারণ করার শক্তি দিন। যাতে আমি অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি।"

"আয় আল্লাহ্! মুহম্মদ বিন কাসিম ভারতের মাটিতে ইসলামের যে চেরাগ জ্বালিয়েছিলেন তা আজ নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি নিজের রক্ত দিয়ে বিন কাসিমের জ্বালানো প্রদীপ প্রত্যুজ্জ্বল করতে চাচ্ছি। আপনি আমাকে আপনার পথে কবুল করুন, আমাকে কামিয়াব করুন!"

মাহমূদ নিজের সিপাহসালার, কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের ডেকে বললেন, "দৃশ্যত দু'ভাই আজ পরস্পরের শত্রু। একে অন্যের রক্তপিপাসু। বিষয়টা মূলত এমন নয়। প্রত্যেক সিপাহীর হৃদয়ে একথা গেঁথে নাও, তোমরা কোন ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছো না, ইসলাম ও জাতির বেঈমান-বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছো। প্রতিপক্ষে তোমাদের ভাই-চাচা, মামা-ভাতিজা অনেকেই থাকতে পারে, তোমরা ওদের আক্রমণের আগে বলবে, বদর যুদ্ধে আপন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে চাচা ভাতিজার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছে। সেই লড়াইয়ে সত্যের পক্ষে ছিলেন আমাদের নবীজী (সা.)। আর মিথ্যার পক্ষে ছিল আবু জাহেল বাহিনী। সেদিন মাত্র তিনশ' তেরো জন মুজাহিদ এক হাজার কাফির সেনাকে পরাজিত করেছিল। আজ তোমরা সত্যের পক্ষে আর ওরা মিথ্যার পতাকাতলে। আমরা ইসলামের ঝাণ্ডা কুফরীস্থান পর্যন্ত উড়াতে চাচ্ছি। ওরা চাচ্ছে ইসলামের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে বিজয়ের ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত করতে। ইসলামের জন্যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যে রাসূল (সা.) আত্মীয়তা পরিহার করে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বীরদর্পে তাঁর কমান্ডে সামনে এগিয়ে গেছেন। ফলে আজ আমরা আল্লাহর নাম নিতে পারছি, নিজেদের মুসলিম হিসেবে ভাগ্যবান ভাবতে পারছি। সংখ্যাধিক্য ও আসবাবের ঘাটতি সত্ত্বেও সত্যাশ্রয়ীরা চিরদিন বিজয়ী হয়েছে, আজও আমরাই জয়ী হব-ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পূর্ণ করবেন অবশ্যই।"

মাহমূদ কমান্ডারদের বললেন, 'তোমরা অধীনস্ত প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে এ ঈমানী শক্তি উজ্জীবিত কর। সাহসে ভরে দাও তাদের হৃদয়-বুক।'

মাহমূদ সেনাপতিকে ও কমান্ডারদের যুদ্ধ কৌশল বলে দিয়ে নিবৃত্ত হলেন। সেনা স্বল্পতা তাকে পেরেশান করছিল। এতো অল্পসংখ্যক সৈনিক নিয়ে সম্মুখ

যুদ্ধে পেরে ওঠা মুশকিল। তাই তিনি নতুন রণকৌশলের উপর মনোযোগী হলেন।

তিনি একটি উঁচু ভূমিতে দাঁড়িয়ে ইসমাঈলের সেনাবাহিনীর দিকে তাকালেন। বুকের মধ্যে অনুভূত হলো হাতুড়ির-আঘাত। ইসমাঈলের বিশাল বাহিনী রণসাজে সজ্জিত। প্রায় শ' তিনেক হবে তার জঙ্গী হাতি। হাতির শূড়গুলো লোহার খোলে ঢাকা। এই হাতিগুলো রাজা জয়পালকে পরাজিত করে তার আব্বা লাভ করেছিলেন। সবগুলো ছিল গজনীতে।

রাজা জয়পাল যখন ইসমাঈলের চেয়েও বিশাল বাহিনী নিয়ে সুবক্তগীনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তখন তার বাহিনীতে এমন জঙ্গী হাতির সংখ্যা হাজারেরও বেশি ছিল। কিন্তু মাহমূদ সেদিন সেই বিশাল বাহিনী কিংবা হাতিবহর দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। কারণ, সেই বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার নৈতিক শক্তি ছিল অত্যুচ্চ, মনোবল ছিল আকাশচুম্বি, আল্লাহর বিশেষ রহমতের আশা ছিল। কিন্তু আজ নিজ ভাই ও জাতির বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হচ্ছে। দুঃখে ও যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল মাহমূদের হৃদয়। ইসমাঈলের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠল মাহমূদের মন। এরাতো তার শত্রু নয়। তাঁরই পিতার সযত্নে গড়া সৈনিক দল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যাদের কাছে মাহমূদ ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় ও ভবিষ্যতের কাণ্ডারী- ভাইয়ের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতার লোভ আর কুচক্রীদের প্ররোচনায় তারাই আজ মাহমূদের বিরুদ্ধে উদ্যত খড়গ হাতে দণ্ডায়মান।

মাহমূদ আশঙ্কা করছিলেন, এরা তো তার মরহুম পিতার যুদ্ধ চাল সম্পর্কে অবগত। এরা যুদ্ধের ময়দানে মরতে ও মারতে অভ্যস্ত। এরা মাহমূদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত। আজ এরাই তার প্রতিপক্ষ। শুধুমাত্র বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেয়ার কারণে এরা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ করতে। অবশ্য মাহমূদ মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন, তিনি দেখলেন, আজ এদের মধ্যে পূর্বের জাতিত্ববোধ ও কওমী মর্যাদার উত্তাপ নেই, এরা এখন টাকায় বিক্রিত। আগের মনোবল এদের অন্তর থেকে দূরীভূত। কিন্তু মাহমূদের সৈন্য-স্বল্পতা এতই প্রকট যে, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ও আশা নিজ সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই উবে গেল। হতাশা তাঁকে গ্রাস করতে চাইল। তবুও তিনি দমলেন না।

সৈন্যদেরকে চারভাগে ভাগ করলেন মাহমূদ। বেশি সংখ্যক নিজের কমান্ডে রিজার্ভ রাখলেন। দু' অংশকে দু' প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন এবং চতুর্থ অংশকে শত্রু সেনাদের মুখোমুখি দাঁড় করালেন।

তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, গেরিলা আক্রমণের কৌশল-ই এ যুদ্ধে তাকে প্রয়োগ করতে হবে। মুখোমুখি যুদ্ধ করার জন্যে ন্যূনতম সেনাবল তাঁর নেই। তিনি কমান্ডারদের বলে দিলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে তোমরা দুশমনকে তোমাদের দিকে অগ্রসর হতে আকৃষ্ট করে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে ইসমাঈলের সৈন্যরা ব্যূহ ভেঙ্গে সামনে এগিয়ে আসে।

জায়গাটিতে ছোট ছোট টিলা ছিল অনেক। মাহমূদ এগুলোর সুবিধা নিতে চাচ্ছিলেন। এজন্যই তিনি কমান্ডারদের বললেন, তোমরা প্রতিপক্ষের সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে টিলাগুলোর আড়ালে চলে যাবে, যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে টিলা আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। যেন ওরা টিলার প্রান্ত ঘুরে তোমাদের দিকে ধাবিত হয়।

রাতের গুপ্ত হামলার সুযোগ এক্ষেত্রে নেই। এ কাজে উভয় বাহিনী সিদ্ধহস্ত। রাতের আক্রমণ প্রতি আক্রমণের কৌশল তাদের সবার জানা আছে। এজন্য উভয় বাহিনী তাঁবুর ভিতরে-বাইরে বহু দূর পর্যন্ত বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে কারো পক্ষে রাত্রিকালীন আক্রমণের খুব বেশি সুযোগ নেই।

মাহমূদ তাঁবু থেকে বের হবেন, ঠিক এ সময় তাঁর মা সামনে এসে দাঁড়ালেন। মা'কে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন মাহমূদ। পায়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, "মা! আব্বুর আত্মা আমাকে অভিশাপ দেবে না তো? আব্বুর ইন্তেকালের পর আমি জীবনের প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি। আব্বুকে ছাড়া এটাই আমার প্রথম যুদ্ধ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমার প্রথম এই যুদ্ধটি আমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে করতে বাধ্য। মা! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি কখনও এ যুদ্ধে জড়াতে চাইনি। কারণ, হয়ত ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাকে বলবে, সুবক্তগীনপুত্র মাহমূদ ক্ষমতার জন্যে ভাইয়ের মোকাবেলায় লড়াই করে নিহত হয়েছিল।"

"বেটা! এখন এসব বাজে চিন্তা করো না। রক্ত দূষিত হয়ে গেলে দৃষ্টিও দূষিত হয়ে যায়। তোমার ভাইয়ের রক্তে ক্ষমতা ও ভোগবাদের নেশা। এখন এসব নিয়ে ভেবো না। মাথা থেকে এসব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দাও। যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি তা-ই কর। গত রাত আমি আল্লাহর দরবারে সেজদায় কাটিয়েছি। যাও বেটা! আমি তোমাকে দুআ দিচ্ছি। মায়ের দু'আয় তুমিই বিজয়ী হবে–ইনশাআল্লাহ।"

ইসমাঈল বিপুল সৈন্য সম্ভারে গর্বিত এবং বেপরোয়া ছিল। সে আগ বেড়ে আক্রমণের হুকুম দিল। মাহমূদের নির্দেশ মতো তীরন্দাজরা তীর বৃষ্টি বর্ষণ

করতে লাগল হাতির দিকে! প্রতিপক্ষের বেশি দম্ভ ছিল হাতি নিয়ে। হাতি যখন মাহমূদ বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর ও বর্শার আঘাতে আহত হতে লাগলো তখন যুদ্ধের ধারা বদলে গেল। ইসমাঈলের সৈন্যদের আহত ও ভীত হাতির ভয়াবহ পদদলনের বাস্তব ধারণা ছিল না। আহত হাতি চিৎকার দিয়ে নিজ বাহিনীর জন্যে বিপদ ডেকে আনল। আহত হাতির দিগ্বিদিক ছোটাছুটিতে অশ্ববাহিনীর ঘোড়াগুলোও বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি শুরু করল।

মাহমূদ উঁচু টিলা থেকে দেখছিলেন, তাঁর নির্দেশনামতো সৈনিকেরা অধিকাংশ হাতি আহত করে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। তবুও ইসমাঈল বাহিনীর অগ্রযাত্রা ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না। তারা হাতির উপর নির্ভর না করে অগ্রাভিযান আরো তীব্র করল। মাহমূদের নির্দেশমতো তার সৈনিকেরাও এক জায়গায় স্থির না থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। তবুও শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাদের অবস্থান ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছিল। মাহমূদ দেখছিলেন, তার সৈনিকদের পশ্চাদপসারণ ছাড়া উপায় নেই। দৃশ্যত মাহমূদের পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা আর সম্ভব নয়।

ইত্যবসরে ইসমাঈল মাহমূদকে জীবিত গ্রেফতার করতে তার বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। এ ঘোষণায় উভয় পক্ষে 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি উচ্চকিত হয়। একই পতাকা বহন করছিল উভয় দল। মাহমূদ বাহিনীর তাকবীর ধ্বনি ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছিল। ঘোরতর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উভয় পক্ষ। দ্রুত লাশের স্তূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মাহমূদকে জীবিত কয়েদ করার জন্যে কমান্ডারদের নির্দেশ দিল ইসমাঈল। উভয় বাহিনী মরণপণ আক্রমণ প্রতিআক্রমণ চালাল। নারায়ে তাকবীরের আওয়াজ আর অস্ত্রের ঝনঝনানিতে ময়দান কেঁপে উঠছে। একই পতাকা উভয় বাহিনীর হাতে। ঝাণ্ডাবরদারদের পোশাক আর অস্ত্র ও সাজসজ্জার ব্যবধান ছাড়া চেনার উপায় ছিল না। প্রতিপক্ষকে মাহমূদ-বাহিনীর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নকরণের চালও কোনই কাজ দিল না। মাহমূদের মুষ্টিমেয় সৈন্য একই জায়গায় জমা হয়ে প্রতিরোধ করছিল।

ইসমাঈলের সৈন্যরা তখন লড়ছিল তাদের আভিজাত্য বজায় রাখতে এবং বিজয়ের জন্যে। আর মাহমূদ-বাহিনী লড়ছে নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে প্রাণ বাঁচাতে। লাশের পর লাশ পড়ে ময়দান ভরে উঠেছে। যুদ্ধের তীব্রতা তখন তুঙ্গে। মাহমূদ দেখছিলেন, তার বাহিনী দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

নিজের সৈন্যদের বাঁচানোর তাকিদে মাহমূদ ইসমাঈল বাহিনীর উভয় বাহুতে আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিলেন। বললেন, আক্রমণ করেই তারা যেন আরো ডানে এবং বামে সরে আসে। এ চাল কিছুটা ফলপ্রসূ হলো। ইসমাঈল বাহিনী ডান ও বামদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাহমূদের কথামতো তার দু' বাহুর সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ করে আবার ডানে-বামে সরে যেতো। এবার মাহমূদ তাঁর মুখোমুখি লড়াইরত সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন তোমরা পিছনের দিকে সরতে থাক। পশ্চাদপসারণ করতে গিয়ে মাহমূদ বাহিনীর বহু সদস্য হতাহত হলো। কিন্তু তারপরও প্রায় বেষ্টনির মধ্যে পড়ে যাওয়া সৈন্যদের অধিকাংশই পিছনে চলে আসতে সক্ষম হল।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে আকাশ রাঙিয়ে বিদায় নিচ্ছে আজকের সূর্য। মাহমূদ দেখতে পেলেন, প্রতিপক্ষের সৈন্যবাহিনীর প্রায় মাঝখানে হাতির উপরে রাজকীয় আসনে উপবেশন করে ইসমাঈল কমান্ড দিচ্ছে। মাহমূদ আরো দেখলেন, ইসমাঈলের সৈন্যরা বিক্ষিপ্তভাবে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি প্রথমে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সন্ধ্যার আগেই যুদ্ধের পরিণতি টানার সংকল্প করলেন। তীরন্দাজ সৈন্যদেরকে টিলাগুলোর শীর্ষে অবস্থান নিতে এবং তার নিরাপত্তারক্ষীদের আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। সমরবিশারদদের দৃষ্টিতে মাহমূদের এ সিদ্ধান্ত চরম আত্মঘাতী ছিল।

নিজের জীবন ও অবশিষ্ট সৈন্যদের প্রাণঘাতী ফয়সালা নিলেন মাহমূদ। মাহমূদের রক্ষীদল ছিল অক্লান্ত। এখনো তাদের মোকাবেলায় নামানো হয়নি। এবার তারা দুশমনের মধ্যভাগে বিজলীর তীব্রতা নিয়ে আক্রমণ শানাল। মাহমূদ নিজেই তাদের কমান্ড দিচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল বেশি এবং তারা তখনও ছিল রিজার্ভ। তিনি তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা টিলার উপরে অবস্থান নাও এবং তোমাদের আয়ত্তের ভিতরে শত্রু পৌঁছামাত্রই ওদের নিশানা বানাও। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মাহমূদের রক্ষী বাহিনীর মোকাবেলায় ইসমাঈলের কোন রিজার্ভ ফোর্স ছিল না। এদের সব সৈন্য সারা দিনের রণক্লান্ত। মাহমূদের তাজাদম সৈন্যরা তাঁর নির্দেশমতো "বুতপূজারীদের মিত্র সৈন্যদের পিষে ফেলো" ধ্বনি তুলে সিংহের গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাহমূদের এই হামলা ছিল ইসমাঈল বাহিনীর ধারণাতীত। তাছাড়া 'বুতপূজারী মিত্রদের পিষে ফেল' শ্লোগানে ইসমাঈল বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। আত্মদুর্বলতা তাদের গ্রাস করে নিল। বাহিনীর সেনারা উচ্চধ্বনিতে আরো

বলছিল, "আল্লাহর সৈনিকেরা ভাতার জন্যে যুদ্ধ করে না, ইসলামের জন্যে জিহাদ করে তাঁরা"। ইসমাঈলের কমান্ডাররা মধ্যভাগকে বাঁচানোর জন্যে বাহুর সাহায্য চাইল। কিন্তু মাহমূদের সৈন্যরা 'হামলা কর এবং পালিয়ে যাও' কৌশল অবলম্বন করে প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। যার ফলে ইসমাঈল বাহিনীর মধ্যভাগের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা তার বাহুর সৈন্যদের জন্যে সম্ভব হলো না।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, মাহমূদ গযনবী সে দিন এক প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন। তিনি যখন প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে হামলা করেছিলেন, তখন শত্রু-সৈন্যদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিলো। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শত্রু-বাহিনীর সৈন্যরা মাহমূদের মোকাবেলা থেকে জীবন বাঁচানোর জন্যে পিছু হটতে তৎপর হয়ে উঠলো। ইসমাঈলের রক্ষণভাগের ওপর আক্রমণে মাহমূদ এতই বেপরোয়া ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, বিশাল বাহিনীটাকে তিনি একাই যেন কচুকাটা করে ছাড়বেন। তিনি নিজেই নিজের পরিণতি ভুলে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন। তাঁর জীবনপণ লড়াই দেখে তাঁর সৈন্যরাও জীবনের শেষ যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় আখেরী হামলা চালায়। মুহূর্তের মধ্যে ময়দানের চিত্র পাল্টে যায়।

তখনও পশ্চিমাকাশে ক্ষীণ সূর্যরশ্মি দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসতে এখনো সামান্য দেরী আছে। ময়দানে ইসমাঈল বাহিনীর দাপট কমে গেছে। ইসমাঈল-বাহিনীর রক্ষণভাগের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তছনছ হয়ে গেছে। ইসমাঈল-বাহিনীর সৈন্যদের শৃঙ্খলা ও কমান্ড এলোমেলো হয়ে গেছে। অধিকাংশ সিপাহী কমান্ডার নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় টিলার দিকে দৌড়ে পালাতে শুরু করে। টিলার উপরে পূর্ব থেকে অবস্থান নেয়া মাহমূদের তীরন্দাজ বাহিনীর দুশমনদের জন্যে আশ্রয়ের পরিবর্তে মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দিল। শত্রুবাহিনী টিলার দিকে অগ্রসর হতেই মাহমূদের তীরন্দাজরা তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। অবস্থা বেগতিক দেখে ইসমাঈল বাহিনীর রক্ষণভাগের এক কমান্ডার হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করে।

মাহমূদ কয়েকজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দিলেন, "তোমরা গোটা ময়দানে প্রচার করে দাও, ইসমাঈল-বাহিনীর আর কোন সৈনিককে যেন হত্যা না করা হয়। ওরা যদি যুদ্ধ করে কিংবা সারেন্ডার করতে অস্বীকার করে তবে-ই তাদের কয়েদ কর। আর যারা বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের অস্ত্র নিয়ে ছেড়ে দাও।" মাহমূদের এই ঘোষণা শুনে ইসমাঈল-বাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের যুদ্ধের শেষ

শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। শত্রুবাহিনীর যে কমান্ডার প্রথমে হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল তার কাছে মাহমূদ জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল এখন কোথায়? কমান্ডার বলল, সে নিহতও হয়নি আহতও হয়নি।

আপনার আক্রমণের তীব্রতায় ভীত হয়ে সৈন্যদের কিছু না বলেই হয়ত পালিয়ে গেছে। কমান্ডার ইসমাঈলের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য দিকও বলে দিল। মাহমূদ কয়েকজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ইসমাঈলকে খুঁজে বের কর এবং নৈতিক অপরাধীর মতো ওকে নজরবন্দী করে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

রাতের ঘন আঁধার ঘনিয়ে আসার আগে ভ্রাতৃঘাতী এই গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। ইসমাঈলের বাহিনী বন্দী অবস্থায় সারি বেঁধে বসে থাকল আর মাহমূদের সৈন্যরা তাদের পাহারা দিচ্ছিল। রাত বাড়ার সাথে সাথে আহত সৈন্যদের আহাজারি, চিৎকার আর রোদন বাড়তে থাকল। ক্ষত-বিক্ষত ঘোড়া, জখমী হাতি আর হাত-পা কাটা সৈন্যদের আর্ত চিৎকারে রাতের ময়দান বিভীষিকাময় হয়ে উঠল। মাহমূদ নির্দেশ দিলেন, উভয় দলের আহত সৈন্যদের তাঁবুতে এনে চিকিৎসা করো। শত্রু-মিত্র বিচার না করে সবার ক্ষতস্থানে যথাসম্ভব পট্টির ব্যবস্থা করো।

মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হল চতুর্দিকে। সেবক দল ময়দান থেকে খুঁজে আহতদের চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। মাহমূদ ময়দান জুড়ে লাশ আর আহতদের মধ্যে টহল দিচ্ছিলেন। পরিচিত কমান্ডার ও সিপাহীদের লাশ দেখে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। এমন সময় দূর থেকে একটি মেয়েলী কণ্ঠে ভেসে এলো— মাহমূদ! মাহমূদ!

পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনে মাহমূদ সে দিকে দৌড়ে গেলেন। তার পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে চুমু দিলেন। মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ কারো মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না।

যুদ্ধের ভয়াবহতা ও আশাতীত সাফল্যে মা ও ছেলে উভয়ে ছিলেন আবেগাপ্লুত, আত্মহারা কিন্তু বেদনাক্লান্ত। অনেকক্ষণ পর মা'কে তাঁবুতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে মাহমূদ ময়দানে-ই টহল দিতে লাগলেন। প্রতিটি শবদেহের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতেন, মশালের আলোতে গভীরভাবে তাকে দেখে নিতেন। এভাবে প্রতিটি শবদেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন পরখ করছিলেন মাহমূদ। হঠাৎ তার মায়ের মতোই এক মেয়েলী কণ্ঠের ডাক তার কানে এলো-মাহমূদ! তিনি দাঁড়ালেন। দুই মশালবাহীর মধ্যদিয়ে শাহী পোশাক

পরিহিতা এক মহিলা আরোহীকে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখলেন। চেহারা, পরিচ্ছদ আর ঠাঁটবাটে রাজকীয় ভাবসাব। মহিলা আর কেউ নয়, মাহমূদের বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী, ইসমাঈলের মা। মাহমূদ তাকে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ইসমাঈলের মা তার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

আপনি কি এসব দেখতে এসেছেন— আপনার ছেলে আব্বার রেখে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে কতোজনকে হত্যা করেছে? আপনি কি কানে শোনেন? ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত সৈন্যদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছেন? কেন এসেছেন আপনি? কি চাই আপনার? ক্ষুব্ধকণ্ঠে ইমাঈলের মায়ের প্রতি প্রশ্ন করলেন মাহমূদ।

'আমি কোন কিছু দেখতে আসিনি, কোন কিছু শোনার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি এসেছি আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইতে।'

'কোথায় আপনার ছেলে? আমি তো ওকে এখনও দেখিইনি।"

'সে তার তাঁবুতে আছে, তার পালিয়ে যাওয়ার সকল পথ তোমার সিপাহীরা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যেরা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।"

"ওরাও কি ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে, যাদেরকে যোগ্যতা বিচার না করেই শুধু তোষামোদির কারণে আপনার ছেলে কমান্ডার থেকে সালার বানিয়ে দিয়েছিল? ওই কাফিরেরাও ওকে একা ফেলে চলে গেছে যাদেরকে সে উজীর আমীরের পদে আসীন করেছিল'? 'জিল্লে এলাহী', আর 'সুলতানে আলী' লকব গ্রহণ করা যত সহজ জিল্লে এলাহী আর সুলতানে আলীর মর্যাদা রক্ষা করা অতো সহজ নয়।" বললেন মাহমূদ।

ইসমাঈলের মা বলল, 'মাহমূদ! তুমি যা ইচ্ছে তা বলতে পার, কিন্তু আমাকে বল, আমি আমার একমাত্র ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইতে এসেছি, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছ কি?'

"আপনি যদি আজ আমার স্থানে হতেন তাহলে যার কারণে এতোগুলো প্রাণ বধ হলো তার বিচার আপনি কী করতেন? আপনি পারতেন, এতগুলো নিরপরাধ মানুষের খুনীকে ক্ষমা করতে?" মাহমূদ বললেন, 'আপনার মর্যাদা আর অবস্থানের কথা একটু ভেবে দেখুন! নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, যাদের তাজা রক্তে আপনার পা ডুবে গেছে, যাদের তপ্ত খুনের ছিটায় আপনার কাপড় রক্তিম হয়ে গেছে, তারা কারা? আপনি এক মর্যাদাবান ন্যায়পরায়ণ সুলতানের বিধবা। রাণী হোক কিংবা সাধারণ মহিলা হোক বৈধব্য সবার-ই জন্যে সমান

কষ্টদায়ক। সুলতানের বিবি হোক বা বিধবা হোক কওমের প্রতিটি নাগরিক তার কাছে নিজ সন্তানের মত। যেসব সিপাহীর লাশ মাড়িয়ে আপনি নিজ সন্তানের জীবন ভিক্ষা চাইতে আমার কাছে এসেছেন, যার কারণে এই রক্ত ঝরল, তার কী শাস্তি হতে পারে বলুন? এমন অপরাধীর পক্ষে কোন্ মুখে আপনি ক্ষমা চাইতে এসেছেন বলুন? এমন জিঘাংসু, জঘন্য কোন মানুষের বেঁচে থাকার কি অধিকার আছে? আপনার ছেলে এখন শত শত মানুষ হত্যার অপরাধী, সে খুনী।'

'মাহমূদ! দুর্ভাগ্য আমি তোমার মতো যোগ্য সন্তানের মা হতে পারিনি, কিন্তু আমি তোমার মরহুম পিতারই স্ত্রী। তোমার পিতার রুহের মর্যাদার দোহাই দিয়ে বলছি, আমার ছেলের প্রাণভিক্ষা দাও। আমি ছেলেকে নিয়ে তোমার রাজ্য ছেড়ে দূর দেশে চলে যাব। আমার এই শেষ আবেদনটি তুমি কবুল কর। তোমার পিতা আমাকে অতটুকুই স্নেহ করতেন যতটুকু স্নেহ তোমার মা'কে করতেন'। বলল ইসমাঈলের মা।

'মৃত্যুপথযাত্রী পিতার স্নেহের মূল্য আপনি দিয়েছেন আপনার অযোগ্য ছেলের নামে সালতানাতের বাদশাহী লিখিয়ে নিয়ে, তাই না? আর আজ আপনার সেই ছেলে সালতানাতকে ধ্বংস করে ছাড়ল। আপনি কি সে সব মায়ের মতো অধিকার রাখেন যারা নিজেদের তরুণ ছেলেদের রণসাজে সজ্জিত করে আমার মরহুম পিতার ইসলামী পতাকাতলে জিহাদের জন্যে বিদায় জানাতেন? আপনি কি আমার বিধবা মায়ের মতো একমাত্র ছেলেকে বাবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ময়দানে মৃত্যুর মুখোমুখি কওমের জন্যে জীবনবাজি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন? আপনি কি দাবী করতে পারেন তাঁর মতো অধিকার? আপনি আপনার অযোগ্য ছেলেকে মসনদে বসিয়েছেন সিংহাসনের মজা লুটতে, নিজে রাজমাতা হয়ে বিলাসিতা চরিতার্থ করতে। আপনি আপনার ছেলেকে পরিণত করেছেন সালতানাতের ধ্বংসকারী রূপে, সম্ভাবনাময় একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করে অগণিত মানুষের জীবন সংহার করতে। আপনার ছেলে খুনী, বিশ্বাসঘাতক! আর আপনি হলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রণাদায়ী, কুচক্রী'।

মাহমূদ তার পাশে দাঁড়ানো দু'জন সৈন্যকে বললেন, 'যাও! এই মহিলার সাথে গিয়ে তার ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'।

ইসমাঈল তার তাঁবুতে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট। তাঁবুতে দু' সিপাহীকে ঢুকতে দেখে সে কেঁপে উঠল। সে থতমত খেয়ে সিপাহীদের অনুরোধ করল, "তোমরা আমাকে পালানোর ব্যবস্থা করে দাও! আমি তোমাদের যা চাও তাই পুরস্কার দেবো!"

কমান্ডার সিপাহীকে বললেন, 'ওকে সুলতানের কাছে নিয়ে চল। এর ফয়সালা করবেন সুলতান।' অগত্যা ইসমাঈল নিজেই সিপাহীদের সাথে রওয়ানা হল। তার মা ইসমাঈলের পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

ইসমাঈলকে যখন মাহমূদের সামনে এনে দাঁড় করানো হল, মাহমূদ তীর্যক দৃষ্টিতে একবার তার আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'তোমার মা আমার কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চেয়েছে, আমি তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম, তোমাকে জীবিত রাখা হবে।'

ঐতিহাসিক কাসিম ফেরেশতা এ প্রেক্ষিতে লিখেছেন, ইসমাঈল মাহমূদের মুখোমুখি নীত হলে মাহমূদ ইসমাঈলের উদ্দেশে বলেন, 'আজ যদি আমি তোমার নিকট বন্দী হতাম, যদি তুমি বিজয়ী হতে তবে তুমি আমার সাথে কী ব্যবহার করতে'? ইসমাঈল বলল, 'আমি তোমাকে যাবজ্জীবন কয়েদখানায় বন্দী করে রাখতাম। তবে স্বাভাবিক জীবনের সব উপকরণের ব্যবস্থা করে দিতাম।'

'ঠিক আছে, আমিও তোমার সাথে এর চেয়ে খারাপ আচরণ করব না। তুমি যাবজ্জীবন বন্দী হিসেবে থাকবে এবং জীবনযাপনের সব কিছুই সাধারণ মানুষের মতই পাবে। ইচ্ছে করলে তোমার মাকেও সাথে নিয়ে যেতে পার।'

ইসমাঈল সারা জীবনের জন্যে মাকে নিয়ে জুরজান কয়েদখানায় বন্দী জীবন গ্রহণ করল। তাকে এর চেয়ে বেশি শাস্তি সুলতান মাহমূদ দিলেন না। অথচ ইসমাঈল বিজয়ী হলে মাহমূদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। সুলতান মাহমূদ এই বিজয়ের মাধ্যমে এক আত্মঘাতী লড়াই থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। সালতানাতের ক্ষতিকারী সবচেয়ে বড় ক্রীড়নকের অবসান ঘটল। কঠিন এক আপদকে সামনে চলার পথ থেকে অপসারণ করতে সক্ষম হলেন মাহমূদ।

সুলতান মাহমূদ যখন ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে উপনীত আর গজনীতে প্রশিক্ষিত ও চৌকস বহু সৈন্য হতাহতের ঘটনা ঘটল তখন লাহোরে রাজা জয়পালের কাছে খবর পৌঁছে, সুলতান সুবক্তগীনের মৃত্যু হয়েছে। জয়পাল তার জেনারেলদের ডেকে সুসংবাদ দেন, 'আমার সবচেয়ে বড় শত্রু সুলতান সুবক্তগীন আজ দুনিয়া থেকে তিরোহিত। এখন আমরা সহজেই গজনী জয় করতে পারব। আমাদের বাহিনী হামলার জন্যে তৈরি আছে তো?' জয়পাল জেনারেলদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে বললেন।

আগের মতো তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না মহারাজ। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এক ব্যক্তির মৃত্যু হলেও গজনীর কওম মরে যায়নি। বলল এক জেনারেল। গজনীর সৈন্যদের মধ্যে যে দেশ ও জাতিপ্রেম রয়েছে তা এক

সুলতানের মৃত্যুতে মরে যাবে না। আমাদের সৈন্যরা অভিযানের জন্যে প্রস্তুত ঠিকই কিন্তু এদের মধ্যে এখনও মুসলমানদের মতো মৃত্যুপণ লড়াইয়ের প্রেরণা সৃষ্টি হয়নি। সৈন্যদের মধ্যে আমরা ধর্মীয় আবেগ ও জাতীয়তাবোধ জাগানোর চেষ্টা করছি। মন্দিরে মন্দিরে পণ্ডিত– পুরোহিতরা সাধারণ প্রজাদের মনে এই চেতনা জাগাতে চেষ্টা করছেন যে, "মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ লড়াই দেবদেবীর ইজ্জত রক্ষার লড়াই, আমাদের ধর্ম-অর্চনা টিকিয়ে রাখার লড়াই। এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে।"

সুবক্তগীনের ছেলে মাহমূদ এখন যুবক। বলল এক জেনারেল। তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারব না, সে দেশের সেনাবাহিনীর কমান্ড সামলাতে পারবে কি না। তবে দুটি যুদ্ধে আমি তার মধ্যে যে বীর বীর্য দেখেছি তাতে বাপ মারা যাওয়ার পরও সে শক্ত হাতে দেশের হাল ধরতে সক্ষম হবে। ছেলের যোগ্যতা অনেক সময় বাপকেও ছাড়িয়ে যায়।

এখানে থেকেই আমি এ সব বিষয়ে খবর নিতে পারব। বলল রাজা জয়পাল। তোমরা জান যে, আমার কাছে গজনীর দুই সেনা কর্মকর্তা বন্দী রয়েছে। আমি এদের কাছ থেকে সুবক্তগীন পুত্রের খবর নিয়ে নিব। তোমরা সৈন্যদেরকে অভিযানের জন্যে তৈরি কর। আমি খুব শীঘ্রই গজনী রওয়ানা করতে চাই। সুবক্তগীনের কোন ছেলেরই তার মতো যোগ্য সেনানায়ক ও কৌশলী যোদ্ধা হওয়ার কথা নয়। আমি আশা করি, অতীতের দু' পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে এবার আমরা গজনী দখল করতে সক্ষম হব। এক কুমারী বলিদানের ব্যবস্থাও আমি করেছি। পণ্ডিতেরা ইতোমধ্যে কুমারী সংগ্রহ করেছে। বিশেষ ব্যবস্থায় কুমারীকে তৈরি করার পরই তাকে বলি দেওয়া হবে।

রাজা জয়পাল নেজাম ও কাসেম বলখীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিল। কাসেম ও নেজাম তাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল এই বলে যে, তারা গজনীর সুলতানের বিজয়ের নেপথ্য কারণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করবে। রাজা জয়পাল মুসলিম সৈন্যদের বিজয়ের রহস্য উদঘাটনের লোভে বন্দী গজনী সৈন্য কর্মকর্তাদেরকে রাজমহলের পাশেই একটি সুরক্ষিত কক্ষে নজরবন্দী করে রেখেছিল এবং একজন মুসলিম কর্মচারীকে নিয়োগ করেছিল তাদের আহার সরবরাহ করার জন্য। এই আহার সরবরাহকারী রাজকর্মচারী ছিল গজনীর সুলতানের নিয়োগকৃত গোয়েন্দা। মায়াবী চেহারা, সৎস্বভাব আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই যুবক নিজের নাম পরিচয় গোপন রেখে দক্ষতার সাথে তার গুরুদায়িত্ব পালন করছিল। জয়পালের রাজ্যের কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হয়নি যে,

রাজপ্রাসাদেই রয়েছে গজনীর চর। কয়েদীদের কক্ষের বাইরে সশস্ত্র প্রহরী সদা দণ্ডায়মান থাকতো। রাজা জয়পাল দু'বার পরাজিত হয়ে গজনী দখলের জন্যে এতই ক্ষিপ্ত ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, এই দু' বন্দীর প্রতি বহুদিন দৃষ্টি দেয়ার সময়ই পায়নি। রণপ্রস্তুতি ও নতুন সৈন্য রিক্রুটের ব্যস্ততায় আর গজনী দখলের উন্মাদনায় রাজা গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজও ভুলে গিয়েছিল।

বন্দীদের আহার সরবরাহকারী মুসলিম রাজ কর্মচারী তাদের বলেছিল, তোমরা রাজাকে কৌশলী কথা বলে ধোঁকায় ফেলবে। গজনী বাহিনীর বিজয়ের সঠিক রহস্য যে কোন মূল্যে গোপন রাখবে। রাজাকে ধোঁকায় না ফেললে তোমাদেরকে কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবে। বালাজুরীর উদ্দেশ্য ছিল, এরা যদি কৌশলী কথায় রাজাকে আশ্বস্ত ও বিভ্রান্ত করতে পারে, তবে এরা যেমন কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাবে, জেলখানার যন্ত্রণা থেকেও রক্ষা পাবে। ফলে এদের মুক্তির ব্যবস্থা করার চিন্তা করা যাবে। অপর দিকে রাজা পেশোয়ার না ভিন্ন কোন পথ দিয়ে গজনী আক্রমণ করবে তাও জানা সম্ভব হবে। যেটা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

"রাজা যদি তোমাদের ডাকে তবে তোমরা তাকে আশ্বস্ত এবং বিভ্রান্ত করবে।" ইমরান বালাজুরী বন্দীদেরকে বলে দিল, আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে এখান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। এজন্যে তোমরা তৈরি থেকো। হতে পারে এজন্যে আমাকে এখান থেকে গায়েব হয়ে যেতে হবে।

"তুমি কোথায় যাবে?"

সালতানাতের পক্ষ থেকে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে তাও আমাকে পালন করতে হবে। সেই সাথে ব্যক্তি হিসেবে আমার মধ্যে যেহেতু মানবিকতাবোধ রয়েছে সেহেতু আমি নিজ কাঁধে একটি দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছি সেটিও পালন করতে হবে। তোমাদের সাথে এখন আর কোন কথা লুকানোর নেই। এ ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হতে পারে।

ঘটনা হলো, জয়পাল দু'বার পরাজিত হওয়ার পর পণ্ডিতেরা তাকে দেবতা রুষ্ট হয়েছে বলে বোঝাতে সক্ষম হয় এবং বলে, দেবতার অসন্তুষ্টি থেকে তাকে বাঁচতে হলে এক নির্মলা চরিত্রের কুমারীকে বলি দিতে হবে। তাহলে দেবতা খুশি হবে এবং রাজা বিজয়ী হবে। পৌত্তলিক এই জাতিটা জঘণ্য স্বভাবের। কোন স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রীকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ করতে হয়। এই হলো এদের শাস্ত্রীয় বিধান। এরা দেব-দেবীকে খুশি করতে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ বলি দিতে পারে। বলছিলাম, বিজয় লাভ ও দেবতাকে খুশি করার

জন্যে পণ্ডিতরা এক কুমারী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বিশেষভাবে এই কুমারীকে বলিদানের জন্যে প্রস্তুত করে কিছুদিন পর বলিদান করা হবে। এই মেয়েটিকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে।

'এ কুমারীকে বাঁচালে আমাদের ফায়দা কি? বেঈমান কাফের-মুশরিকরা স্বজাতির সব কুমারীকে বলি দিলেও তাতে আমাদের কি?' বলল নেজাম।

'এই মেয়েটি আমাকে হৃদয় দিলে ভালবাসত এবং সে আমার সাথে আমাদের দেশে যেতেও রাজী ছিল।' বলল ইমরান। সে মুসলমানও হতে চেয়েছিল। আমি অনেক আগেই ওকে নিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু গোয়েন্দাবৃত্তির কঠিন দায়িত্ব আমার প্রবৃত্তি চরিতার্থের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ গুরুদায়িত্ব এড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি রাজা জয়পালের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং তার অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে গজনী যেতে চাচ্ছিলাম। মেয়েটি আমার সাথেই চলে যাবে বলে বায়না ধরেছিল। আর এ সময়ে তোমরা বন্দী হয়ে এলে। তোমাদের ছাড়িয়ে নেয়াও গোয়েন্দা হিসেবে আমার দায়িত্ব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, তোমাদের এখান থেকে বের করে এক সাথেই আমরা চলে যাবো। কিন্তু একদিন খবর পেলাম, মেয়েটিকে মন্দিরের পণ্ডিতেরা বাড়ি থেকে ওদের বিশেষ বলিদান পর্ব পালনের জন্যে তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা আমাকে অপরাধী বল আর জালেম বল— যা ইচ্ছে বলতে পারো, কিন্তু তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা, তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে কোথাও লুকিয়ে রাখবো এবং ক'দিন পরে এক সাথেই আমরা চলে যাবো। দোয়া করো, আমার দায়িত্ব পালনের চেয়ে এই মেয়ের মহব্বত যেন আমার কাছে বড় হয়ে দেখা না দেয়।'

তার অর্থ হলো, তুমি আমাদের মুক্তির দায়িত্ব থেকে তাড়াতাড়ি অবকাশ পেতে চাচ্ছো, তাই না? বলল কাসেম।

"হ্যাঁ, তাই। যত দ্রুত সম্ভব। মেয়েটির জন্যে আমার রাতে ঘুম হয় না। আর মাত্র কয়েক দিন আছে। এরপর নরপশুরা মেয়েটিকে জবাই করে ফেলবে।"

ইমরান বালাজুরী বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা ও তার প্রেমিকাকে পণ্ডিতদের আখড়া থেকে বের করে আনার পরামর্শের দু'দিন পরই রাজা জয়পাল বন্দীদের তলব করল।

"তোমরা কি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে প্রস্তুত? আশা করি তোমরা নিজেদের জীবনের উপর দয়া করবে।" বলল রাজা।

"হ্যাঁ মহারাজ! আপনি আমাদের সাথে যে সৎ ব্যবহার করেছেন, এর প্রতিদানে আপনার যে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত।" বলল কাসেম।

"তোমাদের সুলতান সুবক্তগীন মারা গেছে"। বলল রাজা। আকস্মিক সুলতানের মৃত্যু সংবাদে তারা বিমর্ষ হয়ে গেল। কিন্তু ত্বরিৎ তারা নিজেদের সামলে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

"এখন গজনীকে রক্ষা করার মতো আর কেউ নেই। এখন তোমরা আমার সাথী হলে আমার সেনাবাহিনীতে তোমাদের বড় দায়িত্বও দিতে পারি। তবে তোমরা কি বলতে পার, বাবার অবর্তমানে সুলতানের ছেলে মাহমূদ কি গোটা ফৌজের কমাণ্ড দেয়ার যোগ্যতা রাখে? যুদ্ধ পরিচালনায় সে কতটুকু দক্ষ?"

'সে যুদ্ধে সুলতানের মতো পারদর্শী নয়।' বলল নিজাম। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি চালই চালে। এগুলো যদি আপনাকে বলে দেয়া হয় তাহলে সহজেই আপনি তাকে পরাজিত করতে পারবেন। মাহমূদের কৌশলই ছিল আপনার দ্বিতীয়বার পরাজয়ের কারণ।

এরা দু'জন রাজা জয়পালকে মাহমূদের রণকৌশল সম্পর্কে যা বলল বাস্তবের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। রাজা ওদের কথা শোনার জন্যে জেনারেলদেরও ডেকে আনল। নিজাম ও কাসেম মাহমূদের রণকৌশল জেনারেলদের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল।

কাসেম একটু অগ্রসর হয়ে বলল, আমরা আপনাদের এসব কৌশল হাতে-কলমেও দেখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু বন্দী অবস্থায় হাতে-কলমে তা দেখানো কি সম্ভব?

রাজা জয়পাল তখনি বন্দীদের ঘরের পাশ থেকে পাহারা তুলে নেয়ার নির্দেশ দিল। রাত এলো এবং সকাল হলো। পরের দিন ইমরান তাদের জন্য দিনভর অপেক্ষা করল। বসেই রইল সে। বিকেল বেলা রাজমহল থেকে বন্দীদের ডেকে পাঠাল রাজা। ইমরান বার্তাবাহককে বলল, আমি সকাল থেকে তাদের জন্য খানা নিয়ে বসে আছি, কিন্তু তাদের তো দেখছি না!

আস্‌লে ইমরান নিজেই ওদেরকে ঘর থেকে বের করে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। তাকে কেউ যাতে সন্দেহ না করে কিংবা এর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা জানার জন্যে খাবার পরিবেশনের আড়ালে সে-ই তথ্যই সংগ্রহ করছিল ইমরান।

গজনীর কয়েদী নিজাম ও কাসেমকে ইমরানই কৌশল করে ফেরার করিয়েছে এ সন্দেহ কেউ করেছে বলে মনে হয়নি ইমরানের। এই অপারেশনে

সে সফল হলো বটে কিন্তু ইমরানের প্রেমিকা হিন্দু কুমারীকে পণ্ডিতদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে মুক্ত করার কঠিন কাজটা রয়ে গেল। এমন একটি মেয়ে যে ইমরানের প্রেমে নিজের ধর্ম, দেশ ও জাতিকে ত্যাগ করতেও আগ্রহী, তাকে নিশ্চিত পণ্ডিতদের বলির খড়গাঘাত থেকে রেহাই করা তার জন্যে যেমন জরুরী তেমনই কঠিন।

ইমরান সুদর্শন, পরিপাটি, অমায়িক যুবক। সে নানা রূপ ধারণ করতে পারে এবং সে নানা ঢংয়ে কথা বলতে ওস্তাদ। ভাষাও জানে একাধিক। ওর কথা যাদু মাখা। প্রকৃতপক্ষে ইমরান ছিল সে সব সুপুরুষের মতো আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী বিপরীত লিঙ্গের মানুষ যাদেরকে দেখতে বারবার পিছন ফেরে তাকাতে বাধ্য হয়। ইমরান কোন শাহাজাদা ছিল না বটে, সামান্য এক রাজকর্মচারী। কর্মচারীর পোশাক পরতো, তাদের মতই কথা বলতো, কিন্তু রাজকর্মচারীর আড়ালে সে ছিল গজনীর দক্ষ গোয়েন্দাদের অন্যতম। সে পাঞ্জাবী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো। কখনো কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি যে, এই আত্মপরিচয়হীন লোকটি রাজা জয়পালের জন্যে ভয়ঙ্কর এক বিপদ ডেকে আনতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে সে লাহোর থাকছে। শহরের একটি ঘরে একাকী থাকে। তার প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে জানত, সে রাজমহলের এক বিশেষ কর্মচারী। এছাড়া বেশি কিছু জানতো না। আর জানতো, সে মুলতানের অধিবাসী। অনেক রাত করে সে বাড়ি ফিরতো। তার সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণ হিন্দু জগমোহনের সাথে ছিল তার সখ্য। জগমোহনের বাবা ছিল ব্যবসায়ী।

গভীর রাতেও জগমোহনকে ইমরানের ঘরে আসতে দেখেছে প্রতিবেশীরা। ইমরান-জগমোহনের মতো এমন হিন্দু-মুসলিম বন্ধুত্ব প্রতিবেশীরা দ্বিতীয়টি দেখেনি। এলাকাটি ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সাধারণত হিন্দুরা ঘৃণা করতো। হিন্দু পণ্ডিতেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজাদের মনে ঘৃণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই জগমোহন ইমরানের আচরণে দারুণ মুগ্ধ হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাদের মনে সৃষ্টি হয় এক গভীর হৃদ্যতা। প্রতিদিন দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ না হলে, কথা না হলে পেরেশান হয়ে যায় তারা। জগমোহন রাত দুপুরে এসেও ইমরানের ঘরে হানা দেয়। কখনও সে ইমরানের ঘরে রাত কাটিয়ে সকালে বাড়ি ফেরে।

পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি ঘটনা। একদিন ইমরান জগমোহনের বাড়িতে তাকে খুঁজতে গেল। দেখে, মোহন কাঁদছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস

করলে মোহন বলল, “আজ আমার বড় বোনটিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।”

“কে পুড়িয়ে মারল?” জিজ্ঞেস করল ইমরান।

“আমার ধর্ম!”

বোনটির বিয়ে হয়েছিল এক বছরও হয়নি। ওর স্বামী ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। কিছু দিন রোগে ভুগে আজ মারা গেল। ওর লাশ চিতায় রেখে ওর ভাইয়েরা আমার বোনটিকেও চিতায় দাঁড় করিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তুমি হয়তো চিতা দেখনি ইমরান। চৌকোণা বিশিষ্ট একটি লোহার পাকা ভিটিতে এক মানুষ সমান কাঠখড়ি পরতে পরতে বিছিয়ে দিয়ে মধ্যে শবদেহ রেখে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আমি শবদেহ পোড়ানোর দৃশ্য সহ্যই করতে পারতাম না, কিন্তু আজ আমার বোনকে জীবন্ত দগ্ধ হতে দেখলাম!

হিন্দু মেয়েরা পূত চরিত্রের অধিকারী দাবী করে বলা হয়, মৃত স্বামীর চিতায় জীবিত স্ত্রীকেও জ্বলতে হয়। মৃত স্বামীর চিতায় জীবিত স্ত্রীর মরে যাওয়াকে ‘সতীদাহ’ বলা হয়। কোন মহিলা যদি সহমরণে অনীহা দেখায় তবে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকেও বিরত থাকতে হয়।

হিন্দু ধর্মের লোকেরা মনে করে, স্ত্রী যদি সহমরণ না করে তবে স্বামীর অবর্তমানে মানবিক দুর্বলতার সুযোগে সে যে কোন সময় অসতী হয়ে যেতে পারে। এজন্য মেয়েরাও সহমরণকেই গ্রহণ করে। আমি নিজেও ‘সতীদাহ’ প্রথার পক্ষে ছিলাম, কিন্তু আদরের বোনটিকে জীবন্ত পুড়ে মারতে দেখে এটা মেনে নিতে পারছি না। আমার কাছে এই রীতি জঘন্য এক বর্বরতা। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মহিলা-ই সাগ্রহে স্বামীর চিতায় জ্বলে মরতে চায় না। আমার বোনও চিতায় জ্বলতে চায়নি। তাকে টেনে হেঁচড়ে চিতায় তোলা হয়েছে। তার দু’টো পা রশি দিয়ে চিতার সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, যাতে সে চিতা থেকে পালাতে না পারে। আমাকে বোনটি খুব আদর করতো। কিন্তু আমি বোনটির জীবন রক্ষায় কিছুই করতে পারিনি। প্রায় দেড়-দু’শ লোক চিতার পাশে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তার বাঁচার আকুতি শুনে এগিয়ে যায়নি। এই মানুষগুলো ধর্মের শিকলে বাঁধা এক একটি হিংস্র জীব। চিতার আগুনে যখন কাঠ ও বাঁশগুলো পোড়ার শব্দ হচ্ছিল ক্ষোভে-দুঃখে আমার হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। আমি আমার বোনের চিতার দিকে তাকাতে পারছিলাম না, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম অন্যদিকে। আমার বোনের আর্তনাদ ও চিৎকার আমার হৃদপিণ্ডে বারবার ধাক্কা দিতে থাকে।

ওর চিৎকার শুনে আমি চকিতে চিতার দিকে তাকিয়ে দেখি, বোন বাঁচার জন্যে ছটফট করছে, বাঁচানোর আকুতি জানাচ্ছে। ওর চিৎকারের পর বেশি করে আগুনে ঘি ঢেলে দেয়া হল। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখায় ওর সারাদেহ জ্বলে গেল, ওর বেঁচে থাকার আকুতি চিরদিনের জন্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিল, চেতনা হারিয়ে যাচ্ছিল। দ্রুত কোন মতে শরীরটাকে টেনে সেখান থেকে চলে এসেছি। এখনও আমার কানে বোনটির চিৎকার ভেসে আসছে। এই বর্বর ধর্মের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মেছে। যে ধর্ম জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে তা কি কোন ধর্ম হতে পারে? ধর্ম মানুষকে উন্নত জীবনের পথ দেখায়। নিরপরাধ মানুষকে পুড়িয়ে মারার নাম ধর্ম নয়– এটা ধর্ম হতে পারে না কক্ষণও।"

"ধর্ম মানুষের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয় না। ধর্মে বর্বরতার কোন প্রশ্রয় নেই। আমি তোমাকে আমার ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছি না কিন্তু এটা সত্য যে, আমার ধর্মে নারীকে সম্মান করা হয়। কারো স্বামী মারা গেলে চার মাস পরই সে ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারে। বিধবার বিয়ের বয়স থাকলে সমাজের লোকেরা-ই তার পুনঃ বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। বিধবার প্রতি সকলে সহমর্মিতা দেখায়।" বলল ইমরান।

আমাদের পণ্ডিতেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও বলি দেয়। বলল মোহন। দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা বা অনাবৃষ্টি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছলে ছোট মেয়েদের ধরে এনে পণ্ডিতেরা বলি দিয়ে, লাশ জ্বালিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের জন্যে দেবতাদের খুশি করে। বলে, এক কুমারী মেয়েকে বলি দিলে বড় দেবতা খুশি হবে, রাজাও বিজয়ী হবে। এই কুমারী বলি দানের আয়োজন চলছে। যার ফলে কোন কুমারী মন্দিরমুখী হতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে।

'কুমারী বলীদান কখন হবে?'

'পণ্ডিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কুমারী তালাশ করছে।' জগমোহন বলল। পণ্ডিতেরা বিশেষ গুণের কুমারী বাছাই করার জন্যে সবাইকে তাদের কুমারী মেয়েকে মন্দিরে পাঠাতে বলেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পণ্ডিতেরা পছন্দনীয় কুমারী পায়নি বলে শুনেছি।'

'তোমাদের কি কোন কুমারী বোন আছে?'

'আমার একটি কুমারী বোন আছে। কিন্তু আমি তাকে মন্দিরে যেতে দেই না। আমার বাবাও বলেছে ও যেন মন্দিরে না যায়। আমার বোন খুব সুন্দরী। আমার ভয় হয় পণ্ডিতেরা দেখলে ওকেই পছন্দ করবে।'

জগমোহনের মন দুঃখভারাক্রান্ত ছিল। ইমরানের সাথে কথা বলে আনন্দ পেল।

"তুমি তোমার বোনকে মন্দিরে যেতে বারণ করে ভাল করেছ। রাজা জয়পালের পরাজয় হয়েছে তার ভুলের কারণে। সে আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছে। সেই সাথে জাতিকেও ধোঁকা দিচ্ছে। এর চেয়েও মারাত্মক হলো, তোমাদের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা গোটা জাতি ও রাজাকে প্রতারণা করছে। তারা শুধু রাজার সন্তুষ্টিতে ব্যস্ত। রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এরা সব রকম প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। অবশ্য এ ধরনের ধোঁকাবাজি মুসলমানদের মধ্যে আছে। এক ধরনের ভণ্ড প্রতারক পীর ও ফকিরেরা ধর্মের লেবাসে এসব করে থাকে। খৃস্টান ধর্মেও ওদের পাদ্রীরা ধর্মের প্রকৃত বিধানকে বিকৃত করে শাসকদের মন জয় করার জন্যে নানা উপাচারের জন্ম দিয়েছে। পণ্ডিতদের বলা উচিত ছিল, রাজা যাতে নিজের ত্রুটি এবং সুলতান সুবক্তগীনের সাফল্যের নেপথ্য কারণগুলো উদঘাটন করে। কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অপ্রিয় সত্য কথাটি বলেনি, যাতে রাজা নারাজ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরা রাজাকে খুশি করার জন্যে দেবতা নারাজের গল্প ফেঁদেছে। আর কুমারী বলি দানের আজগুবী সমাধান দিয়েছে।

তোমার ধর্মের যে খারাপ দিকটির কথা বলেছো তা ধর্মীয় বিধান নয়, ধর্মগুরুদের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্ট বিদ'আতে আমাদের ধর্মে অনেক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাবানদের খুশি করার জন্যে আমাদের কিছু মৌলভী-ইমাম সাহেবরা ধর্মের বিধান বিকৃত করছে। অথচ না ধর্মীয় বিধানে এমন আছে, না মানুষের বিবেক এমনটি করতে বলে। কিন্তু লোভী ধর্ম ব্যবসায়ীরা বিকৃতিগুলোতে ধর্মের লেবেল এঁটে দিয়েছে। শাসকরা যদি নিজেদের ক্ষমতা রক্ষায় ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায় তবে কিছু ধর্মীয় পণ্ডিত ধর্মের বিধান বিকৃত করে ক্ষমতাবানদের আশ্রয় দেয়। যদি ক্ষমতাবানরা ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে প্রজাপীড়ন শুরু করে, প্রজাদের সাথে জুলুম, অত্যাচার, ধোঁকা, প্রতারণা শুরু করে, তবে একদল ধর্মীয় লেবাসধারী লোক শাসক শ্রেণীর জুলুমকে ধর্মীয় বৈধতা দিতে এগিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। কিন্তু বিকৃতির কারণে আজ ধর্মের প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টি হয়েছে।"

"আচ্ছা, তোমাদের ধর্মেও কি নরবলীর বিধান আছে?" ইমরানকে জিজ্ঞেস করল মোহন।

"না! আমাদের ধর্মে এমন কর্মকাণ্ডকে হত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদের কোন ধর্মীয় পণ্ডিত যদি কাউকে বলী দেয় তবে তাকে অবশ্যই হন্তারক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

হ্যাঁ। মুসলমানরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে শুধু জিহাদের ময়দানে ধর্মের সুরক্ষার জন্যে। সুলতান সুবক্তগীন এ কাজটিই করেছেন। তার বিজয়ের নেপথ্য কারণও এটি। তিনি ইসলামের জন্যে সাধারণ মুসলমান ও সৈন্যদের এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, তারা জাতির ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে যুদ্ধ-ময়দানে জীবন ত্যাগ করতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে। আমি তোমাদের ধর্মকে হেয় করার উদ্দেশে বলছি না, প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে বলছি, আমরা এক প্রভুর ইবাদত করি। আমাদের ধর্মে একাধিক প্রভু নেই। একটু জ্ঞান খাটালে এ সত্য তুমিও উপলব্ধি করতে পারবে। এসব ভূত যেগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো তো মাটির তৈরি। এগুলো মন্দিরের শোভা বর্ধন ছাড়া কিছুই কি করতে পারে? ওদের গায়ে মশা-মাছি বসলেও, পশুরা পেশাব পায়খানা করলেও তাদের এতটুকু শক্তি নেই যে ওদের তাড়াবে। এরা নিষ্প্রাণ। একটু সাহস করে এসব ভূতকে যদি তুমি টুকরো করে ফেলো, এরা পারবে না এদের ভগ্নাংশগুলো জোরা দিয়ে নিজেদের পূর্বের অবয়ব ফিরিয়ে আনতে। এই যদি হয় দেবতাদের অবস্থা, তাহলে এরা পূজারীদের কিই বা উপকার-অপকার করতে পারবে! এর বিপরীতে আমাদের প্রভু শুধু মসজিদে থাকেন না, সব জায়গায় সব সময় তিনি উপস্থিত রয়েছেন। তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজ করেন। তিনি কোন মানুষের রক্ত পিপাসু নন, কোন কুমারীকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে বলী দেয়ার দরকার হয় না।"

ইমরানের কথাগুলো বিপর্যস্ত ভগ্ন হৃদয় মোহনের হৃদয়রাজ্যে সান্ত্বনার ছোঁয়া দিচ্ছিল। সেই সাথে তার জীবন্ত বোনকে অগ্নিভস্ম করায় হিন্দু ধর্মের প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি হলো।

তোমার কষ্ট ভাগ করে নেয়ার মতো নয়। আমি সহমর্মিতা ও দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু তোমাদের দুঃখ লাঘব করার সাধ্য আমার নেই। তবে তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি, যদি তোমার কোন প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ কর তবে কাছে পাবে– বলল ইমরান।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের জন্যে এতটুকু সান্ত্বনার কথাও অনেক বড় সাহায্য। মানুষের মন যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন মানুষের কাছে বৈষয়িক সাহায্যের চেয়ে আন্তরিকতার ছোঁয়া অনেক বেশি উপকারে আসে। এটা কষ্টের উপর সুখের প্রলেপ দেয়। হৃদয়বান ব্যক্তিদের পক্ষেই দুঃখী মানুষের এরূপ

উপকার করা সম্ভব হয়। দুঃখের এই মুহূর্তে ইমরানের উপস্থিতি ও সান্ত্বনায় জগমোহনকে ইমরানের একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত করল। একদিন ইমরানের ছুটি ছিল, সেদিন মোহন তাকে শিকারে নিয়ে গেল। ইমরান তীর ধনুক সাথে নিয়ে গিয়েছিল। দু'জন মিলে বহু পাখি শিকার করে বাড়ি ফিরল।

ফেরার পথে মোহন ইমরানকে বলল, তুমি অনর্থক আমাকে দিয়ে এই সব পাখি বধ করালে। তুমি জান আমি বামুনের ছেলে। আমাদের জন্য প্রাণীবধ নিষেধ, তদ্রুপ গোশ্‌ত খাওয়া নিষিদ্ধ।

'গোশত খেলে তোমাদের ধ্যান-ধারণাও বদলে যাবে। আজ আমি তোমাকে গোশত্ খাইয়ে ছাড়ব। দেখো, এতে যদি তোমাদের দেবদেবী আমাকে কোন বিপদে ফেলে তবে সেই বিপদ ও শাস্তি আমি বরণ করে নেব।'

ইমরান পাখিগুলোর পালক ছাড়িয়ে মসলা দিয়ে চুলোর আগুনে সেঁকে কাবাব তৈরি করল। মোহন এসবে হাত দিতেই ভয় পাচ্ছিল। বেশি সাধাসাধি না করে ইমরান নানাভাবে এগুলোর স্বাদ ও উপকারিতা বলে যাচ্ছিল। বলছিল, আমাদের প্রভু মাত্র কয়েকটি ঘৃণিত জিনিস ছাড়া সব জিনিস খাওয়া বৈধ করে দিয়েছেন। মানুষের জন্যে আমাদের ধর্ম এমন কঠিন কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি যা মানুষের জীবন ধারণে কষ্ট সৃষ্টি করে। মোহন কাঁপা হাতে পাতিল থেকে একটু করে গোশ্‌ত মুখে পুড়ে নিল। জীবনে এই প্রথম সে গোশ্‌তের স্বাদ নিল। কিন্তু নিমিষেই গোটা একটি পাখি খেয়ে ফেলল মোহন। বলল, 'দাও! আরো খাব।'

আরো একটি পাখি খেল মোহন। বলল আরেকটি খাব। এভাবে কয়েকটি ভুনা পাখি খেয়ে মোহন গোশ্‌তের স্বাদে যখন মত্ত হয়ে পড়েছে, তখন ইমরান তাকে বারণ করল। না, আর খাবে না। হঠাৎ করে এসব গুরুপাকে বেশি আহার করলে তোমার পেট খারাপ হতে পারে। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে হবে। আমার ঘরে তো যাতায়াত আছেই। আমি তোমাকে মাঝে মধ্যে গোশ্‌ত দিয়ে আপ্যায়িত করব।

ইমরানের নিষেধ সত্ত্বেও সে আরো দুটি পাখি গলাধঃকরণ করল এবং এই যুক্তি দিলো যে, কতক্ষণ দৌড়ালে হজম হয়ে যাবে।

এরপর মোহন যতবার ইমরানের ঘরে যেতো, গোশ্‌তের বায়না ধরতো। ইমরান তার চাহিদানুযায়ী গোশ্‌তের ব্যবস্থা আগেই করে রাখতো। ইমরানের

কথার যাদুই হোক বা গোশ্‌তের স্বাদই হোক মোহন পুরোপুরিই ওর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠল।

'তুমি কি মন্দিরে যাও'? একদিন মোহনকে জিজ্ঞেস করল ইমরান।

মাঝে মধ্যে যাই। অবশ্য কিছুদিন ধরে নিয়মিত একটি রীতি পালনের জন্যে যাওয়া হয়।" বলল মোহন।

'তুমি যেসব মূর্তির সামনে পূজা-অর্চনা কর একদিন ওদের কানে কানে বলবে যে, তুমি গোশ্‌তখোর হয়ে গেছো। খেয়াল করো তোমাদের হাতে তৈরি এসব দেবদেবী তোমাকে কি জবাব দেয়।' বলল ইমরান।

দেখবে ওরা কিছুই বলবে না। এতদিন যাবত তুমি গোশ্‌ত খাও, কোন শাস্তি কি তোমাকে দিতে পেরেছে? হ্যাঁ! যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের কোন পণ্ডিত পুরোহিতের কানে এ খবর চলে যায় তবে গোটা পরিবারের উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দেবে।

এসব শুনে মোহন নিজ ধর্মের প্রতি আরো বিদ্বেষী হয়ে উঠল।

এক সন্ধ্যাবেলা। ইমরান একাকী ঘরে বসে রয়েছে। অনিন্দ্য সুন্দরী এক তরুণী তার দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। কিশোরীর গায়ের রঙ দুধে আলতা। দীঘল কালো চুল, তার পিঠ জুড়ে যেন কৃষ্ণ বন্যা। একজোড়া চোখ যেন সাগরের মতো উচ্ছল, দীঘির পানির মত স্বচ্ছ। তার কথা, চাওনি, হাঁটা-চলাও দৃষ্টি কাড়া।

ষোল সতের বছরের এই তরুণী এতই মোহনীয় যে, তার চেহারা থেকে দৃষ্টি সরানো যে কোন পুরুষের জন্যে কঠিন পরীক্ষা। অপরিচিত এই যুবতীকে ঘোর সন্ধ্যায় ঘরে দেখে ইমরান ভাবনায় পড়ে গেল।

'আপনিই কি ইমরান বালাজুরী?'

'হ্যাঁ! আমিই'।

"আমি জগমোহনের ছোট বোন। আমার নাম ঋষি। আমি দাদার খোঁজে এসেছি। বাবার অবস্থা খুব শোচনীয়। ঘরে কোন পুরুষ নেই যে কোন ডাক্তার-বৈদ্য ডেকে আনবে। আমি জানতাম, দাদা আপনার এখানে আসে।"

"হ্যাঁ! আসে। তবে অনেক রাতে আমার এখানে আসে। আচ্ছা, আমি তোমার সাথে আসছি, চেনা পরিচিত কোন বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসব।"

"আপনি কি এখানে একাই থাকেন?" জিজ্ঞেস করল ঋষি।

"বিলকুল একা।"

"আপনার বিবি নেই?"

"এখনও বিয়ে করিনি।"

হিন্দু মেয়েটির চেহারার নিরুদ্বেগ ভাব আর মুচকি হাসি দেখে ইমরান বুঝে ফেলল, বাবার অসুখের কথা বললেও এই মেয়ে এতো সকাল সকাল উঠবার নয়। ইমরানের চেহারা ও কথা মেয়েটিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়ে রাখল।

"আপনি বিয়ে করেননি কেন?"

"ঋষি তোমার বাবা অসুস্থ। তোমার জলদি ঘরে ফেরা দরকার। আজ নয় অন্য দিন এসব ব্যাপারে কথা বলব।" বলল ইমরান।

"অসুখটা ততো গুরুতর নয়। এমনিতেই আপনার ঘরে একটু বেশি সময় বসলাম। আপনার ভাল না লাগলে উঠি। দাদার কাছে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। এজন্যে আপনাকে দেখার খুব শখ ছিল। সত্যিই আপনি সুন্দর, চমৎকার। আমার দাদাটা অধিকাংশ সময় উদাস থাকে। ইদানীং আহারাদিও ঠিকমত করে না।"

ইমরানের একবার ইচ্ছে করছিল, ঋষিকে বলে দেবে যে, মোহন প্রতিরাতেই তার ঘর থেকে গোশ্‌ত খেয়ে বাড়ি ফেরে, তাই সে আহার তো কম করবেই। কিন্তু এটা ছিল খুবই গোপন একটি ব্যাপার। গোপনীয়তা রক্ষার্থে সে বিষয়টি চেপে বলল, যে নিজের আদুরে বোনকে জীবন্ত পুড়ে মরতে দেখেছে তার মধ্যে উদাসীনতার ভাব আসাটা স্বাভাবিক। তুমিও মনে হয় বোনের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেয়েছো, তাই না ঋষি?

কষ্টের কথায় ঋষির কণ্ঠ থেকে 'আহ' বেরিয়ে এলো। তার চোখে ছলছল করছে পানি। ধরা গলায় বলল, "জানিনা, আমার ভাগ্যেও হয়তো জীবন্ত পুড়ে মরাই রয়েছে। এজন্য ইচ্ছে করে জীবনে বিয়েই করব না।"

ইমরান তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল ঋষির দিকে। ঋষিও মুগ্ধের মতো ইমরানের চেহারায় কি যেন খুঁজে ফিরছিল। ইমরান অনুভব করছিল, হতাশার সাথে সাথে কি যেন এক স্বপ্ন ঋষির হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে। শরীরের সৌন্দর্য আর ধর্মের সীমানার মাঝে আশা-দুরাশার দোলাচলে ঋষিদের গোটা পরিবার আজ দুলছে। ঋষিও বিধি-নিষেধে বাঁধা বামুন পরিবারের এক অসহায় তরুণী। যার পক্ষে এই বিধি-নিষেধের দেয়াল টপকানো সত্যিই বড় কঠিন। ঋষি হয়তো ইত্যবসরে ইমরানকে দেখে এসবই ভাবছিল। তার স্বপ্নের পায়রারা অনেক দূর উড়াউড়ি করে কোন নীড় খুঁজে না পেয়ে ক্লান্তি ও হতাশায় ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল।

"না, ঋষি না। তোমাকে জ্বলতে হবে না। আমি তোমাকে কখনও জ্বলতে দেবো না। তুমি যদি মরেও যাও, তবুও আমি তোমার লাশ চিতা থেকে তুলে নিয়ে আসব।" আবেগের আতিশয্যে ঋষির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল ইমরান।

ইমরানের স্পর্শে ঋষি ভরকে গেলো। ইমরান নিজেকে সামলে স্মিতহাস্যে বলল, দুঃখিত ঋষি। আমাকে ভুল বোঝ না। সত্যিই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, তোমাদের ধর্মে নিরপরাধ মহিলাদের কেন জ্বালিয়ে মারা হয়। তোমাদের পণ্ডিত পুরোহিত ও সমাজের মানুষেরা কেন এতো নির্দয় ও পাষাণ!

তুমি আমার ভাগ্য বদলাতে পারবে না, ইমরান। ঋষি ইমরানকে আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে নেমে এল। ইমরান তন্ময় হয়ে ঋষির দিকে তাকিয়ে আছে। উভয়ের কণ্ঠ নীরব। কারো মুখে কথা নেই। ইমরান ঋষির আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল, "আমি তোমার ভাগ্য বদলে দেবো ঋষি।" ক্ষীণকণ্ঠে ইমরান বলল, "তুমি যদি আমার সাথে থাকো, তবে যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা প্রভু আমাকে দেবেন।"

"আগামীকাল কি আসব?" জিজ্ঞেস করল ঋষি।

"ঠিক এ সময়ে। তবে কেউ যেন দেখতে না পায়। ধর্মের বৈপরিত্য আমাদের জন্যে কঠিন বাধা। কেউ তোমার আসা আঁচ করতে পারলে কেলেঙ্কারী বেধে যাবে। জগমোহন আমাকে বলেছে, তোমাকে মন্দিরে যেতে দেয়া হয় না। এর কারণও সে আমাকে বলেছে।"

"আমি কোন দেবতার জন্যে বলী হতে চাই না। আমি দিনে ঘরের বাইরে বের হই না। কোথাও যেতে হলে রাতেই যাই।"

"আগামীকাল এলে কথা হবে। তুমি বাড়ি যাও। আমি কোন হেকিম না হয় বৈদ্য নিয়ে তোমাদের বাড়িতে আসছি।"

ঋষিকে বিদায় জানাতে ইমরান দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ঋষি থমকে দাঁড়াল। উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি।

"আমি কোন অপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে কখনও এত ঘনিষ্ঠ হইনি। তোমারও ঘনিষ্ঠ হতে ভয় করে। আমরা মুসলমানদের সম্পর্কে কখনও ভাল কিছু শুনিনি। দাদা যদি তোমার সম্পর্কে না বলতো, তবে এখানে আসার দুঃসাহস কখনও হতো না। তোমার সাথে কথা বলে আমি মুগ্ধ।"

উভয়ে হাতে হাত ধরে দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এল। তার মধ্যে চলে যাওয়ার কোন তাড়া নেই। ইমরান ইচ্ছে করেই তার হাতটা ধরেছিলো। ঋষিও তার হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না। ঋষি পরম স্বস্তিতে যেন এক সাহসী নিষ্ঠাবান মুসলিম যুবকের হাত ধরে পৌত্তলিক ধর্মের মৃত্যু সাগর পাড়ি দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই ঋষি ইমরানের হাত ছাড়িয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। ঋষি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ইমরান ঘর থেকে বেরিয়ে এক হেকিমের কাছে রওয়ানা হল।

হেকিমকে জগমোহনদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই ইমরান ঘরে চলে এলো। বাড়িতে প্রবেশ করে বারান্দায় পা রাখতেই ইমরান টের পেল কে যেন গেটের দরজা খুলে আবার বন্ধ করেছে। কেউ প্রবেশ করছে কি-না দেখতে পিছন ফিরে তাকাতেই ইমরানের মনে হল কোন নারী। ভাবল আবার ঋষি আসেনি তো? কাছে আসতেই দেখল জামিলা। তুমি এই সময় কি করে এলে? জিজ্ঞেস করল ইমরান।

"আগে বল এই হিন্দু পেত্নী এখানে এলো কেন?"

শুধু এটাই জানতে এসেছি, এই হিন্দু মেয়েটি এখানে কেন এসেছিল? আমি কি এতই নচ্ছার যে, শুধু দূর থেকেই আমার সালামের জবাব দিয়ে চলে যাবে। আমার প্রস্তাবের জবাবে তুমি বারবার একথাই বলছো, 'তোমার স্বামীকে আমার ভয় করে, দয়া করে তুমি আমার ঘরে এসো না।'

ইমরান গেটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে জামিলাকে ঘরে নিয়ে এল। এ ঘরেই একটু আগে ঋষি বসেছিল।

সে তার ভাইকে এখানে খুঁজতে এসেছিল। জামিলাকে বলল ইমরান। আজই আমি তাকে দেখলাম। ওর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, পরিচয়ও নেই। জামিলা! আমি তোমার সাথেও কোন সম্পর্ক রাখতে পারব না। তুমি একজন বিবাহিতা মুসলিম মহিলা। তোমার স্বামী আছে। তোমার সালাম ও পয়গাম তো উদ্দেশ্যমূলক। তুমি চাও শারীরিক সম্পর্ক। তোমার পয়গাম গ্রহণ করে গুনাহগার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

"যাকে তুমি আমার স্বামী বলছো, সে আমার একার স্বামী নয়। তার তিন বিবি বর্তমান। আমি তন্মধ্যে ছোট। আমার বয়স এখনো বিশের কোঠা পেরোয়নি। স্বামীর বয়স আমার তিনগুণ। সে টাকার জোরে তিন বিবি পুষছে। আল্লাহ টাকা ছাড়া তাকে তিন বিবি রাখার মতো না দিয়েছে সৌন্দর্য, আর তার

না আছে দৈহিক সামর্থ্য। তার মতো নির্বীজ পুরুষ যদি টাকার জোরে তিন বিবি রাখতে পারে তবে একজন সামর্থ্যবান নারীর কি দুই স্বামী রাখা দোষণীয়? মেয়েদেরকে কেন তাদের পছন্দনীয় পুরুষের সংস্পর্শে যেতে নিষিদ্ধ করা হল? পুরুষদের এই অধিকার কেন দেয়া হলো যে, তারা ইচ্ছেমত তিন-চারজন করে যুবতী স্ত্রী-বিবি রাখতে পারে!

"এতে আমার কি অপরাধ? আমি তো পুরুষদেরকে তিন চার বিবি রাখার অনুমতি দেইনি। ঠিক মেয়েদেরকেও একাধিক স্বামী গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আমি আরোপ করিনি। আমি তোমার সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখতে অপারগ এতটুকু বলেছি। দয়া করে তুমি চলে যাও। তোমার স্বামী যদি জানতে পারে যে, তুমি এখানে আসো, তবে আমার খুব বিপদ হবে।"

সে এখানে নেই! পেশোয়ার গেছে ব্যবসায়িক কাজে। এক মাসের মধ্যে সে ফিরবে না। সে আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু আমি এমন অসুখের অজুহাত দেখলাম যে, সে ভড়কে গেলো। সে অন্য এক বিবিকে সাথে নিয়ে গেছে, সেটি আমার থেকে তিন বছরের বড়। এর বড়টা কোথায় যেন গেছে। অনেক রাত পর বাড়ি ফিরবে। সে আমাকে কোথাও যেতে বাধা দেয় না, আমিও তাকে যেতে বাধা দেই না। তুমি আমাকে মুসলমান বলছো। আমি নামে মাত্র মুসলমান। আমার বাবা-মার ঈমান হলো সোনা চাঁদি। মোটা অংকের পণ নিয়ে তারা আমাকে এই বুড়োটার হাতে তুলে দিয়েছে। ধর্মের প্রতি আমার আদৌ কোন আগ্রহ নেই। আমাকে শিখানো হয়েছে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নারীর জন্ম। আমি পুরুষের প্রমোদ সামগ্রী হয়েছি, তাই আমিও আমার জীবনের প্রমোদ সঙ্গী খুঁজে নেয়ার অধিকার রাখি। আমি তোমাকেই বানাতে চাই আমার সুখের সঙ্গী। তুমি বল! কি তোমার চাই। এর জন্যে কি মূল্য দিতে হবে তোমাকে। আমি কি এই হিন্দু মেয়েটার চেয়ে কম সুন্দরী?

"আমি তোমার স্বামীর কাতারের লোক নই। তোমার রূপ-লাবণ্য আর সৌন্দর্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। নারীর প্রতি আসক্তি থাকলে একাধিক না হলেও এ পর্যন্ত অন্তত একটি বিয়ে তো করতে পারতাম। কারো রূপ-লাবণ্যের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই, নিজের চেহারার প্রতিও আমার লক্ষ্য নেই। তুমি আমার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। মুসলিম নারীর সম্পদ হলো সতীত্ব। মনের কালিমা দূর করে নিজেকে পবিত্র কর।"

"তুমি একটা গবেট, ভীতু। নিজেকে বঞ্চিত এবং প্রতারিত করছ তুমি। আমার শরীরের আত্মা বলতে কিছু নেই। যেসব মেয়ে বাজারে টাকার মূল্যে

বিক্রি হয় এদের কোন প্রাণ থাকে না, মরে যায়। তুমি কি আমার মৃত জীবনটাকে জীবিত করতে পার ইমরান?"

"তাহলে স্বামীর কাছ থেকে তুমি তালাক নিয়ে নাও। তারপর আমার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হও।"

এটা সম্ভব নয় ইমরান! আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাই। যতো টাকা-পয়সা লাগে আমি সাথে নিব। তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাও সেখানেই যাব। তবুও তুমি আমাকে রক্ষা কর। একটু সুখ তুমি আমাকে দাও। জামিলা কামোদ্দীপ্ত হয়ে ইমরানের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার জিঞ্জির থেকে ছুটতে পারো না ইমরান। স্বামী ছাড়া আমি কারো সাথে মিলিনি। কিন্তু বহুদিন যাবত পিপাসার্ত আমি। আমার হৃদয় তোমাকে পেতে পাগল হয়ে গেছে। আমার শরীর কামনার আগুনে জ্বলে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তুমি আমাকে বাঁচাও ইমরান!

"তুমি প্রবৃত্তির আগুনে নয়, প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছ। এই আগুনে তোমার বাবাকে জ্বালাও। যে লোক টাকার বিনিময়ে বুড়ো লোকের কাছে তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। এরপর একইভাবে স্বামীকেও সেই আগুনে নিক্ষেপ কর।"

"আচ্ছা বল, তুমি আমার সঙ্গী হবে?"

"কি করতে চাও তুমি?"

"আমি স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব। কিন্তু তুমি আমাকে এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে যাবে।" গভীর দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলে ইমরান। এ সুযোগে জামিলা একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে। চরম উদ্দীপ্ত জামিলা। ভাবল এবার শিকার কব্জায় এসে গেছে।

ওকে দু'হাতে সরিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সঙ্গ দেবো। কিন্তু স্বামীকে সে দিন বিষ খাওয়াবে যে দিন আমি বলব। এর মধ্যে আমি কোথাও জীবিকার ব্যবস্থা করে নেব।

"ধোঁকা দিচ্ছ না তো?"

"না।"

"আমাকে তোমার ঘরে আসতে বাধা দেবে না তো?"

"না আসলেই ভাল হবে। কারণ তোমার আমার সম্পর্কের ব্যাপারে কারো সন্দেহ সৃষ্টি হোক তা আমার কাম্য নয়।" বলল ইমরান।

আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল জামিলা। এবার ইমরান যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে গেল। জামিলা ঋষির মতোই সুন্দরী এবং কামনাদীপ্ত একটি আগুনের কুণ্ডলী। অতৃপ্ত বাসনা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

জামিলার স্বামীর বাড়ি ইমরানের বাড়ির একেবারে কাছে। জামিলার বাড়ি গড়া নবাবী ধাঁচে। ইমরানকে সে তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বহুদিন যাতায়াত করতে দেখেছে। জামিলা বহুবার ইমরানকে মুখোমুখি সালাম করেছে। কিন্তু ইমরানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর সে কয়েকবার এক গরীব অসহায় মহিলার মাধ্যমে সাক্ষাত প্রার্থী হওয়ার পয়গাম পাঠিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। সব ব্যাপারেই ইমরান নির্বিকার থেকেছে। এরপর থেকে জামিলা ইমরানের ঘরের দিকে দৃষ্টি রাখছিল, ওখানে কে কে যাতায়াত করে। আজ একটি হিন্দু মেয়েকে ইমরানের ঘর থেকে বের হতে দেখে ওর মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। নিজেকে সামলাতে না পেরে সে ইমরানের ঘরে হানা দেয় নিজের ইচ্ছা চরিতার্থের ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত করতে। জামিলাকে দেখে ইমরানের মনে হচ্ছিল, জামিলা তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে গিলে ফেলবে। জামিলা যখন স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যার কথা বলে, তখন ইমরানের এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আসে। জামিলা যখন ওর স্বামীর আসার এক মাসের বিলম্বের কথা বলে তখন ইমরান ফন্দি আঁটে এক মাস এই কামিনীকে ধোঁকায় রাখা যাবে।

বাস্তবে ঋষির মন মগজে ইমরান স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। ইমরানের সান্নিধ্যের জন্যে ঋষির মন সময় সময় আনচান করে। ঋষির তুলনায় জামিলাও রূপ-সৌন্দর্যে কম নয়, কিন্তু মন বলে কথা। ঋষির বিপরীতে জামিলার প্রতি তার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে ঋষি তার হৃদয়ে বারবার দ্বাদশীর চাঁদের মতোই উঁকি দিচ্ছে। অপরদিকে ঋষি ইমরানের সান্নিধ্যে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে। ইমরানের সৌম্য কান্তি ঋষির মনে বারবার ভেসে উঠছিল। সে কিছুতেই তাকে বিস্মৃত হতে পারছে না।

জামিলা চলে যাওয়ার পর ইমরানের দায়িত্বের গুরুভারের কথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইমরান ভাবল, গোয়েন্দাবৃত্তির গুরুদায়িত্ব তাকে দৃশ্যত পাথর বানিয়ে রেখেছে। গোয়েন্দা দায়িত্ব পালনে নিজের আত্মপরিচয় গোপন রাখতে সফল হয়েছিল সে। দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থেই সে রাজমহলে নৌকরি নিয়েছে।

রাজকর্মচারী হিসেবে জয়পালের কার্যক্রম সম্পর্কে ভেতরের খবর অতি সহজে সংগ্রহ করতে পারছিল। ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংবাদ সে গজনীর সুলতান সুবক্তগীনের কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঋষি ও

জামিলা তার মধ্যে মানবিক তাড়না উস্কে দেয়। মানব-মানবীর জৈবিক তাড়না তাকে এখন ছিঁড়ে খাচ্ছে। একাকী সে দায়িত্বের গুরুভার অনুভব করছিল এবং এই সমীকরণে পৌঁছতে সক্ষম হয়, ঋষি ও জামিলার কামনার ঝড় তাকে দায়িত্বের কঠিন অনুশীলন ও একাগ্রতা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। আজকের পরিস্থিতিতে বুঝতে পারল, এখন থেকে তার ঘরে রীতিমত ঋষি ও জামিলার আগমন ঘটবে এবং এরা তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। সে একাকী ঠিক করল, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুত হওয়া একটা জাতির সাথে বেঈমানীর নামান্তর। তাই সে ওদের কিছু না জানিয়েই দূর এলাকায় ঘর দেখার সিদ্ধান্ত নিল। সেই সাথে এও ঠিক করল, অচিরেই সে লাহোর থেকে গজনী চলে যাবে।

সিদ্ধান্ত যাই নিক, দায়িত্বজ্ঞান যতই থাক, রক্ত-মাংসেই গড়া একজন মানুষ ইমরান। নারীর রূপ-সৌন্দর্য যে কোন কঠিন পুরুষকেও কাবু করতে সক্ষম। ইমরানের বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটল না। দুই নারীর যন্ত্রণায় পিষ্ট হতে লাগল ইমরান। ভিতরে ভিতরে তার মধ্যে নারী ও গোয়েন্দা কর্তব্য দারুণ সংঘাতের জন্ম দেয়।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই ইমরানের ঘরে হানা দিল ঋষি। এটা ছিল ঋষির দ্বিতীয়বার ইমরানের সংস্পর্শে আসা। ঋষির ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ছোটবেলা থেকেই ইমরান তার পরিচিত, দু'জন একসাথে হেসে খেলেই বড় হয়েছে যেন।

'গতকাল তুমি বলেছিলে আমার শবদেহকে তুমি জ্বলতে দেবে না। একথা কেন বলেছিলে'? জিজ্ঞেস করল ঋষি।

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে ইমরান বলল, 'গতকাল তুমি এখানে এসেছিলে তোমার ভাইয়ের খোঁজে। আজ কেন আসলে?'

"তোমাকে দেখতে এসেছি।"

"কেন?"

'তুমি আমাকে জ্বলতে দেবে না কেন তা জানতে। গতকাল তোমাকে বলতে পারিনি। একসেনা কর্মকর্তার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে।'

"আর সে গজনী অভিযানে যাবে। তোমার জীবনও বোনের মতই চিতার আগুনে জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে।"

"এসব লোকগুলো নারীকে মানুষই মনে করে না। দেবতাদের জন্যে শুধু মেয়েদের কেন বলী দেয়া হবে, বলী কি কোন পুরুষ মানুষকে দিতে পারে না?" একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঋষি।

"তোমাদের ধর্মে তোমার প্রশ্নের কোন জবাব নেই ঋষি। আমার ধর্মে মানুষ বলিদানের কোন রীতি নেই।"

"আমি পুড়ে মরতে চাই না। আর পালিয়ে বাঁচার কোন পথও নেই, কোন আশ্রয় নেই।" এক বুক হতাশা ও ভীতকণ্ঠে বলল ঋষি।

কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে ইমরান-ঋষি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। উভয়েই ভুলে গেল ধর্মের ব্যবধান, সামাজিকতার দেয়াল। নিজের দায়িত্বজ্ঞানের কথাও ভুলে গেল ইমরান। রাত কত হয়েছে তারও কোন খেয়াল নেই। সেও যাওয়ার জন্যে উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিল না। ইমরানের মধ্যে সে খুঁজে পেল তার জীবনের নিরাপত্তা, নিরাপদ আশ্রয়। ইমরানের সান্নিধ্যই যেন তার পরম ঠিকানা। সে উঠতেও চাচ্ছিল না, কিন্তু যেহেতু এখানে থাকা সম্ভব নয় তাই অগত্যা গাত্রোত্থান করল ঋষি। দু' তিন দিন পর ঋষি আবার ইমরানের ঘরে এল। কথা শুরু করতে যাবে এমন সময় বাইরে জগমোহনের হাঁক শোনা গেল।

"তোমার দাদা এসেছে ঋষি। তুমি পাশের কামরায় লুকিয়ে পড়।"

জগমোহন ঘরে প্রবেশের আগেই ঋষি অপর কামরায় লুকিয়ে গেলো।

"তুমি আমাকে মাংস খাইয়ে এমন করে ফেলেছো যে, ঘরের সব্জি-তরকারী দেখলে আমার খাবার আগ্রহ দমে যায়। কোন খাবার আছে কি?"

ইমরান গোশ্‌ত রান্না করে আগে থেকেই রেখেছিল। হাড়িসহ রান্না করা গোশ্‌ত সে মোহনের সামনে এনে দিল। জগ এটা দেখার প্রয়োজনবোধ করেনি, ইমরান খেয়েছে কি খায়নি। সে হাড়ির সবটুকু গোশ্‌ত খেয়ে সাবাড় করল।

"ওরা বলী দানের জন্যে কোন মেয়ে কি ছিনিয়ে এনেছে?"

"না এখনও পায়নি। জানি না, পণ্ডিতেরা কোন ধরনের কুমারী তালাশ করছে।"

"তোমাদের বোন কি মন্দিরে যায়?"

"না! তবে আমার আশঙ্কা হয়, আর কতদিন ওকে লুকিয়ে রাখতে পারব।"

ইমরান চেষ্টা করছিল জগমোহনকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে। সে মোহনের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল না। তার অবসাদ ও ঘুমের ভান কার্যকর

ভূমিকা রাখল। মোহন চলে গেল দেরী না করে। জগমোহনের চলে যাওয়া আঁচ করে পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ঋষি। তার চোখে-মুখে রাজ্যের ভীতি।

"দাদা কি গোশ্ত খেয়েছে?" বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল ঋষি।

আমি কখনও তোমার কাছে এই রহস্য ভেদ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এটাও মোহনকে বলা সম্ভব ছিল না যে, পাশের কামরায় একজন তোমার কথা শুনছে। বলল ইমরান। যেদিন থেকে মোহন আমার বন্ধু হয়েছে, সেদিন থেকে গোশ্ত খেতে শুরু করেছে। কিন্তু এ জন্যে কি তোমাদের দেবদেবীরা মোহনকে কোন শাস্তি দিয়েছে? ধর্ম শুধু নেশাজাতীয় জিনিষগুলোই নিষেধ করে যেগুলো মানুষের জ্ঞান-শক্তি লোপ করে দেয়। ঋষি আবার তুমি কবে আসবে, তোমাকেও আমি গোশ্ত খাওয়াব।"

দু'দিন পর ঋষি আবার এলো। ইমরান তার জন্যে মুরগী ভুনা করে রাখল। ঋষি ভয়ে ভয়ে প্রথমে একটু একটু করে ভুনা মুরগীর গোশত মুখে দিল। এরপর বেশ মজা করেই খেল। খাওয়া শেষে বলল, "এরপর যেদিন্ই আসব, আমাকে গোশত্ খাওয়াতে হবে।"

এরপর থেকে ঋষি ঘনঘন ইমরানের ঘরে আসতে শুরু করল। ঋষি এসেই দুটি বায়না ধরতো, একটি গোশ্ত খাওয়ানোর আর দ্বিতীয়টি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে লাহোর থেকে কোথাও নিয়ে চলে যাওয়া।

কেননা, বাড়িতে তার বিয়ের আয়োজন জোরেশোরে চলছে। নিজাম ও কাসেম বন্দী হয়ে না এলে হয়তো এতোদিন ইমরান ঋষিকে নিয়ে লাহোর ত্যাগ করে চলে যেতো। সে প্রতিদিন ঋষিকে নতুন নতুন অজুহাত তুলে ভুলিয়ে রাখছিল। ঋষি ওর সাথে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠছিল।

ইমরান ঋষিকে তার প্রকৃত পেশার কথা বলতে পারছিল না। একদিকে কাসেম ও নিজামের মুক্তির দায়িত্ব, রাজা জয়পালের তৎপরতার খবর যথা সময়ে গজনী পৌঁছানো, অপর দিকে ঋষির প্রেম– ত্রিমুখী ফাঁদে আটকে গিয়েছিল ইমরান।

ঋষির প্রেম নিবেদন তাকে কয়েকবার পালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু নিজাম ও কাসেমের চেহারা দেখার পর তাদের জীবন ও কর্তব্যনিষ্ঠা তার পলায়নে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। নিজাম ও কাসেমের পক্ষে সশস্ত্র প্রহরা ফাঁকি দিয়ে পালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্যে ঋষিকে নিয়ে তার পালানো হয়ে উঠছিল না। কিন্তু ঋষির বাঁচার আকুতি, তার প্রেম ও চোখের পানি বারবার ইমরানের কর্তব্য নিষ্ঠায় বিচ্যুতি ঘটাচ্ছিল।

একদিন ঋষি বেরিয়ে যেতেই ইমরানের ঘরে প্রবেশ করল জামিলা। এ সময়ে ঋষির স্পর্শ-সান্নিধ্য ও স্বপ্নিল অনুভূতিতে জাবর কাটছিল ইমরান। শিহরিত হচ্ছিল উৎফুল্লে। এ মুহূর্তে জামিলা এসে তার সুখানুভূমিতে বাদ সাধে। ক্ষেপে গেল ইমরান। জামিলা হয়তো এসেছিল তার কামনার যন্ত্রণা প্রশমিত করতে। কিন্তু বিধিবাম। ইমরান তার উপস্থিতিতে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল–

"আমি তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করিনি? এখানে আসলে কেন, তোমার স্বামী আসার আগে এখানে তোমার কি কাজ?"

"তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছো ইমরান। তোমার কত টাকা লাগে বল?"

"তুমি ভুল করছো জামিলা। আমি টাকায় বিক্রি হবার পাত্র নই, তোমার কাছে আমার কিছুই চাওয়ার নেই।"

"আচ্ছা! এই হিন্দু পেত্নীটাই তবে তোমার কাম্য? তুমি কি ভুলে গেছো, এটা হিন্দু রাজার দেশ। আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি। হিন্দুরা তোমার লুকোচুরি ধরতে পারলে তোমার ঠিকানা হবে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে।"

"কয়েদ হবার আগেই আমি ঋষিকে নিয়ে পালিয়ে যাব। তুমি আমার কাছে যা প্রত্যাশা কর তা কখনও সফল হবার নয়। ঋষির জন্যে তোমার মতো ডজন ডজন মেয়েকেও আমি ত্যাগ করতে পারি।" বলল ইমরান।

জামিলাকে এভাবে বিগড়ে দেয়া ছিল ইমরানের মস্ত বড় ভুল। সে জানতো না, কামনা মেয়েদেরকে ডাইনী করে তুলে। নিজের যৌবন ও জীবনের প্রতি এই বঞ্চনা জামিলাকে বেপরোয়া করে তুলে। শরম-লজ্জা আর মুসলিম মহিলাদের কমনীয়তা হারিয়ে জামিলা এক ভয়ঙ্কর কমিনার রূপ নেয়। ইমরানের আঘাত ও প্রত্যাখ্যানে জামিলা প্রতিশোধ যন্ত্রণায় হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

হিন্দু মহিলাদের কাছ থেকে জামিলা জানতে পেরেছিল, রাজা জয়পালের জয়ের জন্যে পণ্ডিতেরা একটি কুমারী বলীদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত কুমারী তারা তালাশ করে পাচ্ছে না। বহু কষ্টে দিনটা সে কাটালো। সন্ধ্যা নামতেই রওয়ানা হল মন্দিরে। হিন্দু মেয়েদের সাথে কথায় কথায় সে জানতে পেরেছিল বড় পণ্ডিত কোথায় থাকে। সে সোজা মন্দিরের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে বড় পণ্ডিতের কাছে চলে গেল। পণ্ডিত বেশভূষায় খান্দানি মুসলিম মহিলাকে মন্দিরে দেখে হতবাক হয়ে গেল। তাকে নিজের কাছে খুব খাতির করে বসাল।

"আপনি কবে কুমারী বলীদান পর্ব সম্পাদন করবেন!" পণ্ডিতের নিকট জানতে চাইল জামিলা।

"বিশেষ গুণের কুমারী পেলেই কাজটি আমরা সমাধা করব। কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে জানতে চাচ্ছো কেন– মা!"

আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আপনি হয়তো জানেন না যে শহরের সব হিন্দু কুমারী মেয়ে মন্দিরে আসে না। আমি আপনাকে বলীদানের জন্য একটি উপযুক্ত মেয়ের সন্ধান দিতে পারি। আশা করি এই মেয়ে আপনাদের ইচ্ছে পূরণে যথার্থ প্রমাণিত হবে। জামিলা ঋষির বাবার নাম বলল। সেই সাথে জিজ্ঞেস করল, আপনি তার কুমারী মেয়েটাকে কখনও মন্দিরে আসতে দেখেছেন?।

"আমি তো তোমাকেও কখনও দেখিনি। তুমি কার মেয়ে?"

"আমি অমুক ব্যবসায়ীর স্ত্রী।"

"আমাদের ধর্ম আর বলীদানের ব্যাপারে তোমার আগ্রহের হেতু কি? তোমার মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে বল"– অনুনয়ের স্বরে বলল পণ্ডিত।

মূল মন্দিরের লাগোয়া একটি সুরক্ষিত কামরায় বড় পণ্ডিত থাকে। সেখানে সাধারণ হিন্দুদেরও যাওয়ার অনুমতি নেই। মুসলমানের প্রবেশ তো প্রশ্নাতীত। কোন মুসলমানের মন্দিরে প্রবেশ করার ব্যাপারে সঠিক নিষেধাজ্ঞা ছিল। এমন কি কোন হিন্দুর বাড়ির বসত ঘরেও মুসলমানেরা যাওয়া বারণ ছিল। হিন্দুদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা অস্পৃশ্য, অপবিত্র। কিন্তু জামিলার মতো বনেদী মুসলিম বণিকের স্ত্রীর কথা পণ্ডিত অতি আগ্রহের সাথে শুনল। সুন্দরী এই রমণীর মন্দিরাগমনকে সে রহস্যাবৃত মনে করে। পণ্ডিতেরা রমণ ও রমণীয় কর্মকাণ্ডে দারুণ দক্ষ। মেয়েদের চেহারা দেখলেই তারা বলতে পারে তার ভেতরের খবর। পণ্ডিত জামিলার মধ্যে আঁচ করল হিন্দু শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার ভিন্ন সূত্র। আর সেটিই উদঘাটন করতে তৎপর হলো পণ্ডিত। পণ্ডিতের তুলনায় জামিলা অনভিজ্ঞ এবং গবেট। সে অতৃপ্ত কামনা আর ইমরানের প্রত্যাখ্যানের আগুনে পুড়ছিল। ওর জ্ঞানবুদ্ধি যাও কিছু ছিল তাও প্রতিহিংসা ও উন্মাদনায় লোপ পেয়ে বসেছিল। সে তার মা-বাবা, স্বামী, ঋষি এবং ইমরানের প্রতিশোধ জিঘাংসায় কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মতো টগবগ করছিল। তার সংহারী মূর্তি সব কিছুকেই তছনছ করে বেসামাল করে দিয়েছিল। সে পণ্ডিতের জিজ্ঞাসার জবাবে নিজের কাপড়ের নীচ থেকে একটি পুটলি বের করে পণ্ডিতের সামনে রেখে খুলে দেখাল। পুটলিতে বহু স্বর্ণমুদ্রা। পণ্ডিতের চোখে চোখ রেখে জামিলা বলল–

“আমি যে মেয়ের নাম বলেছি তাকেই আপনি বলী দেবেন।” গোপন রহস্যের মতো করে বলল জামিলা।

এই মেয়ে যদি রোগী কিংবা আমাদের চাহিদাসম্পন্ন না নয়?

সে কুমারী। ষোল-সতের বছরের সুন্দরী। আপনাদের উদিষ্ট গুণসম্পন্ন না হলেও এটিকেই বলী দিতে হবে। এটাই আমার শর্ত।

‘আমাদের ধর্মীয় কাজে দখলদারি করো না মেয়ে। এটা আমাদের পূজা-অর্চনার ব্যাপার।’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল পণ্ডিত।

‘পণ্ডিতজী মহারাজ! কোন ধর্ম কুমারী বলী দিতে বলে না। এটা তো ধর্মীয় ঠিকাদারদের বানানো প্রথা। যদ্বারা তারা মহারাজকে খুশি করে উপহার-উপঢৌকন লাভ করে। এর দ্বারা তারা এটাও সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চায়, তারা দেব-দেবীদের এতই প্রিয়ভাজন যে, তারা যে কাউকে বদ করলেও করতে পারে। আপনারা সাধারণ মানুষ থেকে নিজেদের অনেক উঁচুতে রাখতে ভালবাসেন।’ একটু ঝাঁঝালো স্বরে বলল জামিলা।

“আমার ধর্মের প্রতি ভর্ৎসনা করো না বেটি। তুমি জান না, ধর্মের প্রতি কটূক্তি করার শাস্তি কতো কঠিন।” অস্পষ্ট আওয়াজে বলল পণ্ডিত।

“আমি শুধু আপনার ধর্ম নিয়ে বলছি না মহারাজ! আমাদের ধর্মেও এমন বাড়াবাড়ি আছে। আমাদের অনেক ইমাম, মৌলভী ও পীর সাহেব নিজেদের সুবিধামতো ধর্মকে ব্যবহার করেন। নিজেদের প্রবৃত্তিকে তারা আল্লাহর বিধান বলে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। নিজেদের ত্রুটিগুলো চেপে রেখে অন্যের উপর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করেন। নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে প্রকাশ করেন, সাধারণ মানুষ থেকে নিজেদেরকে অনেক উঁচু মনে করেন। এরা ধর্মের খোলস পরে অন্যদের চেয়ে নিজেদের উত্তম দাবী করেন। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাও বড় বড় অপরাধে লিপ্ত। ধর্মের মূল চেতনা বিনষ্ট করে এরা সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মকে কঠিন করে তুলেছেন। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

পণ্ডিতজী! আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন, আপনাদের মন্দিরের বহু রহস্য আমার জানা আছে। অন্যরা যদিও এ সম্পর্কে বেখবর। আপনি বুঝেন, কারো ব্যথা হলে সে ব্যথার যন্ত্রণায় কোঁকাতে থাকে, আর ব্যথিতের যন্ত্রণা যারা বুঝতে চেষ্টা করে তারা ঠিকই তা অনুভব করে।”

“তোমার বয়স কম হলেও তোমার কথাগুলো বয়স্ক মানুষের মতো। কথাগুলো এত মূল্যবান যা নিয়ে খুব কম মানুষই ভাবে। স্বীকার করতে হবে, তুমি যথেষ্ট প্রাজ্ঞ ও মেধাবী।” পণ্ডিতের কণ্ঠে আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদার ছাপ।

‘আমার মনের দুঃখ আমাকে বয়স্ক বানিয়ে দিয়েছে। এসব আমার কথা নয়, আমার ভগ্ন হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। আমার হৃদয় ব্যথাভরা, দুঃখ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট।’

‘কি রহস্য জান তুমি?’

‘রহস্যের কথা আর কি বলবো। আমি অল্প বয়স্কা আর সুন্দরী না হলে মুসলমান পরিচয় দেয়ার পর এতক্ষণে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আপনি বের করে দিতেন অবশ্যই। কামরা ধুয়ে এখানে আগর-লোবান জ্বালাতেন, ধূপ দিতেন, ভজনা গাইতেন, আরো কতো শত করে মন্দির পবিত্র করতেন। কিন্তু আমার রূপ দেখে আপনি ভুলেই গেছেন, মুসলমান ঢুকলে হিন্দুর ঘর অপবিত্র হয়ে যায়!

আপনি সোনার মুদ্রাগুলো ধরে দেখেছেন, আমাকে কাছে বসিয়েছেন। এসব সোনার মুদ্রা আর আমার যৌবন উথলে পড়া শরীর দেখে আপনার চোখ ও মন থেকে পাণ্ডিত্য দূর হয়ে গেছে। আপনার মুখে শুধু পণ্ডিতের স্বরটা রয়ে গেছে। অন্তরের দিক থেকে এখন আপনি আমার স্বামীর মতই। সে টাকার বিনিময়ে আমাকে কিনে নিয়েছে। আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি বিক্রিত পণ্য। এখন আমি বিক্রি হতে কিংবা কাউকে খরীদ করতে একদণ্ড ভাবি না। আমার মন যাকে চায় তাকে আমি খরিদ করতে পারি সব কিছুর বিনিময়ে।’

‘তুমি কিন্তু রহস্যের কথা বলছিলে!’

আপনি বুকে হাত রেখে শুনুন তাহলে। দু’জন ধনাঢ্য লোকের মেয়েকে আপনারা বলীদানের জন্যে নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু টাকার বিনিময়ে তাদের ছাড়িয়ে নিয়েছে তার অভিভাবকরা। আমার স্বামী অনেক বড় ব্যবসায়ী। সে ধর্মের একটি বিধানই শুধু জানে যে, একজন মুসলমান একসাথে চারটি বিয়ে করতে পারে। তার ওঠাবসা, চলাফেরা সবই হিন্দুদের সাথে। তাই আমিও আমার ধর্মকে একপাশে রেখে দিয়েছি। এখন আপনিও আপনার ধর্মকে দরজার বাইরে রাখুন। সোনার মুদ্রাগুলো গুনে বুঝে নিন, আমার কথামতো কাজ করুন। আরও কিছুর চাহিদা থাকলে তাও বলুন।

পণ্ডিত সুযোগের সদ্ব্যবহারে স্মিত হেসে বললো, এতো অধৈর্য হচ্ছো কেন তুমি!

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হবো যে, আমার কাজ হবে এবং আমার সাথে কোন ধরনের প্রতারণা করা হবে না!'

'আমি সেই মেয়েটিকে তোমার পথ থেকে দূরে সরাতে চাও, তাই না?' পণ্ডিত মাদকাসক্ত লোকের মতো বলল। ঠিক আছে তোমার পথের কাঁটা সরে যাবে।

'যদি তার মা-বাবাও আপনার হাত ভরে টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে কি হবে?'

'সেটিই হবে, যা তুমি চাচ্ছ।'

মন্দিরের শাঁখার বাজনা বন্ধ, ঘণ্টাও স্তব্ধ। ঋষি নিজের বিছানায় আর ইমরান তার ঘরে গভীর ঘুমে সচেতন। হয়তো একে অন্যকে স্বপ্নে দেখছে। তারা মিলনের নেশায় ঘুমের গভীরে শিহরিত হচ্ছে। কিন্তু এদিকে রাতের আঁধারে জামিলা ও পণ্ডিতের সমঝোতায় তাদের অমলিন ভালবাসা সোনা ও কামনার দামে কেনা বেচা হয়ে গেল।

পরদিন বেলা ওঠার পর একটু দেরী করে ইমরান কাজে যাওয়ার জন্যে ঘর থেকে বের হল। জামিলার স্বামীর হাভেলীর সামনে দিয়েই তার রাজবাড়ি যাওয়ার পথ। হাভেলী অতিক্রম করতে যাবে তখন চাপাস্বরে কে যেন তাকে ডাকল। পিছনের কাউকে না দেখে উপরের বারান্দার দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল জামিলা। চোখাচুখি হতেই জামিলা বলল, 'ইমরান! তোমার ওয়াদা মনে থাকে যেন।' ইমরানের দৃষ্টিতে জামিলার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন গোচরীভূত হলো না।

গা জ্বলতে লাগল ইমরানের। কিছু না বলে নীরবে চলতে লাগল সে। রাজমহলে গিয়ে প্রথমেই সে কাসেম ও নিজামের ঘরে গেল। ঘরের বাইরে ছাড়া ভেতরে তাদের হাঁটা-চলায় কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। রাজা তাদের কাছ থেকে যুদ্ধ জয়ের কৌশল উদঘাটনের জন্যে হাত-পা বেঁধে ওদের কয়েদখানায় না রেখে মুক্ত কক্ষে নজরবন্দী করে রেখেছিল। তাদের খাতির-যত্ন ছিল রাজমেহমানদের মত। ইমরান এদের মুক্ত করার চিন্তায় বিভোর। ইমরান তাদের বলেছিল, তারা যেন রাজাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আস্থাভাজন হয়ে ওঠে, যাতে করে রাজা তাদের কথা বিশ্বাস করে তাদের ঘরের কাছ থেকে প্রহরা তুলে নেয়।

নিজাম ও কাসেম রাজাকে বিভ্রান্ত করার কৌশল ঠিক করে রেখেছিল। তারা রাজাকে এই প্রস্তাব দেয়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছে যে, রাজাকে তারা প্রস্তাব করবে, তারা রাজার সেনাবাহিনীতেই থেকে যেতে চাচ্ছে। গজনী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ের জন্যে নিজেদের সব অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা শক্তিশালী এক সেনা ইউনিট গড়ে তুলবে।

কিন্তু রাজা জয়পাল লাহোর থেকে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরের নেশায় রাজা পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশী রাজাদের কাছ থেকে সৈন্য সাহায্য আর নতুন সৈন্য রিক্রুটের কাজে সে এতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, বন্দীদের সাথে যুদ্ধকৌশল নিয়ে বিস্তারিত মত বিনিময়ের অবসর তার ছিল না। যে কোন মূল্যে গজনীর পতন ঘটানোই ছিল জয়পালের লক্ষ্য।

সেদিনও ইমরান তাদের কামরায় গিয়ে রাজাকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের মুক্ত করার পথ সুগম করার পরামর্শ দিল। সে যখন বন্দীদের মুক্ত করতে তৎপর ঠিক সেই সময়ে তার ভালবাসার ময়নার উপর শুরু হয়েছে হায়েনার আক্রমণ। পণ্ডিতের সাঙ্গপাঙ্গরা মৃত্যু-বিভীষিকা হয়ে দেখা দেয় ঋষিদের উপর।

রাতেই ঋষিকে ছিনতাই করে বলীদানের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছিল জামিলা। ঋষি নিজের ঘরেই ছিল। বাড়ির সব কিছু অন্য দিনের মতই ছিল স্বাভাবিক। এমন সময় ঘণ্টা ও শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। বাড়ির বাইরে ঢাক-ঢোলের বাজনা শোনা গেল। কানে ভেসে এল অনেক মানুষের কলরব। গলির ভেতরে পলায়নপর নারী-কিশোরীদের ভয়ার্ত চাপা কথাও ভেসে আসল। বাচ্চাদের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিলো। ঋষিও তো ছোট্টই। সেও তামাশা দেখার জন্যে দরজা দিয়ে উঁকি মারল। মিছিল গলির মধ্যে এসে পৌছেছে। মিছিলের অগ্রভাগে বড় মন্দিরের বড় পণ্ডিত। তার হাতে ছোট্ট একটি ঘণ্টি। সেটিকে বাজিয়ে বাজিয়ে সে আসছিল গলির ভিতরের দিকে।

বড় পণ্ডিতের পিছনে চার-পাঁচটি পালকি। অন্যান্য পণ্ডিত শিঙা ও ঘণ্টি বাজাতে ব্যস্ত ছিল। তাদের পিছনে সাজানো একটি পালকি বহন করছিল চার বেহারা। পণ্ডিত গুনগুনিয়ে ভজন গাইছিল। তাদের পিছনে বিরাট মিছিল।

ঋষি গলির মধ্যে না নেমে তাদের দরজায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলো। বড় পণ্ডিত তার সামনে এসে দাঁড়াল, তার নাম জিজ্ঞেস করল। পণ্ডিতের নাম জিজ্ঞাসায় ঋষি ভড়কে গেল। তার মনে পড়ল, তার ভাই ও বাবা তাকে পণ্ডিতদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্যে শত বায়না ধরলেও তাকে কোন দিন মন্দিরে যেতে দেয়া হয়নি। সে তার নাম বলল না।

ওর নাম ঋষি। অচেনা একটি কণ্ঠ ভেসে এল। ঋষির ভাই-বাবা-মা সবাই বেরিয়ে এসেছিল। ঋষি পিছনের দিকে সরে যেতে চাচ্ছিল। পণ্ডিতের চেহারায় বিস্ময় ও আনন্দ খেলা করছিল। ঋষি তার ধারণার চেয়েও অনেক স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী।

'ইন্দ্রদেবী একেই প্রার্থনা করেছেন।' বলল পণ্ডিত।

'না-না মহারাজ!' চিৎকার দিয়ে পণ্ডিত ও ঋষির মাঝে এসে দাঁড়াল ঋষির মা। আপনারা যে মেয়েকে তালাশ করছেন আমার ঋষি সেটি নয়। ঋষি দরজা থেকে ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। এক পণ্ডিত এগিয়ে এসে তার হাত ধরে ফেলল। বড় পণ্ডিত পালকি আনার জন্যে হুকুম দিলে পালকি এনে বেহারারা দরজায় দাঁড়াল।

এ নির্দেশ দেবী ও রাজা উভয়ের। ইন্দ্রদেবী যে কুমারীকে চান, সেই কুমারী কারো ঘরে থাকলে সেই ঘরে সকল দেব-দেবীর অভিশাপ হতে থাকে। ওকে দেবীর জন্যে উৎসর্গ না করলে যে মা তাকে জন্ম দিয়েছে সেই মার কুষ্ঠ হয়ে সারা এলাকা ধ্বংস করে দেবে।

এই মেয়ে তোমাদের নয়। সে দেবীর আমানত। তাকে আমরা নিয়ে যাব। ঋষিকে টেনে হেঁচড়ে পালকিতে তোলা হল। সে চিৎকার করে হাত-পা ছুঁড়ে মুক্ত হতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। পণ্ডিতদের সাথে আসা এক লোক রুমালের মতো এক প্রস্থ কাপড় দিয়ে ঋষির নাক-মুখ মুছে দিল। ঋষি একটু কেঁপে উঠে নীরব হয়ে গেল। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। তাকে পালকিতে ভরে দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। শাঁখা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ভজন গাইতে গাইতে ফিরে গেল পণ্ডিতেরা। মিছিলের লোকেরা মন্দির ও দেব-দেবীর জয়ধ্বনি করল। মহল্লার মানুষ ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেল। কানা-ঘুষা ও ফিসফিসানি শুরু হলো গলির লোকদের মুখে।

মহল্লার কিছু লোক ঋষির মা-বাবাকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ দিতে লাগল— দেবী তাদের মেয়েকে কবুল করেছে এই সৌভাগ্যের জন্যে। হিন্দু ধর্মের গোড়া ভক্তরা ঋষির মা-বাবাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখছিল— দেবীর পছন্দনীয় পরিবার বলে। কিন্তু যাদের কলজের টুকরো মেয়েটিকে পণ্ডিতেরা জবাই করতে নিয়ে গেল, এদের মনের অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা কারোরই মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। মা-বাবার কানে তখনও ভেসে আসছিল ঋষির করুণ আর্তনাদ, বাঁচার আকুতি। কিছুদিন আগে তাদের অপর মেয়েটির জ্বলন্ত দগ্ধ হওয়ার দৃশ্য ও তার কান্না এখনও তারা ভুলতে পারেনি– সেই শোকের ধকলে এখনও গোটা পরিবার

বিধ্বস্ত। এর উপর একমাত্র চোখের মণি তরুণী মেয়েটিকেও পণ্ডিতেরা জবাই করতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঋষির মা-বাবার মনের অবস্থা যদি হিন্দুরা বুঝত তাহলে হয়তো পণ্ডিত আর মহল্লার লোকদের মধ্যে শুরু হয়ে যেতো তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু মূর্খ এই লোকগুলো পণ্ডিতদের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় এতই মত্ত যে, দেবী মেয়েটি গ্রহণ করেছে— এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল।

সন্ধ্যায় ইরমান ঘরে ফেরার একটু পরই জগমোহন তার ঘরে প্রবেশ করে। বসেই কান্নায় ভেঙে পড়ল মোহন। সে বলল, ঋষিকে পণ্ডিতেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। অভাবিত এই দুঃসংবাদে ইমরানের অবস্থাও শোচনীয়। তার বুক ভারী হয়ে এলো। মোহন আরো বলল, কে জানি পণ্ডিতদের বলেছে, ঋষি মন্দিরে যায় না। বলীর জন্যে সেই উপযুক্ত।

তোমরা কি খবর নিতে পারবে ওকে কোথায় রাখা হয়েছে এবং কখন তাকে বলী দেয়া হবে? এ খবরটি জানতে চেষ্টা কর মোহন! আমি তাকে বাঁচানোর সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করব। বলল ইমরান। সম্ভবত বড় মন্দিরেই ওকে রাখা হয়েছে। আমরা কখনও এমন শুনিনি যে, কোন কুমারীকে ধরে নিয়ে সাথে সাথেই বলী দেয়া হয়েছে। পণ্ডিতেরা সেই কুমারীকে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণে রাখে, তাকে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দেয়, পাক-ছাফ করে। জানা নেই আরো কি কি আমল করে। এক পর্যায়ে কুমারী নিজেই বলতে থাকে, 'আমাকে দেবীর চরণে বলী দাও, উৎসর্গ করে দাও।' আমি জানতে চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে না ইমরান! ছিনিয়ে আনলেও ওকে আবার ওরা নিয়ে যাবে। এটা করতে গিয়ে আমাদের সাথে তোমার জীবনেও বিপদ নেমে আসবে। এই বলে সে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। নিজেকে সামলে বলল মোহন, এদেশ ছেড়ে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মেছে।

"তোমাদের ধর্মে অনাচার ছাড়া আর কিই-বা আছে? ভগবত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত তোমাদের ধর্মীয় কিতাবাদি পড়ে দেখ, এসব কিতাবে প্রবৃত্তির দাসত্ব আর বর্বরতার কাহিনীই লেখা আছে। এসব ধর্মীয় পুস্তকে ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দেব-দেবীর রমণক্রিয়া চিত্রায়িত করে দেখানো হয়েছে এসব গ্রন্থে। মেয়ে ও শিশু হত্যাকেও বৈধতা দেয়া হয়েছে।

তোমার বোনকে যদি সাথে সাথে হত্যা করা হয় তবে ভাল। আমি জানি ও যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ পণ্ডিতেরা কত পাশবিক ব্যবহার করবে ওর সাথে। জগমোহনের চোখ কপালে উঠে এলো। ওর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল।

হুঁ, তোমরা এসব কাদা-মাটি আর পাথরের মূর্তির পূজা কর। এগুলোর মুখোমুখি হতেও তোমরা ভয় কর। আমি মুসলমান। এসবে আমার কোন ভয় নেই। আমি যদি তোমাদের দেবদেবীর আখড়া থেকে তোমার বোনকে উদ্ধার করতে পারি তবে কি তোমরা আমার সাথে যাবে?

কোথায়?

সেটা তখনই বলা যাবে। তবে তোমাদেরকে আমার ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। বলল ইমরান।

হ্যাঁ, আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমি তোমাকে শপথ করে ওয়াদা দিচ্ছি, তুমি আমাদেরকে এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চল, তাহলে আমরা তোমার ধর্ম গ্রহণ করব এবং ঋষিই হবে তোমার বধূ। বলল মোহন।

এই লোভে আমি ঋষিকে উদ্ধার করতে যাবো না যে, তোমরা ঋষিকে আমার হাতে তুলে দিবে। আমার লক্ষ্য এটাই— আমি উদ্ধার অভিযানে তোমাদের দেব-দেবীদের পরাভূত করতে চাচ্ছি।

আমি বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এজন্য আমি জীবনবাজী রাখতে প্রস্তুত। আমি তোমাদের রাজাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, কাদামাটি আর পাথরের দেবতারা মাটি আর পাথর ছাড়া আর কিছু-ই নয়। মুসলমানদের নিকট এগুলো নিতান্তই পাথরের স্তুপ। তুমি নিশ্চিন্তে গিয়ে ঘুমাও মোহন। ঋষির মুক্তির ব্যাপারটি আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম।

জগমোহন চলে গেল। ইমরানের দিকে আগ্নেয়গিরির মতো যন্ত্রণার লাভা উদ্‌গিরণ শুরু হল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইমরানের মধ্যে প্রতিশোধ ও কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের ঝড় সৃষ্টি করল। দ্রুত বন্দী দু'জনকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল ইমরান। বন্দী দুজনকে মুক্ত করার গুরুত্বটা হলো, যদি রাজা রাজমহলের অসংখ্য সুন্দরী রক্ষিতার একটিকেও ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দেয়, তবে নারীর কাছে ফেঁসে গিয়ে ওরা স্বজাতি ও দেশের কথা ভুলেও যেতে পারে। ভুলে যেতে পারে সৈনিকের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা। ফলে ওরা জাতিধ্বংসের কারণ হতে পারে। এরা নারী ও অর্থের ধোঁকায় পড়ে এবং রাজার ধন-সম্পদ ও খাতির-যত্নে ভুলে গিয়ে গজনীর মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্যে বিরাট হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। ইমরান বন্দীদের মুক্ত করার বিষয়টির খুঁটিনাটি চিন্তা করছিল। এদিকে ঋষিকে ছিনতাইয়ের ঘটনা তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিল। সে ঋষিকে ইতোমধ্যে মনের মানসীরূপে হৃদয়ে জায়গা দিয়ে ফেলেছিল। উভয় সংকেটর

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ইমরান। পরিকল্পনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাথা গরম হয়ে গেলো তার। নিজের ঘরে আবেগ, উত্তেজনা আর প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে উঠছিল বারবার। শুধু দায়িত্ববোধ ও প্রেমঘটিত ব্যাপার নয়, গোটা পরিস্থিতিটাকে সে আল্লাহর একক সত্তা ও মনুষ্যসৃষ্ট মূর্তির মধ্যে চিরায়ত সংঘাতের রূপ দিল। এই চ্যালেঞ্জকে সে গ্রহণ করল ঈমানের দাঁড়িপাল্লায় মেপে কঠিন চ্যালেঞ্জরূপে। যে করেই হোক পরিস্থিতির মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সে দৃঢ় পতিজ্ঞাবদ্ধ।

একাকী ঘরে সে ছাদের দিকে তাকাল। মনের অজান্তেই আল্লাহর জন্য তার দু'হাত উঠে এলো। কায়মনোবাক্যে দু'আ করল ইমরান। তার দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দু'চোখে অঝোর ধারায় অশ্রু বইতে লাগল। নিজের অজান্তেই তার মুখে উচ্চারিত হলো, 'খোদায়ে যুলজালাল! আমি যা কিছু করছি আপনার বান্দাদের ইজ্জত ও মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে করছি। আমাকে শক্তি, সাহস ও তৌফিক দিন। আমাকে এ সব মিথ্যা ভূতপূজারীদের কর্মকাণ্ডে ধৈর্য ধারণ ও বিজয়ী হওয়ার তৌফিক দিন। আপনি ও আপনার মনোনীত ধর্ম সত্য, ইসলাম সত্যের পথ, সত্যপন্থীদের পথ। আমাকে এই সত্যকে এই জমিনে প্রমাণ করার তৌফিক দিন।

আয় আল্লাহ! আমার মনে কোন গুনাহর ইচ্ছে নেই। গুনাহ করার ইচ্ছে থাকলে জামিলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতো না। আপনি তো দেখছেন, এই সুন্দরী নারী আমাকে কতো কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিল। আমি আপনার দয়ায় এই কঠিন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছি।

আয় প্রভু! আমাকে পথ দেখান, আমাকে সাহায্য করুন। আমি যদি নিজের নফসের জন্য কিছু করে থাকি তবে আমাকে মৃত্যু দিন! আপনার পবিত্র নামের দোহাই, আপনার নামের ইজ্জত বুলন্দির জন্যে অধমকে কবুল করুন।'

মোনাজাত শেষে চোখে মুখে হাত বুলাল ইমরান। তার মাথা থেকে বিরাট দুশ্চিন্তার বোঝা যেন নেমে এল। স্বস্তিতে স্থির ও অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকল কতক্ষণ। হঠাৎ বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে সে ঘরের বাক্স খুলে একটি খঞ্জর বের করে আস্তিনে পুরে নিল এবং বাক্স বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে পড়ল।

ইমরানের চলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, তার পা স্বয়ংক্রিয় উঠছে নামছে। সে ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেছে। সে গলির শেষ মাথায় গিয়ে মোড় নিতে গিয়ে

দেখল, এখানে কোন মোড় নেই, পথই শেষ হয়ে গেছে। পিছনে ফিরে সে ঘন বনবীথির মাঝ দিয়ে চলতে চলতে গাছের সাথে ধাক্কা খেল। সম্বিত ফিরে আবার উল্টো পথে চলতে শুরু করল। এক পর্যায়ে ইমরান মাথার পাগড়ী খুলে মাথা ও চেহারা এমনভাবে পেঁচিয়ে বেঁধে নিল যে, এখন তাকে দেখে কারো পক্ষে চেনার কোন উপায় নেই। দুটো চোখ ছাড়া আর কিছুই অবমুক্ত নয়। ইমরান ছিল পেশাদার গোয়েন্দা। শহরের সব অলিগলিই তার চেনা। গোয়েন্দাদের প্রথম কাজই থাকে আবাসন ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা। ইমরান মন্দিরের দিকে রওয়ানা হয়। মন্দিরের কোথায় কি তা ইমরানের মুখস্থ। সে চুপিসারে প্রধান ফটক পেরিয়ে প্রধান পণ্ডিতের ঘরের দিকে গেল। তার ধারণা ঋষিকে এখানেই রাখা হয়েছে।

থমকে দাঁড়াল ইমরান। ভাবল, ঋষিকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারলে এখান থেকেই পেশোয়ারে চলে যাবে আর ঘরে ফিরে যাবে না। কিন্তু পা বাড়াতেই কোন অদৃশ্য শক্তি যেন থামিয়ে দিল তাকে। নিজাম ও কাসেমের কথা তার মনে পড়ল। মনে একথাও উদয় হলো, ঋষিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু যে জাতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সে এখানে দীর্ঘ দিন যাবৎ সফলতার সাথে কাজ করছে এখন এভাবে চলে গেলে দায়িত্বে চরম অবহেলা হবে, বিশেষ করে নিজাম ও কাসেমের মুক্তি অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই সাথে রাজার গতিবিধি সম্পর্কেও সুলতান আগাম কোন সংবাদ পাবেন না আর।

চিন্তায় তার শরীর ঘেমে ওঠে। ধীরে ধীরে সর্পিল গতি ও সতর্কে বড় পণ্ডিতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ইমরান। ইমরানের মনে হলো, আবেগ তাড়িত হয়ে কিছু করা তার ঠিক হবে না, তাকে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

বিড়ালের মতো অতি সন্তর্পণে বড় পণ্ডিতের ঘরের কাছে চলে গেলো ইমরান। এলাকাটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইমরান বড় পণ্ডিতের ঘরের অতি কাছে চলে গেল। দরজা থেকে একটু আগে দাঁড়িয়েছে ইমরান। এমন সময় পণ্ডিতের দরজা খুলে গেল। ভিতরের আলো দরজার ফাঁক গলিয়ে বাইরে পড়ল। এই আলোতে দেখা গেল, ভেতর থেকে একজন মহিলা বের হচ্ছে, সাথে বড় পণ্ডিতও বের হল। জায়গাটি ছিল ঝোপঝাড় ও ঘন গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ। সে দ্রুত একটি ঝোপের আড়ালে চলে গেল। পরিষ্কার দেখতে পেল, মহিলাটি আর কেউ নয় জামিলা।

'এখন নিশ্চিন্ত থাক, তোমার কাজ হয়ে গেছে' বলল পণ্ডিত।

'এখানে আমি ওকে দেখতে পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। দেখলেন তো আপনার চাহিদা মতো আমি আপনার প্রাপ্য উসুল করেছি।' বলল জামিলা।

'এরপরও তুমি সন্দেহে ভুগছো। ওকে এখানে রাখা সম্ভব নয়। তাকে টিলার উপরে অবস্থিত মন্দিরে পৌঁছে দিয়েছি। তুমি চাইলেও আমি ওকে আগামীকালই বলী দিতে পারব না। আমাদের অনেক রীতিনীতি আছে। এগুলো পালন করতে হবে। এটাই তো প্রথম নয়। আমার জীবনে আমি চারটি কুমারী আর দুটি শিশু বলীদান করেছি। এই মেয়েকে অন্তত এক চাঁদ আমরা টিলার মন্দিরে রাখব। তাকে এভাবে তৈরি করব, তার বলাচলা সব বদলে যাবে। রঙ ঢঙে পরিবর্তন ঘটবে। এক সময় সে নিজে থেকেই বলতে থাকবে- "আমাকে দেবীর চরণতলে বলি দিন"। সে তার মুখেই বলীদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবে। আমি তোমার উদ্দেশ্য সাধন করে দিয়েছি। সে আর তোমার পথের কাঁটা হতে আসবে না। যাও মাঝে মধ্যে এখানে এসো।'

'উদ্দেশ্যের মাত্র অর্ধেক আমার পূরণ হয়েছে।' বলল জামিলা।

বাকীটাও পূর্ণ করে দেব। বলল পণ্ডিত। তোমাকে এমন জিনিস দেব, সে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। একা যেতে পারবে, না কিছুদূর এগিয়ে দেব?

"না। এগিয়ে দিতে হবে না। একাই যেতে পারব।"

খুব কাছে থেকে জামিলা ও পণ্ডিতের সংলাপ শুনছিল ইমরান। একটি ঝোপের আড়াল ছাড়া তাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল খুবই কম। ইমরানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ঋষিকে জামিলাই পণ্ডিতের হাতে তুলে দিয়েছে। এ কাজ করতে জামিলা পণ্ডিতকে কি বিনিময় দিয়েছে তাও বুঝতে বাকী রইল না তার।

জামিলা ইমরানের পাশ দিয়ে চলে গেল। গাছের মতোই দাঁড়িয়ে রইল ইমরান। পণ্ডিত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পণ্ডিত দরজা বন্ধ করতেই জামিলার পিছু নিল ইমরান। জামিলার ধৃষ্টতা আর দুঃসাহসের জন্যে আশ্চর্য হলো ইমরান। ঘন বৃক্ষঘেরা চত্বর পেরিয়ে নির্বিকার চিত্তে বাড়ি ফিরছে জামিলা। ইমরানের ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে এখনই হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু নিজের ক্ষোভ রাগ নিয়ন্ত্রণ করে জামিলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। কাছে পৌঁছতেই পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ভয়ে থমকে দাঁড়াল জামিলা।

"তোমার অপূর্ণ আশা পূর্ণ হবে না জামিলা! তোমার পথের কাঁটা মনে করে নিরপরাধ একটি মেয়েকে জীবন্ত মেরে ফেলতে যে ভয়ঙ্কর চক্রান্ত তুমি করেছো, এর শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে।"

উহ্! আমি তো ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। ভয়ার্তকণ্ঠে বলল জামিলা।

কোথাও গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ! যেখান থেকে তুমি ফিরছো আমিও সেখান থেকেই ফিরছি।

জামিলা! এখন ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি। তোমাকে গায়েব করে দিতে পারি। তোমার স্বামীকে তোমার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানিয়ে দিতে পারি। তুমি কি মনে কর, এসব করে তুমি আমাকে বশে আনতে পারবে?

জামিলা নীরব। ভয় শঙ্কায় তার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছিল না।

বল! আমার কথার জবাব দাও, জামিলা!

একটা হিন্দু মেয়ের জন্যে তুমি এতটাই পাগল হয়ে গেলে? অনেক কষ্টে শরীরের সব শক্তি দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল জামিলা।

আমার কথা শোন! যদি দ্বিতীয়বার আর কোন দিন তুমি এই মন্দিরের দিকে পা বাড়াও তাহলে তোমার টুকরোটাও কেউ খোঁজে পাবে না। আর কোন দিন আমাব ঘরে ঢুকলে তোমাকে জ্যান্ত করব দিয়ে ফেলব। শোনে রাখ, মন্দির থেকে ফেরার পথে তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছে, একথা পণ্ডিত কিংবা অন্য কেউ জানতে পারলেও কিন্তু তোমার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে।

"এই সব কিছুই তো আমি করেছি তোমাকে পাওয়ার জন্য।" বলে ইমরানের পা জড়িয়ে ধরল জামিলা। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, "তোমার মধ্যে আমি জীবনের সুখ দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। ভেবেছিলাম, এই হিন্দু মেয়েটাকে সরিয়ে দিলে তুমি সম্পূর্ণ আমার হয়ে যাবে। মনে হয়েছিল, এই হিন্দু মেয়েটিকে তুমি বিনোদনের সঙ্গী হিসেবেই কেবল কাছে পেতে চাচ্ছো। ভাবতে পারিনি তুমি ওকে এতোটা ভালবাসো, ওর জন্যে তুমি এতোটা পাগল।"

"এখান থেকে যাও! দূর হও!"

"আমাকে মাফ করে দাও ইমরান!" ডুকরে কেঁদে উঠল জামিলা। পা জড়িয়ে থেকেই বলল, একটা হিন্দু মেয়ের জন্যে অসহায় এই মুসলমান অবলার মন ভেঙে দিও না। অসহায়ের প্রতি একটু দয়া কর।

"মজলুম নও বড় জালেম তুমি।" একথা বলে রাগে ক্ষোভে পা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য জামিলাকে ধাক্কা দিলে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল জামিলা। ইমরান বলল, "আমি মাফ করলেও খোদা তোমাকে মাফ করবে না। ধুকে ধুকে তোমাকে মরতে হবে। এই অপরাধের শাস্তি তোমাকে ভুগতেই হবে। জীবনে

কোন দিন তুমি শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না। ন্যাংটা হয়ে রাস্তায় চিল্লাবে আর কেঁদে কাটাবে।"

ছিটকে পড়া জামিলাকে হাত ধরে টান দিয়ে বসিয়ে দিল ইমরান। কালবিলম্ব না করে রওয়ানা হল ঘরের দিকে। একটু অগ্রসর হতেই জামিলার চিৎকার ভেসে এলো। সেই সাথে শুনতে পেল জামিলার ডাক ... ইমরান! ইমরান!

দাঁড়াল ইমরান। পরি মরি করে দৌড়ে এসে ইমরানের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কবুতরের বাচ্চার মতো ভয়ে কাঁপছিল জামিলা। ধরা গলায় বলল, আমাকে বাড়ি পৌছে দাও ইমরান! আমার ভয় করছে। আমি যেতে পারব না। আগুনের মতো কি একটা দেখেছি সামনে– হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছে আবার নিভে গেছে। তুমিও কি কোন আলো দেখেছিলে? আকাশে কোন বিজলি চমকায়নি তো?"

"কোন নারীকে ভয় দেখানো আমার রুচিবিরুদ্ধ। এখানে তোমাকে একা ফেলে রেখে যেতেও বিবেকে বাধছে। কিন্তু জেনে রেখো, নিরপরাধ মেয়েটির প্রতিটি রক্তের ছিটা তোমার জন্য ভীতিকর বিজলীর মতো চমকাবে, ওর মৃত্যুর আওয়াজ তোমার মাথায় বজ্রাঘাতের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে দেখা দিবে। মৃত্যু তোমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে, কিন্তু তুমি মরতে পারবে না।"

"আমার ভয় করছে!" ইমরানকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আবার পড়ে গেল জামিলা। কোন মতে উঠতে উঠতে বলল, আমাকে বাড়িতে পৌছে দাও। আমাকে একা ফেলে গেলে এখানেই মরে যাবো। আমার উপর একটু দয়া কর ইমরান!

চল!

জামিলার বাড়ির দিকে রওয়ানা হল ইমরান। জামিলা লাফিয়ে উঠে ইমরানের বাহু ঝাপটে ধরল। ইমরানের বাহু শক্ত করে ধরে এদিক ওদিক টলতে টলতে কোন মতে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত পৌছল জামিলা। পথে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়ে ইমরানকে ঝাপটে ধরে রেহাই পেয়েছে। দেয়ালের কাছে পৌছে ইমরান থেমে গেল।

"আমি কী করব ইমরান!" জামিলা এভাবে উচ্চারণ করল যেন ঠাণ্ডায় দাঁতে খিল ধরে গেছে তার।

"পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর!"

"কী ভাবে?"

কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবে সময় এলে বলব। এখন যাও।

ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল ইমরান।

পরদিন প্রতিদিনের মতো কাসেম ও নিজামের জন্যে সকালের নাশ্তা নিয়ে গেল ইমরান। রাজ মহলের গেটে পা দিয়েই সে বুঝতে পারল, রাজা প্রাসাদে ফিরেছে। একটু পরেই রাজার ফরমান এলো। রাজ মহলে ডাক পড়েছে কয়েদীদের। কাসেম ও নিজাম রাজার চাহিদা অনুধাবন করে মাহমূদের যুদ্ধ জয়ের ভুল চাল রাজার সৈনিকদের শিখিয়ে দেয়ার নাম করে রাজাকে আশ্বস্ত করে ফেলল। তারা বললো, তাদেরকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে তারা তাদের যোগ্যতা ও কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখবে। রাজা এদের কথা বিশ্বাস করে তাদের অনুরোধ মতে কামরার বাইরে থেকে পাহারা তুলে নিল।

কাসেম ও নিজাম তাদের কক্ষে ফিরে এসে ইমরানকে জানাল, রাজা বলেছে, সুলতান ইন্তেকাল করেছেন। বর্তমানে তার ছেলে মাহমূদ ক্ষমতাসীন। রাজার কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, খুব তাড়াতাড়ি তারা গজনী আক্রমণ করতে চাচ্ছে। সুলতানের মৃত্যুতে রাজা গজনী বিজয়ের খুবই আশাবাদী। সে ভাবছে, খুব সহজেই মাহমূদকে পরাজিত করতে পারবে। সুলতানের মৃত্যু সংবাদ এদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। বেশি ভাবনার বিষয় হলো, সুলতানের অবর্তমানে গজনী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে কে থাকবে? কাসেম ও নিজাম মাহমূদকে মাত্র দু'তিন ডিভিশন সৈন্যের কমাণ্ড দিতে দেখেছে। কয়েকটি যুদ্ধে বাবার সহযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করতে দেখেছে। মাহমূদ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না— সেনাপতির কমাণ্ড সামলানোর কতটুকু যোগ্যতা রাখেন তিনি। তিনি কি তার পিতার মতো অল্প সংখ্যক সৈন্য দিয়ে বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবেন? এ সংবাদ শোনার পর তাদের কাছে এখান থেকে ফেরার হয়ে জলদি সুলতান মাহমূদকে রাজার সৈন্যবল ও আক্রমণ প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করাটা অত্যন্ত জরুরী মনে হয়েছে।

এদিকে ইমরান তাদেরকে বলেছিল, ঋষি নামের যে হিন্দু মেয়েটি মুসলমান হয়ে তার সাথে গজনী চলে যেতে আগ্রহী ছিল তাকে ইতিমধ্যে পণ্ডিতেরা বলীদানের জন্য ধরে নিয়ে গেছে। ইমরান তাদের একথাও বলেছে, তাদের দু'জনকে এখান থেকে মুক্ত করে ওই মেয়েটিকেও সে মন্দির থেকে মুক্ত করে গজনী নিয়ে যাবে। বিষয় দু'টিকে সে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে।

ওদের কক্ষের বাইরে থেকে পাহারা তুলে নেয়ায় সে রাতেই এদের ফেরার করানোর সংকল্প করল ইমরান।

অন্য দিনের চেয়ে আজ রাতের খাবার অনেক বিলম্বে নিয়ে এলো ইমরান। কিছুক্ষণ বন্দীদের এখানে কাটিয়ে রাতের বেলা থালা-বাটি নিয়ে সে রাজমহলের প্রহরীদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, ইমরান রাতের খাবার দিয়ে আর বাসায় যায়নি।

দৃশ্যত প্রহরীদের সামনে দিয়ে রাজমহল ত্যাগ করলেও সে ঘরে ফিরেনি। রাজবাড়ির গেট পেরিয়ে পিছনের দিকের বাগানে চলে গেল ইমরান। রাজবাড়ির পিছনে বিরাট বাগান। গাছ-গাছালিতে ভরা। নানা রঙের ফল-ফুলের ছোট বড় অসংখ্য গাছ। ঘন বৃক্ষের ছায়ায় রাজবাড়ির পেছন দিকটা অন্ধকার। রাতে ওদিকটায় কেউ যায় না। গা ছম ছম করে। নিশাচর পাখি, হুতুম পেচার ডাক ও জংলী পশুদের চেচামেচি শোনা যায়। দেয়ালের বাইরে ওই জঙ্গলের দিকে রাতের অন্ধকারে একাকী আলো ছাড়া পা বাড়ানোর সাহস ইমরানের থাকলেও কোন পৌত্তলিকের নেই। নির্ভয় চিত্তে ইমরান জঙ্গলের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

রাজবাড়ির প্রাচীর ঘেঁষেই বাগান। প্রাচীর খুবই উঁচু। কোন অবলম্বন ছাড়া কারো পক্ষে লাফ দিয়ে দেয়ালের উপর উঠা অসম্ভব। দিনের বেলায় একটি জানালার ফাঁক দিয়ে কাসেম ও নিজামকে দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, ওখান দিয়ে দেয়ালের উপর উঠা সম্ভব। ওখানে গাছের ডাল ঝুলে একেবারে দেয়ালের উপরে এসে পড়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে নিজাম ও কাসেম ঘর থেকে বের হয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে চুপিচুপি পালানোর জন্যে এগুতে লাগল। সন্ধ্যা নামতেই রাজমহলের কর্মচারীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। আর এদিকে মহলের অভ্যন্তরে রাতের অন্ধকার নিয়ে এসেছে আমোদ ফুর্তির আবেশ। আশ-পাশের রাজ-রাজাদের আগমনে রাজমহলের আলোকসজ্জা বেড়ে গিয়েছে। ঘোড়ার গাড়ী হরদম প্রাসাদে ঢুকছে। বাদকদল অতিথিদের স্বাগত জানতে বাজনা বাজাচ্ছে। নাচঘরের সাজসজ্জা শুরু হয়েছে। টুংটাং নর্তকীদের ঘুঙুর পায়ের নূপুর আর ঢাক-ঢোলের আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। দাসদাসীদের হুল্লোড়ও ভেসে আসছে মাঝে মধ্যে। অতিরিক্ত মশালের আলো বেলায়ুরী ও আওরিযীর জন্যে কাল হয়ে দেখা দিল। সোজা পথে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কেউ বন্দী হিসেবে তাদের শনাক্ত করতে পারলে আরো কঠিন প্রাচীরে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল তাদের। তবুও দু'চারজনের সামনে দিয়েই গোবেচারার মত প্রাসাদের অন্য অগন্তুকের মতো হাবভাব রেখে রাজপ্রাসাদের পিছনের দিকে যেতে লাগল।

অতিকষ্টে একটি দালানের আড়ালে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও মূল প্রাচীরের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হল। এরপর আন্দাজ করে খুব সতর্কতার সাথে দুটি ঢিল ছুড়ল আওরিযী। ইত্যবসরে দেয়ালের উপর থেকে একটি রশি ঝুলে পড়ল তাদের সামনে। দ্রুত রশি বেয়ে উভয়ে দেয়ালের উপরে উঠল। দেয়ালের বাইরে নীচ থেকে আওয়াজ দিল ইমরান- রশিটা দেয়ালের বাইরে ফেলে দাও। গাছ বেয়ে জলদি নেমে পড়। কাসেম ও নিজাম গাছের ডাল বেয়ে সহজেই নীচে নেমে আসল। ইমরান রশিটা পেঁচিয়ে থলের মধ্যে ভরে নিল। থলে থেকে দু'টা চোগা বের করে এগিয়ে দিল। তারা গলা থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত লম্বা চোগা গায় দিয়ে চলতে শুরু করল। অতি সতর্কতার সাথে রাজবাড়ির সীমানা পেরিয়ে এল। রাজ প্রাসাদের বাইরের জগৎ তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। নিজের ঘরে এদের নিয়ে এলো ইমরান।

"এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চলে যাওয়া উচিত।" বলল নিজাম। আচ্ছা, দুটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করা যাবে?

"এত তাড়াতাড়ি তোমরা এখান থেকে যেতে পারবে না।" বলল ইমরান। সকালে রাজা যখন তোমাদের ফেরার হওয়ার কথা শুনবে, তখনই চতুর্দিকে লোক পাঠাবে তোমাদের খোঁজে। অবশ্য না পাঠানোর সম্ভাবনাও আছে। দু'বারের পরাজয়ের গ্লানি রাজাকে অন্ধ বানিয়ে ফেলেছে। এখনও সে সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তায় বিভোর। অহর্নিশি ব্যস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে। আশপাশের সব হিন্দু রাজা দু'হাতে আর্থিক সহযোগিতা করছে। যুদ্ধব্যয়ের জন্যে রাজার ভাবতে হয়নি। কিন্তু বড় ভাবনা সৈন্য নিয়ে। প্রশিক্ষিত সৈনিকের বড়ই অভাব। অন্যান্য রাজা সৈন্য দিতে গড়িমসি করছে। এ জন্য রাজা দূরদূরান্তের রাজ্যগুলোতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে সৈন্য আনছে। এখানকার হিন্দুরাজাদের একটা জটিল নিয়ম হলো, কেউ পরপর দু'বার যুদ্ধে পরাজিত হলে ক্ষমতা উত্তসূরীর হাতে বুঝিয়ে দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। জয়পাল ইতিমধ্যে দু'বার পরাজিত হয়েছে। তার উত্তরসূরী তার ছেলে তাকে তৃতীয়বার যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে জয়পাল জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হতে পারে এসব ঝামেলার কারণে রাজার মধ্যে তোমাদের ফেরার হওয়ার ঘটনায় কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হবে না। অথবা তোমাদের ধরার জন্যে শহরে খানা তল্লাশী বা চতুর্দিকে লোকও লাগাতে পারে। কাজেই আগামীকাল রাজপ্রাসাদের প্রতিক্রিয়া দেখে এরপর আমি তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করব। এর আগে এখানেই তোমরা লুকিয়ে থাক।

নিজাম ও কাসেম ছিল পদস্থ সেনা। যুদ্ধের কলাকৌশলে তারা সিদ্ধহস্ত। রাজ্য ও রাজাদের কূটচাল-বোলের সাথে তারা কম পরিচিত। কিন্তু ইমরান চৌকস গোয়েন্দা। কূটচালে সিদ্ধ হস্ত। পরিকল্পনায় পটু। অপরদিকে নিজাম ও কাসেম রাতের গেরিলা আক্রমণে পারদর্শী। এরা আর ইমরানের চিন্তা-ভাবনায় তাই অনেক পার্থক্য। ইমরান অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। সে বলল, তোমাদের যদি কয়েকদিন এখানে লুকিয়ে থাকতে হয়, তবে চাচ্ছি, রাজার সৈন্য শিবিরে আমরা আগুন লাগিয়ে দিব।

এটাও কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়। এটা রাজার দ্বিতীয় হামলার আগেও হতে পরত। কিন্তু এখানে আমাদের যে দু'জন সৈন্য ছিল তারা একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে লড়াই করে মারা গেল। এজন্য আমরা আক্রমণও চালাতে পারিনি এবং সময় মতো সংবাদও পৌছাতে পারি নি যে, গজনী আক্রমণের মুখোমুখি।

"তুমিও তো এখন এক মেয়ের চক্করে পড়েছো।"

"তা ঠিক। কিন্তু আমি কর্তব্যকে প্রেমের ফাঁদে আটকাবো না। একটি মেয়ের জন্যে আমি গজনীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না। এজন্যে আমি তোমাদের হয়তো কুরবান করে দিতে পারি কিন্তু এর আগে যদি রাজা জয়পাল গজনী আক্রমণে বেরিয়ে পড়ে তবে গজনী থেকে দূরে পেশোয়ারেই যাতে গজনী বাহিনী তার সাধ মিটিয়ে দিতে পারে সে ব্যবস্থা আমি করব। সময় মতো সুলতানের কাছে খবর পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। এ নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।"

"চিন্তার ব্যাপার হলো, সুলতান মাহমূদ সেনাবাহিনীর কমাণ্ড করতে পারবেন কি-না। তাছাড়া তিনি প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলোর সাথে বিবাদেও জড়িয়ে পড়তে পারেন। সুলতানের অবর্তমানে সালতানাতে বিশৃঙ্খলাও দেখা দিতে পারে।" বলল কাসেম বলখী।

"গজনীর অবস্থা সম্পর্কে বর্তমানে আমরা একেবারেই বেখবর।" বলল নিজাম।

বাস্তবেও গজনীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। সুলতানের মৃত্যুতে প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলোর হিংসুটে শাসকরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সুলতানের জীবদ্দশায় এরা কখনও মথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। গজনীর প্রতি শ্যেনদৃষ্টিতে তাকানোর সাহসও পেত না যারা, সুলতানের অবর্তমানে গজনীর

প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ল তাদের। প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসকেরা সবাই মিলে গজনীর ক্ষমতা করায়ত্ত করার ফন্দি আঁটতে শুরু করল। কিন্তু সুবক্তগীন ক্ষমতালিপ্সু কপট মুসলিম প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। একান্তই দায়ে পড়ে যুদ্ধ করতে হলেও তিনি অগ্রপশ্চাৎ গভীরভাবে ভেবে নিতেন। কিন্তু সুলতান মাহমূদের কাছে শত্রু-মিত্র আর সহায়ক ও চক্রান্তকারীদের ব্যাপারটি ছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তিনি ছোট বেলা থেকে দেখে আসছিলেন, কোন প্রতিবেশী রাজ্যের কোন্ শাসক সত্যিকার ইসলামী চেতনা ধারণ করে এবং সুলতানের ন্যায়-নীতির সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সুবক্তগীনের মত ভাবনার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত এ্যাকশনের মাধ্যমে চিন্তার চেয়েও তীব্র গতিতে সমাধানে পৌঁছায় ব্যক্তি মাহমূদ। তারুণ্য এবং পিতার মতো ইসলামী চেতনার জন্য তার কাজকর্মে ছিল প্রচণ্ড গতি।

গজনীর এক দিকে কাশগরের এলিখানী মুসলিমদের শাসন। অপরদিকে বুখারার সামানী শাসন। অন্যদিকে জিয়াত বংশের শাসন আর পূর্বে-গোরীদের রাজত্ব। এভাবে গজনী সালতানাত বেষ্টিত। দৃশ্যত চতুর্পাশের রাজ্যগুলো মুসলিম শাসনাধীন এবং অঙ্গরাজ্যের মতো হলেও এগুলোর কোনটিতেই ন্যায়পরায়ণ ইসলামী চেতনাসম্পন্ন শাসক ছিল না একটিও। নামেমাত্র এরা মুসলমান হলেও ঈমানী চেতনা হারিয়ে বেঈমানী মোনাফেকী আর ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। গজনীর শাসকদের প্রতি এরা সবাই ছিল ঈর্ষাপরায়ণ। গজনীর চিহ্নিত শত্রু ও পৌত্তলিকদের সাথেই এসব ভোগবাদী মুসলিম শাসকদের ছিল বেশি দহরম মহরম।

মাহমূদ একদিন খবর পেলেন, বুখারার বাদশাহ খোরাসান অঞ্চল তওবুন বেগ নামের এক আমীরকে দান করে দিয়েছেন। খবর পেয়ে সুলতান মাহমূদ বুখারার বাদশাহকে পয়গাম পাঠালেন, 'আপনার সাথে আমাদের মৈত্রী চুক্তি রয়েছে। এ অবস্থায় কি করে আপনি গজনী সালতানাতের অধীনস্ত অঞ্চল আমীর তওবুন বেগকে দান করতে পারলেন! এ খবর পাওয়ার পর আমরা মৈত্রী চুক্তি কিভাবে বহাল রাখতে পারি? খোরাসান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিন। যাতে আমাদের মৈত্রী অক্ষুণ্ন থাকে। আপনি হয়তো জানেন, হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থেই আমাদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন অটুট রাখতে হবে।'

সুলতানের পয়গামের জবাবে বুখারা থেকে যে প্রতিক্রিয়া এল তাতে বোঝা গেল, তারা মাহমূদকে মোটেও গণ্য করে না। তারা লিখল, "বলখ, তিরমিজ ও হেরাত আপনার অধীনেই রয়েছে। আর বাকী অঞ্চলগুলো আমরা আমাদের আস্থাভাজন আমীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিচ্ছি।"

সুলতান মাহমূদ এই অবজ্ঞাসূচক প্রতিউত্তরের পরও হাকীম আবুল হাসানকে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ বুখারার শাসকের কাছে পাঠালেন এবং লিখে জানালেন- "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, যে দোস্তি ও সদ্ভাব আমাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় বিদ্যমান রয়েছে সেখান থেকে আমি এমন অপমানজনক প্রতিউত্তর পাব। আমার দুঃখ হচ্ছে, মিত্রতা ও প্রতিবেশীর সাথে সৌহার্দ্যভাব হয়তো অক্ষুণ্ন রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আমাকে চুক্তি ভঙ্গে বাধ্য করা হচ্ছে।"

সুলতানের এই সমঝোতা চেষ্টা তো ব্যর্থ হলোই বরং দূত আবুল হাসানও আর ফিরে এলো না। কিছু দিন পর গোয়েন্দার মাধ্যমে সুলতানের কাছে খবর পৌছল, আবুল হাসানকে বুখারার উজীর করা হয়েছে। যার জন্যে কোন সংবাদ পাঠানোও প্রয়োজন মনে করেনি সে। সংবাদ পেয়েই সুলতান মাহমূদ তার নিরাপত্তা বাহিনীর চৌকস কমান্ডোকে বুখারার কেন্দ্রীয় শহর নিশাপুরের দিকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিলেন। ধারণার চেয়ে দ্রুত সুলতানের বাহিনী নিশাপুরের উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হল। নিশাপুরের আমীর তওবুন বেগের কাছে যখন সুলতানের বাহিনীর খবর পৌছল তখন সুলতানের সৈন্যরা নিশাপুরের সীমানার ঢুকে পড়েছে। তওবুন বেগ প্রতিরোধের সাহস না পেয়ে বুখারায় পালিয়ে গিয়ে শাহ মনসুরকে খবর দিল। খবর পেয়ে শাহ মনসুর সুলতানের মোকাবেলায় ময়দানে সৈন্য সমাবেশ করল।

তওবুন বেগ ক্ষমতার স্বাদে বিভোর। সে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ও যন্ত্রণায় সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে নেমে গেল। সে আর এক কুচক্রী আমীর ফায়েককে গিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে যুদ্ধ সহায়তায় রাজী করাতে সক্ষম হল। আমীর ফায়েক সুবক্তগীনের জীবদ্দশায় বহু চক্রান্ত করেও টিকতে পারেনি। সে চক্রান্ত করে ব্যর্থ হয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। সেই জেদে আমীর ফায়েক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শাহ মনসুরের সহযোগী হল।

তওবুন চক্রান্তে ওস্তাদ। আমীর ফায়েককে সে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে শাহ মনসুরকে বন্দী করে তার অযোগ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই আব্দুল মালেককে মসনদে বসিয়ে অন্তরালে নিজেরা ক্ষমতা ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে গেল। দৃশ্যত এরা

সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধাচারী ও পরস্পরে বন্ধু হলেও পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্রই ছিল এদের চরিত্র।

মাহমূদ কৌশলে এদেরকে কঠিন একটা জায়গায় মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করলেন। মাহমূদের আতঙ্কে এদের কেউই যুদ্ধে মোকাবেলা করার সাহস পেল না। মাহমূদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের ভয়ে তওবুন বেগ যে কোথায় পালিয়ে গেল আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। আমীর ফায়েকও পালাতে গিয়ে আহত হয়ে সেই যে বিছানা নিল আর দাঁড়াতে পারল না। কিছুদিন পর ফায়েকের মৃত্যু সংবাদ পেলেন সুলতান।

কাশগরে তখন এলীখ খান ক্ষমতাসীন। সে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিন্তা না করেই সুবক্তগীনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অবনতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বুখারায় আক্রমণ করে বসল। ক্ষমতাসীন বালক আব্দুল মালেককে হত্যা করল। আব্দুল মালেককে হত্যা করে এলীখ খানের কোনই লাভ হলো না। সুলতান মাহমূদের আতঙ্কে এলীখ খান বুখারায় অবস্থান করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দুঃসাহস পেল না। সুলতান মাহমূদের আক্রমণের ভয়ে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সুলতান বলখ ও খোরাসানকে গজনীর অধীনে নিয়ে এলেন।

আব্দুল মালেক নিহত হওয়ায় বুখরায় সামান শাসনের ইতি ঘটল। সুলতান সুবক্তগীনের অবর্তমানে গজনী ও আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর গৃহযুদ্ধ ও অবনতিশীল পরিস্থিতি এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা মুশকিল। এই অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সুলতান মাহমূদের উল্লেখযোগ্য লোকবল ও সমর সম্পদ ব্যয় করতে হয়। হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের আক্রমণ প্রতিরোধে সুলতান যে সমর আয়োজন ও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এর বড় অংশই গৃহযুদ্ধ সামাল দিতে লেগে যায়। গৃহযুদ্ধের বিষবাষ্প রোধ করতে মাহমূদ যে মুসলিম সৈন্য ও যোদ্ধাদের কাজে লাগিয়েছেন এরাই পৌত্তলিকদের আগ্রাসন ঠেকানোর প্রধান শক্তি। আত্মকলহ ও প্রাসাদ চক্রান্ত দমনে এই অপরিমেয় জীবন ও সম্পদ ক্ষয় করতে না হলে মাহমূদের বিজয় অভিযান এবং হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক দুঃশাসকদের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারতো।

বিদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, বিলাসী, ক্ষমতালিপ্সু যে সব আমীর-উমারা মাহমূদের প্রতিরোধের মুখে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এদের ঘরবাড়িতে ইহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দু যুবতী, মদ-মাতলামী আর নৃত্যগীতের বিপুল উপকরণ পাওয়া গেল। বেরিয়ে আসে কুচক্রীদের অন্তরালের জীবন চিত্র আর সুলতানের বিরোধিতার

প্রকৃত কারণ। সাধারণ সৈনিক ও জনতা জানতে পারে, এসব আমীর-উমারার সাথে মাহমূদের আদর্শিক ব্যবধান কত। প্রত্যক্ষদর্শী ও ঐসব আমীরদের ঘনিষ্ঠজনেরা সুলতানকে জানায়, সুলতান-বিরোধী প্রত্যেক আমীরের সাথে ছিল হিন্দুস্তানের হিন্দু মহারাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহুদী ও খৃষ্টানরা দামী দামী উপঢৌকন আর সুন্দরী তরুণী পাঠাতো এদের হেরেমে। প্রত্যেক আমীরের বাড়িতে রাতে বসত নৃত্যগীত আর সুরা পানের আসর। ইহুদী সৃষ্ট হিন্দুস্তানের একটি কেরামতি গোষ্ঠীর প্রধান মুসলিম পরিচয়ে এদের কাছে সুন্দরী তরুণীদেরকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠাতো। দৃশ্যত এরা মুসলিম দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে এরা ছিল ইহুদীদের চর। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর আমলেও ইহুদী গোষ্ঠী বিভিন্ন মুসলিম ফেরকা সৃষ্টি করে ইহুদী-খৃষ্টান চক্রান্ত অব্যাহত রাখতে মুসলমানদের হেরেমে মেয়েদের পাঠাতো নির্যাতিতা ও আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে। প্রশিক্ষিত এই সব সুন্দরী গোয়েন্দা মেয়েদের রূপ-সৌন্দর্যের ফাঁদে অধিকাংশ ক্ষমতাবান লোক আটকা পড়ে যেত। তারা এদের জায়গা দিতো নিজেদের হেরেমে খাদেমা হিসেবে। নিজেদেরকে মালিকের কাছে মোহনীয় করে উপস্থাপন আর নিবেদিতা প্রমাণ করে এরাই প্রকারান্তরে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হেরেমগুলোকে দুশমনদের দুর্গে পরিণত করতো। দেহবল্লরী আর যাদুময় নাটকীয়তায় এসব নারী শুধু আইয়ুবকেই নয়; যুগে যুগে মুসলিম খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থায় যে কতো অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পেলে পৃথিবীর মানুষ হতবাক হয়ে যাবে। মাহমূদের সময়েও মুসলিম শাসকদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাতে আমীর-উমারার ঘরে ঘরে তারা রমণীয় ফাঁদ বিছাতে সক্ষম হয়েছিল। বহুসংখ্যক আমীর শ্রেণীর লোক এদের পাতা ফাঁদে আত্মাহুতিও দিয়েছিল। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মাহমূদকে অসংখ্যবার গৃহযুদ্ধ ও বিশৃংখলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সব সময় তাকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

রাজা জয়পালের গোয়েন্দা তৎপরতা তেমন জোরদার ছিল না। যার ফলে সুবক্তগীনের মৃত্যু সংবাদ ছাড়া জয়পালের বর্তমান গজনী সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না। সুলতান যখন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যস্ত আর প্রতিবেশীদের আক্রমণ রোধে ব্যাপৃত এ সময় যদি জয়পাল গজনী আক্রমণ করে বসত তাহলে হয় তো সুলতানের বিরোধীরা জয়পালের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো। তখন ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে সুলতানের পক্ষে গজনী দখলে রাখা হয়ত কঠিন হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ যে, জয়পাল ও সুলতান বিরোধী

কারোরই প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা ছিল না। এরা সুলতানের ক্ষমতা ও প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটেও জ্ঞাত ছিল না। এদের কাছে কেউ সুলতানের দূরবস্থার কথা বলেওনি। এদের তেমন কোন গোয়েন্দা তৎপরতাও ছিল না, যাতে প্রতিপক্ষের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে। পক্ষান্তরে জয়পালের প্রধান সামরিক কেন্দ্র লাহোরে সুলতানের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।

* * *

ইমরান দুই কয়েদী কাসেম ও নিজামকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে অন্যান্য দিনের মতো পর দিন সকাল বেলা নাশ্‌তা নিয়ে যথাসময়ে রাজ প্রাসাদে কয়েদীদের ঘরে হাজির হল। ঘরে বন্দীদের না দেখে সে ঘরের দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগল। ইমরান রাজ প্রাসাদের কয়েক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল, কয়েদীরা কোথায় গেছে? কেউ তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না। কিছুক্ষণ পর রাজার ফরমান এলো কয়েদীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইমরান রাজার ফরমানবাহীকে বলল, সকাল থেকে সে বন্দীদের জন্যে নাশতা নিয়ে বসে রয়েছে কিন্তু তাদেরকে সে দেখছে না। বন্দীরা ঘরে নেই।

"হু, মুসলমানদের বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি"। কয়েদীদের লাপাত্তা হওয়ার সংবাদ শুনে বলল রাজা। "ওদের কামরা থেকে পাহারা তুলে দেয়াই ছিল মারাত্মক ভুল। এরা শহরে থাকবে না। যাও! শহর থেকে বের হওয়ার সব পথে চেকপোষ্ট বসিয়ে ওদের খোঁজ কর। পেশোয়ারের দিকে অশ্বারোহী পাঠিয়ে ওদের ধরে আন।"

"দু'জন বন্দী পালিয়ে যাওয়ায় আমাদের এমন কি ক্ষতি হয়েছে যে, সব জরুরী কাজ ফেলে রেখে ওদের পিছনে দৌড়াতে হবে!" বলল এক উজীর। "এই মুহূর্তে অভিযান প্রস্তুতিতে আমাদের পুনঃ মনোযোগ দেয়া উচিত। দু'জন ফেরারীকে ধরে আনতে বিপুল সংখ্যক লোককে এদিক ওদিক পাঠিয়ে অভিযান প্রস্তুতির কাজে বিঘ্ন ঘটানো ঠিক হবে কি?"

"ওদের ফেরার হওয়াতে আমার হারানোর কিছু নেই। ওদের কাছ থেকে যা পাওয়ার তা আমি পেয়ে গেছি। কিন্তু ওদের ফেরার হওয়ার শাস্তি ওদের দিতে চাই। তাই জলদি ওদের পাকড়াও-এর ব্যবস্থা কর।" পরক্ষণেই রাজাকে মন্দির থেকে সংবাদ দেয়া হল, বলীদানের জন্যে উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া গেছে। আগামী পনের দিনের মধ্যেই মেয়েটিকে বলী দিয়ে ওর রক্ত রাজার মাথায় দেয়া হবে। এতে রাজার বিজয় নিশ্চিত হবে। এখন যে কোন দিন রাজা অভিযান শুরু করতে পারেন।

"শীঘ্রই আমরা অভিযানে বের হব।" বলল রাজা।

এসব সংবাদ সংগ্রহ করতে ইমরানের মতো ঝানু গোয়েন্দার মোটেও বেগ পেতে হল না। সারা দিন সে রাজ প্রাসাদে ডিউটি করে সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরে এল তখন তাকে অনেকটাই উদ্বেগ ও চিন্তামুক্ত মনে হল। বন্দীদের ফেরার হওয়ার ব্যাপারে ইমরানের উপর রাজপ্রসাদের কেউ সন্দেহ করল না। কাসেম ও নিজাম তাড়াতাড়ি গজনী রওয়ানা হওয়ার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করছিল। ইমরান তাদের পরিস্থিতি জানিয়ে বলল, আরো কয়েকদিন তোমাদের এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। এ মুহূর্তে বের হলেই মহাবিপদ। শহরের প্রতিটি বহির্গমন পথে চেকপোষ্ট বসানো হয়েছে। দূরদূরান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধানীদল পাঠানো হয়েছে। এখন ঘর থেকে বের হলে নিশ্চিত ধরা পড়তে হবে।

ইমরানের দরজায় সাংকেতিক কড়া নাড়ানোর শব্দ হলো। ইমরান হেসে বললো, দোস্ত এসেছে! দরজা খুলে দিলে দু'জন লোক ভেতরে প্রবেশ করল। ইমরান ভেতরের ছিটকানি লাগিয়ে আগন্তুকদের ঘরে নিয়ে এল। কাসেম ও নিজামদের ঘরে এদের নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল।

এরা দু'জন ছিল পেশোয়ারের বাসিন্দা। তারা বলল, রাজা জয়পাল শীঘ্রই গজনী অভিযানে রওয়ানা হবে। এ মুহূর্তে আমাদের দুটি কাজ করতে হবে।

প্রথমতঃ কাউকে দ্রুত পাঠিয়ে সুলতানকে জয়পালের আক্রমণের খবর দিতে হবে। যাতে রওয়ানা হওয়ার আগেই সুলতান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ শহরের বাইরে রাজা যুদ্ধসামগ্রী ও রসদপত্রের বিরাট মওজুদ গড়ে তুলেছে। সমরসামগ্রী সংগ্রহ ও জমার আজ শেষ দিন। ওখানে বিপুল খাদ্য, যুদ্ধাস্ত্র, ঘোড়া আর গরুরগাড়ী রয়েছে। এসবে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

আগুন লাগানোর কি কৌশল হতে পারে? লাহোরের লোকদের এসবের কোন ধারণা নেই। বলল ইমরান।

এক আগন্তুক বলল, শোনেননি এর আগেরবার লাহোরবাসী কি খেলা দেখেছে। একটা মেয়েকে কেন্দ্র করে গোটা লাহোরবাসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এখন বাটান্ডাবাসীরাও গজনীর বিরুদ্ধে সমরায়োজন করেছে। তাই তাদেরও সে ধরনের কোন খেলা দেখাতে হবে।

বাটান্ডা জয়পালের রাজধানী। এজন্য এখানেই গজনীর গোয়েন্দাদের আড্ডা। যেদিন থেকে জয়পাল গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করল সেদিন থেকেই যাবতীয় সামরিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বানিয়েছিল লাহোরকে। লোহোরে

গজনীর গোয়েন্দা ছাড়াও স্থানীয় লোকেরাও তাদের তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল। হিন্দুরাজা ও শাসকদের অত্যাচার উৎপীড়নে বহু সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা গজনীর গোয়েন্দা কার্যক্রমের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। বয়সে তরুণ, মেধাবী ও সাহসী অনেক যুবক লাহোরে গজনীর সুলতানের পক্ষে রাত দিন কাজ করে যাচ্ছিল।

রাজা জয়পাল যখন গজনী আক্রমণের চূড়ান্ত লক্ষ্যে লাহোরে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম, সমরাস্ত্র ও গাড়ী ঘোড়ার সমাবেশ করে, তখন এগুলো ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে গজনী গোয়েন্দাদের কুড়িজনের একটি স্পেশাল টিম মুসাফির বেশে দু'জন দু'জন করে বিভক্ত হয়ে বাটান্ডা থেকে লাহোর প্রবেশ করে। এরা লাহোরের স্থানীয় এজেন্টদের সংবাদটি পৌঁছে দিয়েই অপারেশন শুরু করবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করতে এসেছে দু' গোয়েন্দা।

গন্তব্য যাত্রা

লাহোরের মূল শহর থেকে একটু দূরে বিশাল ময়দান। হাজার হাজার তাঁবু, গাড়ী, ঘোড়া, সৈন্য ও সাজ সরঞ্জামে ঠাসা ময়দান। একটা তাঁবুর সাথে লাগানো আরেকটি তাঁবু। রাজ্যের হিন্দু প্রজারা নিজেদের সঞ্চিত সব ধন-সম্পদ অকাতরে রাজার সামরিক ভাণ্ডারে জমা করেছে। হিন্দু পণ্ডিত ও রাজার লোকেরা হিন্দু প্রজাদের মনে মুসলিম বিদ্বেষী উন্মাদনা ছড়িয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ক্ষেপিয়ে তুলেছে গজনীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে। হাজারো গরুর গাড়ী বোঝাই করা হয়েছে যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের পানাহার ও যুদ্ধসামগ্রী পরিবহণ করতে। আসবাব পত্রের বিরাট আয়োজন স্তুপাকারে রাখা হয়েছে ময়দানে। দু' মাইল ব্যাসার্ধের গোটা এলাকাটি যুদ্ধ সরঞ্জাম ও তাঁবুতে ছেয়ে গেছে। দিনরাত টহল দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরী।

রাজা জয়পাল শীঘ্রই গজনী আক্রমণে প্রস্তুত। তাই যুদ্ধ সরঞ্জামকে বাইরে রাখা হয়েছে। সৈন্যদের বলা হয়েছে বাকী প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করতে। তাঁবুর বাইরে পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বটে তবে তেমন কঠোর নয়। রাজার সেনা ছাউনী কিংবা যুদ্ধ সরঞ্জামে হাত দেবে এমন দুঃসাহস কারো ছিল না। এসব ক্ষেত্রে চুরির ঘটনাও কখনো ঘটেনি। তাই অশ্বারোহী প্রহরীরা মনের আয়েশে তাঁবুর চারপাশে ঢিলেঢালা টহল দিচ্ছে। রাজার এবারের যুদ্ধযাত্রা নিয়ে বেশির

ভাগ সময়ই তারা আড্ডায় মতে থাকছে। লাহোরের মুসলিমদের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতির আশঙ্কাও তেমন ছিল না জয়পালের। কেননা, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ লাহোরে নামমাত্র কিছু সংখ্যক মুসলমানের বসবাস থাকলেও তারা অনুন্নত এলাকায় দীনহীন জীবন যাপন করতো। রাজার সময়োজনের বিরুদ্ধে কোন দুষ্কৃতির সাহস তাদের মোটেও ছিল না।

অবশ্য রাজার জানা ছিল, তার এলাকায় গজনীর গোয়েন্দা রয়েছে কিন্তু এরা তার বিশাল সমরায়োজনকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে ঘুর্ণাক্ষরেও রাজা তা ভাবতে পারেনি। তাই বিশাল সমরায়োজনের প্রতি যতটুকু সতর্ক নজরদারী দরকার ছিল ততটুকু ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি জয়পাল।

পণ্ডিতেরা সাধারণ হিন্দু প্রজাদের মধ্যে গজনীর সুলতান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনই ঘৃণা ও প্রতিহিংসা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, হিন্দুরা রাজার আগ্রাসনকে ধর্মযুদ্ধ বলে বিশ্বাস করছিল। হিন্দু মহিলারা গায়ের অলংকার, জমানো টাকা আর বাজারে এটা ওটা বিক্রি করে যা-ই পাওয়া যেতো রাজার ভাণ্ডারে জমা করতো। প্রজাদের মনে বিশ্বাস ছিল, এবার ঠিকই রাজা গজনীর মুসলিম শাসককে পরাজিত করে সব মুসলিম প্রজাকে গোলাম-বাঁদী বানিয়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করবে। আর দেবদেবীদের জয়গান ভারতের সীমানা পেরিয়ে গজনী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। মূলত রাজার এই বিশাল সাজ-সরঞ্জামের ভাণ্ডার স্ফীত হয়েছে সাধারণ প্রজাদের ঘাম-রক্তের বিনিময়ে। অতএব, হিন্দুপ্রজাদের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতির আশঙ্কা মোটেও নেই।

অথচ জয়পালের বিশাল আয়োজন পর্বও খর্ব করে দেয়ার জন্যে গজনীর শার্দুলেরা পৌঁছে গিয়েছিল লাহোরে। শাহীনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চিতার মতো ক্ষীপ্র, বিদ্যুতের গতি ও সিংহ শক্তির অধিকারী এরা। এরা ইসলামের জন্যে নমরুদের আগুনে আত্মাহুতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা শুধু এতটুকুই যাচাই করে, কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুকূলে কিনা। এরা বিশ্বাস করতো, শত্রুর সিংহাসন উল্টে দেয়ার জন্যে কোন রাজশক্তির দরকার হয় না। রাজকীয় সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে সমান শক্তির সেনাবাহিনীর দরকার হয় না। এরা বিশ্বাস করতো, ঈমান শক্তিশালী হলে দুর্গের মহাপ্রাচীরও বালির বাঁধের মতো ধসিয়ে দেয়া যায়। যে মুহাম্মদ বিন কাসিম উপমহাদেশে ইসলামের ঝাণ্ডা গেড়েছিলেন এরা ছিল সেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এরা এ অঞ্চলের নিবু নিবু ইসলামের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন হাজারো জীবন।

এরা এসেছে ঘোড়ায় চড়ে। এদেরই দু'জন এখানকার সব চেয়ে দায়িত্বান গোয়েন্দা কর্মকর্তা ইমরানের সাথে দেখা করে তাদের উপস্থিতির কথা এখানে কর্মরত সহকর্মীদের জানিয়ে দেয়ার জন্য গিয়েছিল। আর অন্যরা ফাটা-ছেঁড়া, ময়লা পোষশাকে ঠিকানা অন্বেষে মুসাফির বেশে শহরের মধ্যে ঘুরাফেরা করে বিকেলেই শহরের বাইরে চলে গিয়েছিল। রাতে যখন শহরবাসী ঘুমের কোলে অচেতন, তখন এরা শহরের বাইরে এক নির্জন জায়গায় একত্রিত হয়ে উদ্দিষ্ট বাস্তবায়নে জীবনবাজী রাখতে হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করছে। পরস্পরে মুসাফা ও কোলাকোলি করে শেষবারের মতো এরা সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে– হয় কার্যোদ্ধার নয়তো মৃত্যু– এই ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা। এদের পরস্পরের আবার দেখা হবে এ প্রত্যাশা মন থেকে বিদায় করে দিয়েছিল গোয়েন্দারা। আবার জীবিত দেশে ফিরে যাওয়ার আশা এরা ত্যাগ করেই নেমেছিল এই কঠিন যুদ্ধে। নিরাপদ দূরত্বে ঘোড়া বেঁধে রেখে বিভিন্ন দিক থেকে দু'জন দু'জন করে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি করে পানিবহনের কৌটা। সাধারণ মুসাফির যেসব পাত্রে পানি বহন করে এরা এগুলোতে জ্বালানী নিয়ে এসেছে। সাথে রেখেছে দ্রুত আগুন জ্বালানোর সরঞ্জাম।

তাঁবুর বাইরে প্রহরীদের প্রতি তাদের সতর্ক দৃষ্টি। এক জায়গা দিয়ে দু'প্রহরী কিছু দূর চলে গেলে এই সুযোগে দু'জন ক্রোলিং করে মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে দ্রুত দুটি তাঁবুর মাঝখানে গিয়ে থেমে গেল। কৌটা খুলে তাঁবুতে তেল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু এখানে পৌঁছার আগেই আরো চার-পাঁচ জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল। চার জানবাজ মালভর্তি গরুর গাড়ীতে জ্বালানী তেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রহরীরা হঠাৎ কয়েক জায়গায় একই সাথে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে কোনটা রেখে কোনটা নিভাবে দিশা পাচ্ছিল না। দ্রুত তাঁবুর ভেতরের লোকেরা আগুন নিভাতে বেরিয়ে আসল। কিন্তু এর আগেই গজনীর গায়েন্দারা চিতার ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। রাতের বাতাসে দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা সারা ময়দান গ্রাস করে নেয়। আগুনে আকাশ লাল হয়ে গেল। আলো ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর পর্যন্ত।

আগুনের তাণ্ডবে ঘুমন্ত সৈন্যরা জেগে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করল। কে কার আগে জীবন বাঁচাবে– হুড়োহুড়ি করে অনেকেই আহত হল। গোলাবারুদের ডিপোতে আগুন ধরলে বিকট শব্দে সারা মাঠ কেঁপে উঠে। বাঁধা

ঘোড়া ও গরুগুলো আগুনে দগ্ধ অর্ধদগ্ধ হয়ে চেচামেচি করছিল আর ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদে গোটা ময়দান বিভীষিকাময় হয়ে উঠল। শহরের সকল বাসিন্দা জেগে উঠল আগুনের আলো ও মানুষের চিৎকারে। রাজার সব সৈন্য আগুন নেভানোর জন্যে ময়দানের দিকে দৌড়াল কিন্তু ততক্ষণে দু'মাইল ব্যাসার্ধের গোটা তাঁবু ঘেরা চত্বর আগুনে গ্রাস করে ফেলেছে। তাজা গাছপালায় পর্যন্ত ধরে গেছে। আগুনের তীব্র তাপের কারণে সৈনিকদের পক্ষেও তাঁবুর দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। কর্মকর্তারা নির্দেশ দিচ্ছিল, এখনও যে সব আসবাব পত্রে আগুন ধরেনি সেগুলো বাঁচাও কিন্তু কারো পক্ষেই আগুনের বেষ্টনি ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

শহরের মজলুম মুসলিম অধিবাসীরা রাজার সমর সরঞ্জামে আগুন লাগায় স্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু হিন্দুরা এটাকে অগ্নিদেবতার অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ হিসেবে চিহ্নিত করে আহাজারি আর মাতম শুরু করে দিল। মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। বড় পণ্ডিত সরস্বতির সামনে দু'হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি শুরু করল। সব হিন্দু কিশোরী মহিলা মন্দিরে জমায়েত হয়ে ভজনা গাইতে লাগল। আর সকল পুরুষ বাসিন্দাদের সৈন্যরা হাঁকিয়ে নিয়ে গেল কুয়া থেকে পানি তুলে আগুন নেভানোর জন্যে। ঘোড়ার গাড়ী দিয়ে দূরের পুকুর ও নদী থেকে বড় মটকায় করে পানি এনে আগুন নেভানো তো দূরে থাক আধা মাইল দূর পর্যন্ত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব ছিল না।

"সকল প্রহরীকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেল।" বলল রাজা। রাজা জয়পাল সর্বগ্রাসী আগুনে সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম পুড়তে দেখে দিশেহারা হয়ে যায়। রাজা চিৎকার, চেচামেচি করে আগুনের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিল আর অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিল। রাজার ভয়ে তার উজীর, নাজির ও জেনারেলরাও শহরবাসী ও সাধারণ সৈনিকদের গালিগালাজ করছিল আর কঠিন ভাষায় কাজের নির্দেশ দিচ্ছিল। রাজা যে ঘোড়ায় সওয়ার ছিল কাকতালীয়ভাবে সেই ঘোড়াটিও বিকট আওয়াজে হ্রেষারব করছিল।

অনেক চেষ্টায় সামান্য কিছু সরঞ্জাম রক্ষা করা সম্ভব হয়। অসহায়ের মতো এক পর্যায়ে রাজা, মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা দূরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল।

"কিভাবে আগুন লেগেছে তা বলা কঠিন।" বলল রাজা। "যতো প্রহরী কাজে নিয়োজিত ছিল ওদের সবাইকে কয়েদখানায় পা উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখ। যদি কেউ আগুন সম্পর্কে সত্য তথ্য দেয় তবে তাকে মুক্তি দিবে, অন্যথায় তাদের

এভাবেই ঝুলিয়ে রাখবে। আর আগামী পনের দিনের মধ্যে পুড়ে যাওয়া সকল সরঞ্জামের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। আমাকে শীঘ্রই গজনী আক্রমণ করতে হবে। সুবক্তগীনের মৃত্যুর পরই দ্রুত গজনী আক্রমণ করা উচিত ছিল। এখন যত দেরী হবে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ততই প্রস্তুতির সময় পাবে।"

"এটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের অপকর্ম।" বলল উজির উদয় শংকর। "মহারাজের কি স্মরণ নেই দু'কয়েদী যে পালিয়ে গেছে। হতে পারে ওরাই এই সর্বনাশের হোতা।"

"মুসলমানদের ঘরে ঘরে তল্লাশী কর। এদের ঘরে নগদ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ রূপা আর খাদ্যদ্রব্য যা পাবে সব নিয়ে আসবে। কোন মুসলমানের প্রতি সন্দেহ হলে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। কিন্তু আমার মনে হয় না তারা এমন অপকর্মের দুঃসাহস দেখিয়েছে।" কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল রাজা।

"এই অস্পৃশ্য জাতি এর চেয়েও জঘন্য কাজ করতে পারে।" বলল এক জেনারেল।

মহারাজ! আপনি গজনীর বন্দীদের কাছ থেকে বিজয়ের যে রহস্য উদঘাটন করছিলেন, আসলে এদের রহস্য এমনই। এদের দুঃসাহস আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। আমাদেরকে এদের দুঃসাহসের চরম শিক্ষা দিতে হবে। অবশ্য আমি এ দুর্বলতা স্বীকার করছি যে, আমাদের সৈনিকদের মনে এমন সাহস নেই। একথাও ঠিক যে, আমাদের যে সব সেনা সদস্য গজনী থেকে পালিয়ে এসেছে এদের মনে এখনও মুসলিম সৈন্যদের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

"তোমাদের সৈন্যদের বল, এ লড়াই আমাদের দেবতা ও মুসলমানদের পয়গম্বরের মর্যাদা রক্ষার লড়াই।" বলল রাজা। "বলে দাও, এ লড়াইয়ে যদি কোন হিন্দু নিহত হয় তবে পরজনমে সে সুন্দর পাখি হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করবে। উন্মুক্ত আকাশে আর সাজানে বাগানো সে মন মাতানো গান গেয়ে মাতিয়ে রাখবে।"

রাজা জয়পালের মাথা বিগড়ে দিয়েছিল পণ্ডিতেরা। তাই পণ্ডিতদের যাদুকরী প্রভাবে রাজা বাস্তবতা ভুলে ওদের মতোই দেবদেবীর অলীক শক্তি ও বিশ্বাসে আকাঙ্ক্ষা পূরণের ও ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলার স্বপ্নে উন্মাদ ছিল।

রাজা বলল, "তোমারা জান না, দেবী আমাদের উপর রুষ্ট হওয়ার কারণেই এসব হচ্ছে। আর পনের দিনের মধ্যেই দেবীর জন্যে কুমারী বলীদান করা হবে। তখন সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

“মহারাজ! আমার কথা আপনার ভাল নাও লাগতে পারে। এজন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।” বলল জেনারেল। “একটি অবলা কুমারীকে বলী দিয়ে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। বিজয়ের জন্যে আমাদের প্রত্যেকটি সৈনিককে জীবন বলীদানের অঙ্গীকার করতে হবে। এমনকি আমার আপনার জীবনও জাতির জন্যে উৎসর্গ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন সন্তানের সংখ্যা না বাড়বে ততদিন পর্যন্ত বিজয়ের মুখ দেখা স্বপ্নই থেকে যাবে। যারা আমাদের সেনাবাহিনীর এক বছরের রসদ এক রাতে ধ্বংস করে দিয়েছে এরা কতটুকু জাতির জন্যে নিবেদিত প্রাণ তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে”।

“তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস, এই আগুন মুসলমানরা লাগিয়েছে?” জেনারেলের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিল রাজা।

“জী হ্যাঁ মহারাজা! জবাব দিল জেনারেল। আমি সেনাপতি। একজন সৈনিকের পরাজয় আমারই পরাজয়। আমি বাস্তববাদী। বাস্তবতাকে যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা আমার কর্তব্য। কোন সেনাপতি ধারণা আর অন্ধবিশ্বাসে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না। আমি ভৌতিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করলে আপনার রাজমহল মসজিদে পরিণত হবে আর আপনার রাজত্ব অল্প দিনের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

আমি আপনাকে বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করছি। এটাই সত্য, আগুন মুসলমানরাই লাগিয়েছে। আমি নিরীক্ষা করে দেখেছি, আগুন এক জায়গায় লাগেনি। একই সাথে দশ পনের জায়গায় আগুন জ্বলে উঠে। যদি প্রহরীদের ভুলের কারণে আগুনের সূত্রপাত ঘটত তাহলে আগুন এক জায়গা থেকে জ্বলতো, একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জ্বলতো না। এক জায়গায় থেকে আগুনের সূত্রপাত হলে প্রহরীরা আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হতো।”

“তার মানে কি এখানে আগুন দেয়ার জন্যে গজনী থেকে সৈন্য এসেছিল? না শহরের সব মুসলমান এসে দশ পনের জায়গা আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে?” ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রাজা।

“একথা আমি হলফ করে বলতে পারি, এ আগুন শহরের মুসলমানরা লাগায়নি। গজনী থেকেও আগুন লাগাতে সৈন্য আসেনি। তবে যারাই আগুন লাগিয়ে থাকুক, এদের সংখ্যা কুড়ি পঁচিশ জনের বেশি ছিল না। আর এরা শুধু আগুন জ্বালাতে আসেনি, নিজেরাও জ্বলতে এসেছিল। এ ধরনের কাজ যারা করে এরা এমনই দুঃসাহসী হয়ে থাকে।

আমরা এদের পাকড়াও করে জীবিত জ্বালিয়ে দিলে কি হবে? এদের জায়গা আরো একশ' জনে পুরো করে ফেলবে। আমাদেরকে এদের বুকের আগুন নিভাতে হবে। আর এ আগুন হলো তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের আগুন। গাছের পাতা ঝরে পড়লে গাছ মরে না, গাছের শিকড় কেটে দিতে হয়।

আগুন জ্বেলে আগুন নেভানো যাবে না। আগুন নেভাতে হলে পানি ঢালতে হবে। আপনাকে আগুনের মতো তপ্ত মাথায় নয় ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে পানি ঢালার ব্যবস্থা করতে হবে।" বলল উজির উদয় শংকর।

এখানকার মুসলমানদের উপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এখানকার মুসলিম নেতাদের পুরস্কার-উপঢৌকন দিয়ে বাগে আনতে হবে। তাদের ইজ্জত-ইকরামের রাতের দরবার ও সুরা-গানের আসরে দাওয়াত করে মদ-সুরা ও নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করে ঈমানের জ্যোতি হৃদয় থেকে নিভিয়ে দিতে হবে। অতীতের কথা আমার মনে পড়ে। মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে ইসলামের বীজ বপন করেছিলেন। তার আগমনে ভারতের অসংখ্যা হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে আমাদের দেব-দেবীদের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। বিন কাসিমের অবর্তমানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে পদানত করতে চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে বিন কাসিমের অনুসারীরা কৌশল প্রয়োগ করে তাদের সংস্কৃতিতে আমাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে। দেখা গেছে, সাংস্কৃতিক কৌশলটাই শক্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। অভিজ্ঞতা বলছে, মদ, নারী, আর ভোগ-বিলাসিতা মুসলিম নেতৃবর্গকে না প্রকৃত মুসলিম থাকতে দিয়েছে না হিন্দুয় রূপান্তরিত করেছে।

এক পর্যায়ে মুসলমানদের ইমলাম মসজিদের চার দেয়ালে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে। এদের শারীরিকভাবে শাস্তি দিয়ে বাগে আনা যাবে না। আত্মিকভাবে এদের হত্যা করতে হবে। প্রেম, মহব্বত ও ধোঁকা দিয়ে এদের সংস্কৃতি বিকৃত করে দিতে হবে।এদের হৃদয়ের ক্যানভাসে আঁকতে হবে আমাদের ভোগবাদী সংস্কৃতির রঙিন ছবি"।

"রাজা জয়পাল আগুনের দিকে তাকিয়ে হতাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে কথা বলছিল। জয়পালের গজনী অভিযান কিছু দিনের জন্যে মূলতবি হয়ে গেল। গজনীবাসীরা সেনা অভিযান ছাড়াই সফল আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করে ফেলেছিল। অগ্নিকাণ্ডের উপস্থিত সুফল পাওয়া গেল। রাজার স্মৃতি থেকে কয়েদী কাসেম ও নিজামের ফেরার হওয়ার ব্যাপারটি হারিয়ে গেল।

এদিকে ঋষিকে পণ্ডিতেরা বলীদানের জন্য প্রস্তুত করতে পাহাড়ের উপর স্থাপিত মন্দিরে নিয়ে যায়। পাহাড়ের উপরের মন্দিরটিতে কোন স্থাপত্য নেই। অনেক আগে রাভী নদীর গতিধারা ভিন্ন ছিল। নদীর কূল ঘেঁষেই ছিল ঘন বন-জঙ্গল আর উঁচু উঁচু টিলার সমাহার। বর্তমানে যেটি বুড়ী নদী সেটিই আগে রাভী নদী ছিল। অসংখ্য পাহাড় ও টিলায় ঘেরা জায়গাটির মাটি পিচ্ছিল ও আগুনে পোড়ানো ইটের মতো শক্ত। জয়পালের আগের কোন রাজার আমলে হিন্দু কারিগররা টিলাগুলোকে কেটে চারদিকে দেয়ালের মতো করে গড়ে তোলে। তারা পাহাড় কেটে ভেতরে বালাখানার মতো অনেক কুঠরী বানায় এবং এসবের দেয়ালে দেবদেবীদের মূর্তি অংকন করে। পাথর কেটে মূর্তির অবয়ব তৈরি করে গোটা এলাকাটিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করে ফেলে।

বাইরে থেকে কোন মানুষ সেখানে গিয়ে বুঝতেই পারতো না যে, এটি কি প্রকৃতই পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে, না মোটা দেয়াল তুলে ঐ মন্দির তৈরি করা হয়েছে।

ওখানে সাধু সন্ন্যাসী ও মন্দিরের পণ্ডিত ছাড়া সাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। জায়গাটি যেমন দুর্গম, পথও ছিল জটিল। একটু পর পরই রাস্তার বাঁক ছিল এবং এক একটি রাস্তা কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়ে যেতো। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞাত লোকছাড়া ওখানে কারো সাধ্য ছিল না যাওয়া এবং বেরিয়ে আসা। তা ছাড়া সাধারণ কোন পূজা অর্চনা ওখানে হতো না। শুধু বলীদান অনুষ্ঠানগুলো লিরার মন্দিরে সম্পাদিত হতো। জায়গাটি যেমন ছিল ভয়াল তদ্রূপ দুর্গম। পণ্ডিতেরা ছাড়া ওদিকটা মাড়োনোর সাহস করতো না কেউ। সবাই বিশ্বাস করত, ওখনটায় দেবদেবী ও ভূত-পেত্নীর আবাসস্থল। এজন্যই ওখানে বলীদানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

জয়পালের পর সুলতান মাহমূদ যখন ভারত অভিযান শুরু করেন তখন আল্লাহর অপার কৃপায় বুড়ী নদীর গতিপথ বদলে যায় এবং অসংখ্য কুমারী ও নারীর সম্ভ্রমহানী ও রক্তে রঞ্জিত টিলার মন্দিরের দেবদেবীর চিহ্নও নদীর পানি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে টিলার অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে হিন্দুদের ইতিহাসে আর মুখে মুখেই শুধু সেই মন্দিরের কথা শোনা যায়। বাস্তবে ওখানে এখন টিলা ও মন্দিরের কোন নামগন্ধও নেই।

যে রাতে গজনীর গোয়েন্দা শার্দুলেরা জয়পালের যুদ্ধ সরঞ্জামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সে দিন বিকেলেই তাদের দু'জন ইমরানকে তাদের আগমনের ও অপারেশনের কথা জানাতে হাজির হয়েছিল ইমরানের ঘরে। তারা বেরিয়ে

যাওয়ার পরই আবার গেটে কড়া নাড়ার শব্দ হল। ইমরান গেট খুলে দিতেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো জামিলা। ইমরান গেট বন্ধ করে রাগতস্বরে জামিলাকে বলল– "আমার ঘরে আসতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তারপরও আসলে কেন?

জবাব না দিয়ে তার পার জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল জামিলা। কান্নাজড়িতকণ্ঠে বলল, "আমাকে পাপ থেকে বাঁচাও ইমরান। আমি ঘুমাতে পারি না। আমার চোখের সামনে সব সময় দৈত্যের মতো কি যেন এসে ভয় দেখাতে থাকে। ইমরান! তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

গভীর রাত। ইমরান জামিলাকে ঘরে নিয়ে যেতে দ্বিধা করছিল । কারণ, ঘরে কাসেম নিজাম অবস্থান করছে। জামিলাকে সে তাদের অবস্থান জানতে দিতে চায় না আর ওদেরকেও এটা বুঝতে দিতে চায় না যে, সে গোয়েন্দা কর্ম ছেড়ে নারী নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে। জামিলার সাথে সে কথা বলতেই প্রস্তুত ছিল না কিন্তু ওর অবস্থান এতই বিপর্যস্ত ছিল যে, তাকে আর ধমকানো উচিত মনে করলো না ইমরান।

"দেও-দৈত্যের কথা কি বলছ! ওসব কিছুই না। তোমার অপরাধই ডাইনী হয়ে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে।"

"না ইমরান! ঋষি আমার চোখে ভাসতে থাকে। আমি চোখ বন্ধ করতে পারি না। ওর চিৎকার আমার আত্মা কেঁপে ওঠে। চল ইমরান, ঘরে বসে কথা বলি।"

"না, ঘরে যাওয়া যাবে না। যা বলার এখানেই বল। আমার পাশে এসে দাঁড়াও।"

"আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে। আমাকে বাঁচাও ইমরান। এত নিষ্ঠুর হয়ো না।"

জামিলার কাছে মেঝেতে বসল ইমরান। জামিলা তার শরীর ঘেঁষে বসল। সে ভয়ে কাঁপছে।

"আমি চোখ বন্ধ করলেই ঋষি চিৎকার করে আমাকে জাগিয়ে দেয়। ও আমাকে অভিশাপ দিতে থাকে, ভয়ে আমার আত্মা কেঁপে উঠে। আমি কিছুই বলতে পারি না। অন্ধকারেও আমি ঋষিকে দেখি। তবে সেটি সুন্দর ঋষি নয়, ইয়া লম্বা লম্বা দাঁত, বিরাট নখ আর কাঁটাভরা শরীর নিয়ে দৈত্যের মতো আমার দিকে তেড়ে আসে। কিন্তু কাছে এস বাতাসে মিলিয়ে যায়। গতরাতে এ দৈত্য

থেকে বাঁচার জন্যে আমি ঘরের একোণে ওকোণে দৌড়াদৌড়ি করে কাটিয়েছি। সারাটা দিন আমি ঘুমাতে পারিনি। দিনের বেলায় ওকে দেখতে না পেলেও ওর চিৎকার শুনতে পাই। আমার মনে হয়, ঋষি আমার কামরাতেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পাই না। আমাকে মেরে ফেলবে, ইমরান! আল্লাহর দোহাই! তুমি আমাকে ঋষির প্রেতাত্মা থেকে বাঁচাও!"

বস্তুত জামিলা ছিল মজলুম তরুণী। তার মা-বাবা টাকার লোভে মোটা অংকের পণ নিয়ে জামিলার চেয়ে তিনগুণ বেশি বয়সের এক বুড়োর সাথে তাকে বিয়ে দেয়। অথচ জামিলা পরমা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও টগবগে তারুণ্যদীপ্ত রমণী। বণিকের ঘরে সে তৃতীয় বউ। মাসান্তে সফর থেকে বাড়ি ফেরা বণিকের ক্ষণিকের বিনোদন সঙ্গীনীমাত্র। জীবনের স্বাদ ও যৌবনের আহ্লাদ থেকে সে বঞ্চিতা, নিপীড়িতা। তাই তার হৃদয়ে এই অনাচার ও অতৃপ্তির যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের সর্বনাশা আগুন। এই প্রতিশোধ বিত্তের বিরুদ্ধে বিকৃতির বিরুদ্ধে, সর্বোপরি অসচেতন বাবা-মার আত্মমর্যাদাহীনতার বিরুদ্ধে।

জামিলা যখন বাড়ির বারান্দা থেকে প্রতিদিন এই পথে সুদর্শন ইমরানকে যেতে দেখত আর ওর হাঁটাচলা, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যে যে ছন্দময় ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতো তা দেখে জামিলার হৃদয়ের বঞ্চনার হাহাকার আরো উথলে উঠতো, শুরু হতো দগ্ধ হৃদয়ে কামনার অগ্ন্যুৎপাত।

দেখতে দেখতে ইমরানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে ইমরানের খোঁজ খবর নিয়ে তার ঠিকানা উদ্ধার করে। দৃষ্টি রাখতো ইমরানের প্রতি। একদিন ইমরানের ঘরে প্রবেশ করে পরিচিত হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করল। ইমরান তার প্রতি আকৃষ্ট না হলেও জামিলা আশা ছাড়েনি। কিন্তু ঋষিকে ওর ঘরে আসতে দেখে জামিলা ঋষির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ইমরানকে পাওয়ার পথে ঋষিকে কাঁটা মনে করে। তাই ঋষিকে সরিয়ে দিয়ে জামিলা ইমরানকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে যখন দেখল, উদ্দিষ্ট অর্জন তো দূরে থাক তার জীবনই দুর্বিসহ হতে চলেছে, তাই সে এখন বিভীষিকাময় জীবন থেকে বাঁচার জন্যে ইমরানের দারস্থ হয়েছে। তবুও সে আশাবাদী, ইমরান তাকে সাহায্যে করবে। প্রয়োজনে সে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে। ইমরানের সব কথা মেনে নিবে।

মূলত জামিলা দুশ্চরিত্রা ছিল না। কিন্তু ইমরানের প্রেম প্রত্যাখ্যান ও তাকে না পাওয়ার অশঙ্কা তাকে ভয়াবহ অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। সে মন্দিরের বড় পণ্ডিতকে থলেভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ঋষিকে বলীদানে প্ররোচিত করে এখন বিবেকের দংশনে ভুগছে। সে নিজেকে ঋষির ঘাতক ভাবছে। তার সরলমন এই

মহাপাপ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। তাই ইমরানের পায়ে ধরে এর প্রতিকার ভিক্ষা করছে জামিলা।

"গত রাতে তোমাকে আমি বলেছিলাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, নইলে পাপের আগুনে তুমি জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।" বলল ইমরান। "এখনও ঋষি জীবিত। যে দিন তাকে হত্যা করা হবে সেদিন থেকে ওর প্রেতাত্মা তোমার ঘাড়ে সওয়ার হবে। যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ওর প্রেতাত্মা তোমাকে তাড়াতে থাকবে। তুমি রাতে ঘুমাতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে, নয় তো আত্মহত্যা করবে। অথবা রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো চিৎকার চেচামেচি করবে। মানুষ তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবে। লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দিবে।"

"জামিলা ভয়ে জড়সড় হয়ে ইমরানের শরীরের সাথে মিশে যেতে চাইল। কাঁপছে থরথর করে। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, বল, এখন আমাকে কি করতে হবে! আর এক রাত এভাবে কাটালে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

"ঋষিকে পণ্ডিতদের কব্জা থেকে মুক্ত করে দাও।" বলল ইমরান। সে ইতিমধ্যে ভেবে নিয়েছে, জামিলা ঋষিকে মুক্ত করার ব্যাপারে কাজে লাগতে পারে।

"আমি কিভাবে ওকে মুক্ত করবো?"

"সে কাজ আমি করব। তুমি শুধু আমার সহযোগিতা করবে। এতেই তোমার মুক্তি। ঋষি খুন হলে সে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে কিন্তু তোমার যে কী ভয়াবহ অবস্থা হবে সে কথা তোমাকে আমি বলেছি।"

"তুমি যা-ই বল আমি তা-ই করব।"

"উঠ! ভেতরে চল।" ইমরান জামিলাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ইমরান জামিলাকে অন্য একটি কামরায় বসাল। কাসেম ও নিজামের কামরায় একে নেয়া উচিত মনে করেনি। ঘরে বাতি জ্বালিয়ে ইমরান জামিলাকে বলল, "একাকী একটু বসো, ভয় নেই। এখানে ঋষির প্রেতাত্মা আসবে না।"

কাসেম ও নিজামের ঘরে গিয়ে ইমরান জামিলা ও ঋষির ঘটনা জানিয়ে বলল, সে ঋষিকে মুক্ত করতে জামিলাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছে।

"মনে হচ্ছে তুমি আমাদের ফেরার করিয়ে এখানে এনে আরেক মুসিবতে ফেলে দিলে। তুমি এখানে প্রেম-প্রীতি নিয়ে মেয়েত থাকো, আমরা নিজেরাই বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।" বলল নিজাম।

"আমি ইশ্‌ক ও প্রেম-প্রিয়ার ফাঁদে আটকাবো না। আগেই আমি তোমাদের বলছি, ঐসব কুচক্রী পণ্ডিতদের আমি জানিয়ে দিতে চাই, ওদের কাদা মাটির তৈরি মূর্তিগুলো মুসলমানদের কোনই ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। আমি ওদের আখড়া থেকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে ছিনিয়ে এনে এদের বুঝিয়ে দেবো, কাদের ধর্ম সত্য। আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজ রাতেই যদি আমি মেয়েটিকে মুক্ত করতে পারি তবে আর এখানে ফিরে আসব না। তোমাদেরকেও সাথে নিয়ে যাবো এবং ওখান থেকেই গজনী রওয়ানা হবো।" বলল ইমরান।

"তুমি কি ভেবেছো?" বলল কাসেম বলখী। "কিসের ভিত্তিতে এতো দৃঢ়তার সাথে বলছো যে মেয়েটিকে তুমি মুক্ত করতে পারবে?"

ইমরান তার পরিকল্পনার কথা সব খুলে বলল কাসেম ও নিজামকে। ইমরানের পরিকল্পনা শুনে উভয়েই সম্মত হল। এরপর তিনজন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত অপারেশনের ফয়সালা করে ফেলল। এদের এ ঘরে রেখে ইমরান জামিলার কামরায় গেল।

"এখানে কি ঋষির প্রেতাত্মা দেখা যায়"? জামিলাকে জিজ্ঞেস করল ইমরান।

"না! কিন্তু ভয় লাগে।"

"তুমি পণ্ডিতদের কব্জা থেকে ঋষিকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছো, এজন্য ওর প্রেতাত্মা আর তোমাকে ভয় দেখাবে না। ঋষি মুক্ত হয়ে গেলে তোমার পেরেশানীও থাকবে না।"

"আমাকে তো বলবে, কি করতে হবে আমার?" অনুযোগের সুরে বলল জামিলা।

"তোমাকে আমি একথাও বলে দিচ্ছি, যদি সফল হও, তবে আর এ বাড়িতে তোমাকে ফিরে আসতে হবে না।" বলল ইমরান। "আমার সাথে তোমাকে গজনী নিয়ে যাব।"

"সত্য বলছো!" হতাশার সাগরে আশার ঝিলিক দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল জামিলা।

"আমি কখনও কাউকে ধোঁকা দেই না। তোমাকেও ধোঁকা দেবো না।" বলল ইমরান।

"এখন তুমি পণ্ডিতের আখড়ায় যাবে। গিয়ে বলবে, তুমি ঋষিকে স্বচক্ষে দেখতে চাও। এজন্য তোমাকে টিলার মন্দিরে নিয়ে যেতে বলবে। তোমাকে

থলে ভর্তি আশরাফী দিচ্ছি, এগুলো পণ্ডিতকে দেবে। আশা করি, এসব পেয়ে পণ্ডিত রাজী হয়ে যাবে। এছাড়া ও পণ্ডিত যা দাবী করবে রাজী হয়ে যাবে। ভয় পেয়ো না। আমি তোমার পিছনেই থাকছি। তোমার কাজ শুধু পণ্ডিতকে টিলার মন্দির পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। কারণ, সেখানে সাধু-পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ মানুষ যাওয়ার রাস্তা জানে না। সেখানে কারো যাওয়ার অনুমতিও নেই।"

"পণ্ডিত যদি আমাকে নিয়ে যেতে রাজী না হয় তবে কি করব?"

যেতে না চাইলে তুমি ছলে বলে তাকে মন্দিরে নিয়ে আসবে। আমি তাকে মন্দির যেতে বাধ্য করব। তাও যদি না যেতে চায় তবে এটিই হবে ওর জিন্দেগীর শেষ রজনী।"

"তাহলে আমার কি হবে?" উদ্বেগ কণ্ঠে বলল জামিলা। "আমি তো বলেছি, তোমাকে আর ঐ বুড়োর ঘরে যেতে হবে না। তুমি এখন আমার জিম্মায়। মন থেকে সব সন্দেহ-সংশয় ঝেড়ে ফেলে দাও। তুমি এখনই পণ্ডিতের আখড়ায় চলে যাও। আমি পেঁচার আওয়াজে তোমাকে সংকেত দিলে পণ্ডিতকে বাইরে নিয়ে আসবে।" বলল ইমরান।

জামিলাকে আশ্বস্ত করার জন্য ইমরান তাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করল। শেষে করেকটি থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাকে বিদায় করল। জামিলাকে বিদায় করেই ইমরান ঋষির ভাই জগমোহনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। জগমোহন খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে বসেছিল। এমনিতেই মোহনের মন পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। একমাত্র বোন ঋষিকে পণ্ডিতেরা দেবীর চরণতলে বলীদানের নামে হাইজ্যাক করায় পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেছিল জগমোহন।

ইমরান! পণ্ডিতেরা আমার ছোট বোনটিকে বলী দিতে নিয়ে গেছে।

আমি কোন পণ্ডিতকেই জ্যান্ত ছাড়ব না। কে-উ জানবে না কে পণ্ডিতদের হত্যা করেছে।... তুমি কি করে আসলে?

"ওখানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ইমরান। ঋষিকে তারা টিলার মন্দিরে নিয়ে গেছে। আমরা ওখানে গেলে পথ খুঁজে পাব না। পণ্ডিতেরা আমাদের ওখানে দেখলে খুন করে আমাদের মরদেহ মাটিতে পুঁতে রাখবে। ওখানে যাওয়ার চিন্তা করো না ইমরান!"

"চিন্তা আমি অনেক করেছি। তোমার মন যদি তোমাদের ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে তবে তোমাদের উচিত এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। আমি তোমাকে আর তোমার বোনকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছি।"

"ঋষি! ঋষি কোথায় এখন?" বসা থেকে লাফিয়ে উঠে ইমরানের কাছে নিয়ে আসে জগমোহন। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। এ মুহূর্তে আমার কাছে আর কিছু জানতে চাইবে না। যদি সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে আমি না পৌঁছি তাহলে বুঝাবে. আমি আর বেঁচে নেই।"

অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল মোহনের। কিন্তু ইমরান যখন নিষেধ করল, তখন আর জিজ্ঞেস করেনি। ইমরানের উপর জগমোহনের অগাধ আস্থা। সে চারটি ঘোড়া নিয়ে রাভী নদীর পাড়ে অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল এজন্যে যে, ইমরান তার বোনকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে। এরপর বোন-ভাই ও ইমরান এক সাথে এদেশ ছেড়ে চলে যাবে। ইমরানের ব্যাপারে সে মনের মধ্যে কোন সংশয়কে প্রশ্রয় দিল না। তার মনে পণ্ডিতদের অপকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ইমরানের কথায় মোহনের হৃদয়ে নতুন জীবনের আলোক জ্বলে উঠল।

রাতের প্রথম প্রহরেই মন্দিরের বাইরে একটি ঝোপের আড়ালে নিজাম, কাসেম ও ইমরান লুকিয়ে রইল। ওদের পাশ দিয়ে একটি ছায়ামূর্তি চলে গেল।

"আমি তোমার পাশেই আছি জ্যামিলা! তোমার কোন ভয় নেই।"

ইমরানের কণ্ঠ শুনে ছায়ামূর্তি থেমে গেল।

ইমরান এগিয়ে গেল। ইমরান জামিলাকে জানাল, সে একা নয়। তার সাথে আরো দু'জন রয়েছে। সামনে কি ঘটতে পারে সে ব্যাপারে ইমরান অনিশ্চিত। তাই জামিলার কাছ থেকে কাসেমও নিজামকে আড়াল করে রাখাটাই যৌক্তিক মনে করছে ইমরান। জামিলা চলে গেলে কিছুক্ষণ পর ইমরান সাথীদের নিয়ে এগিয়ে গেল।

"আমি বুঝতে পারছি না, এ কঠিন অপারেশনে তুমি কীভাবে সফল হবে?" ইমরানের প্রতি প্রশ্ন ছোড়ে দিল নিজাম।

"আমি যা কিছুই করছি আল্লাহর উপর ভরসা করে করছি। আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে সাফল্যের দু'আ করেছি। মনে আল্লাহর রহমতের বিশ্বাস নিয়ে তাঁর নামে এ কাজে নেমেছি। আমি যদি সত্য পথে থাকি তবে আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সফল করবেনই।"

রাতের অন্ধকারে মন্দিরটাকে একটা বড় ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। জামিলাকে সাহস দেয়ার জন্য একটু পর পর জোরে কাশি দিচ্ছিল ইমরান। পণ্ডিতের ঘর থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেল ইমরান। জামিলা

মন্দিরে প্রবেশ করে পণ্ডিতের ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে গেল। ইমরান দেখতে পেল, জামিলা ঘরে ঢুকেছে।

সাথীদের নিয়ে আরো এগিয়ে গেল ইমরান। মন্দিরের কাছে গিয়ে সাথীদের একটি গাছের আড়ালে দাঁড় করিয়ে সে বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে পণ্ডিতের দরজার কাছে চলে গেল। দরজার ফাঁক গলিয়ে সামান্য আলো বাইরে পড়েছে। মাত্র তিন চারটি সিঁড়ি দূরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বুঝে সে আরো সতর্ক পায়ে সিঁড়ি মাড়িয়ে একেবারে দরজার সাথে মিশে দাঁড়াল।

"আমি বুঝতে পারছি না, তুমি ছোট্ট শিশুর মতো মেয়েটিকে দেখার জেদ ধরেছো কেন? ওখানে কোন হিন্দুও যেতে পারে না, আর তুমি তো মুসলমান!" বলল পণ্ডিত।

"আমি এই প্রেতাত্মাটাকে শেষবারের মতো এক নজর দেখতে চাই। দূর থেকে দেখেই চলে আসব।"

"আমার অবশ্য আজ রাতে ওদিকে যাওয়ার কথা আছে। তবে আমি যাবো রাতের দ্বিপ্রহরে। তুমি কি এতোক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে?"

"এখনই একটু চলুন না।" অনুনয়ের সুরে বলল জামিলা। আপনার পাওনা আপনার সামনেই পড়ে আছে। না চাইতেই আমি আপনার ধারণার চেয়েও বেশি পুরস্কার দিয়েছি। আমি জানি, আপনারা কুমারী বলীদানের নামে যা করছেন সবই প্রতারণা। আমি ইচ্ছে করলে এখন আপনার ভণ্ডামীর মুখোশ জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিতে পারি। আমি আপনার জালে আটকা পড়িনি, এখন আপনি আমার জালে আটকা। আমার এতটুকু আশা আপনি পূর্ণ না করতে পারলে, বলতে পারি না, আপনার ভবিষ্যত পরিণতি কি হবে।"

জামিলা পণ্ডিতকে যাদুকরের মতো প্রভাবিত করে ফেলেছিল। একেতো ছিল থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা আর অপরদিকে জামিলার হুমকির ভূমিকাও কম ছিল না।

একটু পরই পণ্ডিত আড়মোড়া ভেংগে বসল।

"আমি তোমাকে দূর থেকে দেখিয়েই চলে আসব, চল।" পণ্ডিতের কণ্ঠ শোনা গেল।

ইমরান সতর্ক পায়ে দরজার কাছ থেকে আড়াল হয়ে গেল। পণ্ডিত ও জামিলা কামরা থেকে বের হল। দরজা বন্ধ করে পণ্ডিত হাঁটতে লাগল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ইমরান সাথীদের নিয়ে পণ্ডিতের পিছু পিছু অগ্রসর হল। এলাকাটি ছিল অনাবাদী ও জঙ্গলাকীর্ণ। ইমরানের আশঙ্কা হল, পণ্ডিত হয়তো।

তাদের হাঁটার শব্দ শুনে ফেলবে। কারণ, শুকনো পাতা আর লতাগুল্মে ভরা উঁচু নীচু পথে পা ফেলতেই শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য ছিল না পণ্ডিতের। সে জামিলাকে জড়িয়ে ধরে নানা কেলি করতে করতে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। জগতের অন্য কিছুর খেয়ালই ছিল না পণ্ডিতের।

কিছুক্ষণ পর উঁচু নীচু পাহাড়সম টিলায় চলে এলো তারা। জামিলা ও পণ্ডিত দু'টি টিলার মাঝখান দিয়ে যেতে লাগল। ওদের অনুসরণ করে ইমরানও সাথীদের নিয়ে টিলার মাঝপথে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সমস্যা হলো, কিছুক্ষণ পরপরই পথ বাঁক নিয়েছে। ঘন অন্ধকার। কোন দিকে বাঁক নিতে হবে তা অনুমান করা মুশকিল। জামিলা ও পণ্ডিতের আওয়াজ অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছিল ইমরান। তবুও তারা পথ ভুল করে বসল। এরই মধ্যে দু'টি সুড়ং অতিক্রম করে এসেছে তারা। অল্পক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পরই তারা বহু নারী কণ্ঠের কোরাস শুনতে পেল। পণ্ডিত ছাড়া একা এলে হয়তো প্রেতাত্মাদের গান মনে করে ভয়ে তারা ফিরে যেতো। তবে ইমরান পণ্ডিতদের স্বভাব সম্পর্কে জানতো। এ জন্য তার কাছে এ নারী কণ্ঠের আওয়াজ অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি।

সামনে রাস্তা এতো জটিল হয়ে উঠল যে, ইমরান ও তার সাথীদের পক্ষে জামিলা ও পণ্ডিতের অনুসরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ইমরান শঙ্কিত হলো, তারা পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। কাজেই পণ্ডিত ও তাদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে তার একটু দ্রুত পায়ে হাঁটল। কিন্তু বিধি বাম। পায়ের আওয়াজ পেয়ে থমকে গেল পণ্ডিত। কে পিছনে? পণ্ডিত কয়েক কদম পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল। এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কাউকে দেখতে পেল না পণ্ডিত। ইমরান খাপ থেকে খঞ্জর বের করে পণ্ডিতের বুকে ঠেকিয়ে দিল।

"এখানেই দাঁড়াও। একটুও নড়বে না। খুন হবে, না আমাদেরকে ছিনিয়ে আনা মেয়েটির কাছে নিয়ে যাবে? এই মুসলিম মহিলার কাছ থেকে যে মূল্য তুমি নিয়েছো তা আমি জানি। আজও ওর কাছ থেকে যে থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা তুমি নিয়েছ তাও আমরা দেখেছি। জীবিত থাকতে চাইলে আমাদেরকে মেয়েটির কাছে নিয়ে যাও।" ভয়ে শঙ্কায় কাঁপতে লাগল পণ্ডিত। জামিলাও এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। পণ্ডিত কাঁপা কাঁপা আওয়াজে বলল, "জামিলা! তুমি আমাকে ধোঁকা দিলে!"

"তুমি আমার জন্য যা করেছো, আমি তার চড়া মূল্য শোধ করেছি। আমি তোমাকে মুদ্রা দিয়েছি, শরীর দিয়েছি। আজ এখানে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত

করতে এসেছি। তুমিও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নদাও।" পণ্ডিতের প্রতি তীর্যক ভাষায় বলল জামিলা।

আরো দু'টি খঞ্জরের আগা পণ্ডিতের শরীর স্পর্শ করল। ভয়ে হীম হয়ে গেল পণ্ডিত। সে থর থর করে কাঁপতে লাগল। টিলার উপর থেকে সম্মিলিত নারী কণ্ঠের কোরাস পাহাড় ও টিলায় প্রতিধ্বনিত হয়ে মনোমুগ্ধকর এক সুর সৃষ্টি করেছিল। মনে হচ্ছিল যেন অন্য জগত থেকে ভেসে আসছে অপার্থিব এই সুর সঙ্গীত।

"আওয়াজ অনুসরণ করে আমরাই ঋষি পর্যন্ত যেতে পারব।" পণ্ডিতের উদ্দেশে বলল ইমরান। "আমরা শুধু তিনজন নই, গোটা টিলা ঘিরে রেখেছে আমাদের লোকেরা। আমাদের কথা মতো কাজ না করলে কোন পণ্ডিতকে আমরা জ্যান্ত রাখবো না। আজ একজন একজন হত্যা করে বন্দী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো। তবে আমরা খুনখারাবী চাই না। আমরা এসেছি, যে মেয়েটিকে তোমরা বলী দিতে এনেছো, শুধু ওকে নিয়ে যেতে। ইচ্ছে হলে তোমাদের পাথরের তৈরি দেবদেবীদের ডাকতে পার কিন্তু ওইসব পাথরের মূর্তি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। চল! আমাদের তাড়া আছে।"

নিঃশব্দে আগে আগে চলল পণ্ডিত। পণ্ডিত এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে, সে ইমরানকে বলার সাহস পাচ্ছিল না যে, তোমাদের কথা মতোই যাব কিন্তু হাতিয়ার ফেলে দাও।

ইমরান ও তার সঙ্গীদের সামনের পথ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। তারা শুধু শুনতে পাচ্ছিল মেয়েলী কণ্ঠের সঙ্গীত। পণ্ডিত কয়েকবার পথ বাঁক নিয়ে কয়েকটি সুড়ং অতিক্রম করে এসেছে। হুঁশিয়ার হয়ে গেল ইমরান। পণ্ডিত না আবার ওদের ধোঁকা দিয়ে কোথাও আড়াল হয়ে যায় আর ওর লোকেরা তাদের ঘিরে ফেলে। তাই সে খুবই সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিল।

পথ একটি খোলা জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল। দৈর্ঘ প্রস্থে ৫০ × ৪০ হাত হবে। এর পরই পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে মন্দির। অনেকগুলো কামরা। দেয়ালগুলোতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, পাথর কাটা মূর্তি। একটি শতরঞ্জি বিছানো। সামনে একটি বড় তশতরিতে প্রসাদ জাতীয় দ্রব্য। কুড়ি পঁচিশজন সাধু ধরনের লোক বসা। প্রত্যেকের বাহুবন্ধনে একেকটি তরুণী। তারা তরুণীদের নিয়ে হাশি-তামাশায় মত্ত। আর খোলা জায়গাটিতে দশ পনের জন তরুণী বৃত্তাকারে নেচে নেচে গীত গাইছে। এদের বৃত্তের ভেতরে বসা আরেকটি তরুণী। তাদের চারপাশে অসংখ্যা প্রদীপ জ্বলছে। সবাই অর্ধ উলঙ্গ।

থেমে গেল পণ্ডিত। সে অসহায়ভাবে তাকালো তিন মুসলমানের দিকে।

"মেয়েটিকে আমাদের হাতে তোলে দাও।" পণ্ডিতের পাঁজরে খঞ্জরের আগা স্পর্শ করে বলল ইমরান।

বড় পণ্ডিত গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, 'থামো সবাই।'

নর্তকীরা নাচ থামিয়ে একদিকে সরে গেল। সাধুরা দাঁড়িয়ে গেল। ঋষি যেভাবে বসেছিল সেভাবেই ভাবলেশহীন বসে আছে। ইমরান ও তাঁর সাথীরা পাগড়ী দিয়ে চেহারা ঢেকে রেখেছিল। তারা দ্রুত খাপে ভরা তরবারী কোষমুক্ত করল। বড় পণ্ডিতকে আরো এগিয়ে দু'উন্মুক্ত তরবারীর মাঝে দাঁড় করানো। ইমরান ঋষিকে ধরে উঠাল। ঋষি চোখ বড় করে তাকে দেখছিল, যেন সে তাকে চিনতে পারছে না। ইমরান তাকে ডাকল, হাতে ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু ঋষি তার দিকে ড্যাব ড্যাব চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। পরিষ্কার বোঝা গেল তাকে এমন কিছু পানাহার করানো হয়েছে যার প্রভাবে তার স্বাভাবিক স্মৃতিবোধ রহিত হয়ে গেছে।

ইমরান তাকে বগলদাবা করে রওয়ানা হল। ঋষিও কোন বিরূপতা না দেখিয়ে সহগামী হল। পিছনে ফিরে সব সাধু পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে ইমরান বলল, "যদি কেউ জায়গা থেকে একটু নড়াচড়া কর তবে সবাইকে হত্যা করে ফেলব। তোমাদের সবাইকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে।"

"এর উপর তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব কতক্ষণ থাকবে?" বড় পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করল ইমরান।

"সকাল পর্যন্ত কেটে যাবে।" জবাব দিল বড় পণ্ডিত। "যাও, ওকে তোমরা নিয়ে যাও।"

"তোমাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। রাস্তা খুব জটিল। আমাদের পুরো খেয়াল নেই।" বলে বড় পণ্ডিতের ঘাড়ে তরবারীর ফলা ছোয়াল ইমরান।

"আমাদের আগে আগে চলো।"

কেনা পশুর মতো পণ্ডিতকে আগে আগে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল ইমরান।

সে ভয়ে আতঙ্কে জড়সড়। ফেরার পথে পণ্ডিত যখন দু'পাহাড়ের সুড়ং পথে ঢুকল, তখন গোয়েন্দারা রাজার যুদ্ধ সরঞ্জামে আগুনে ধরিয়ে দিয়েছে। ইমরান ও তার সাথীরা তরবারী উন্মুক্ত করে পণ্ডিতের পিছে পিছে আসছে। জামিলাও তাদের সাথেই হাঁটছে। ঋষি অচেতনের মতো হাঁটছিল তাদেরই সাথে।

একটু সামনে এগুতে তাদের চোখে পড়ল শহরের দিকে আসমান ছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখা। ইমরান আগুন দেখে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল—

"আল্লাহু আকবার।" সাথীদের বলল, "দেখ, বাঘের বাচ্চারা রাজার কোমর ভেঙে দিয়েছে। গজনী আক্রমণে প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের আল্লাহ এখানেই পরাজিত করে দিলেন।"

"হায়! একি, আমাদের শহরে এতো আগুন! হায় ভগবান! গোটা শহর জ্বলছে!" ভয়ার্ত আওয়াজ শোনা গেল পণ্ডিতের কণ্ঠে।

"এটা আমাদের প্রভুর গযব। তোমাদের উপর আমাদের প্রভু গযব নাযিল করেছেন। তোমাদের মন্দিরগুলোকেও নারীভোগ ও বেলেল্লাপনা থেকে মুক্ত রাখনি তোমরা। এই নিরপরাধ মেয়ের আহাজারি আর তপ্ত নিঃশ্বাসে তোমাদের শহরে আগুন ধরে গেছে। তোমাদের এই কুমারী বলীদান সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজী। আমরা জানি, কিভাবে এবং কোন মতলবে অবলা মেয়েটিকে তোমরা তুলে এনেছিলে।

তোমাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, জীবিত ছেড়ে দেবো। তাই জীবিত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমরা ঋষিকে নিয়ে গেছি এটা ঘুণাক্ষরে যেন কেউ জানতে না পারে। তোমাদের রাজা এই মেয়েকে এখনও দেখেনি। এর স্থলে অন্য কোন মেয়েকে ধরে এনে বলী দিবে।

এরপরও যদি দেখি, তুমি আমাদের কথার ব্যতিক্রম কিছু করছো, তাহলে জেনে রেখো, যে আগুনের তোমাদের রাজার সব যুদ্ধ সরঞ্জাম জ্বলছে, সেই আগুন সব পণ্ডিতকেও জ্বালাবে।"

পণ্ডিত জ্বলন্ত আগুন আর মানুষের শোরগোল ও চিৎকার শোনে হতভম্ব হয়ে গেল। পণ্ডিত তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ইমরান দ্রুত নদীর দিকে চলল। জগমোহন ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদেরই জন্য। এক রকম দৌড়ে পৌছল তারা নদীর পাড়ে।

"গোটা শহর জ্বলছে। মনে হয় আমাদের বাড়িতেও আগুন লেগেছে। এ আগুন কিভাবে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল!" ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল জগমোহন।

"জ্বলতে দাও। তোমরা আর ঘরে ফিরে যাচ্ছো না। আমার সাথে যাচ্ছো। কাজেই তোমাদের নিজেদেরকে আর হিন্দু মনে করা ঠিক হবে না। আমাদের ধর্মের সত্যতা দেখ। তোমার বোনকে পণ্ডিতেরা বলী দিতে নিয়ে গিয়েছিল, আমি দু'আ করেছিলাম, হে খোদা! আমাকে সাহায্য করুন যাতে আমি এই নিরপরাধ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারি। তিনি আমার দুআ কবুল করেছেন। আমাদের মা'বুদই সত্য। দেখ রাজার সব যুদ্ধ সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আর তোমার বোন- যার বলী হওয়ার কথা ছিল সে এখন আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে

আছে। তোমাদের অসংখ্য দেবদেবীর সামনে থেকে ওকে আমরা ছিনিয়ে এনেছি, ওরা কিছু করতে পারল?"

ঋষি! বলে মোহন বোনকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঋষি মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ইমরান বলল, পণ্ডিতেরা ওকে ওষুধ খাইয়ে বিগড়ে দিয়েছে। সকাল পর্যন্ত এর রেশ থাকবে। এখন আমাদের হাতে সময় নেই। বোনকে তোমার ঘোড়ায় তুলে নাও।

ঋষিকে জগমোহন আর জামিলাকে ইমরান তার ঘোড়ায় তুলে নিল। কাসেম ও নিজাম অন্য দু'টি ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলা গজনীর পথে। এদিকে শুরু হল রাজা ও পণ্ডিতদের নতুন চক্রান্ত।

অভিন্ন পথের অভিযাত্রী

ভোর হল। রাজা জয়পালের সকল যুদ্ধ-সরঞ্জাম জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। দেড় মাইল এলাকা জুড়ে শুধু ছাই-ভস্ম আর আগুনের কুণ্ডলী। তখনও মানুষ বেঁচে যাওয়া পণ্যসামগ্রী রক্ষায় সচেষ্ট। এদিকে মুসলমান পাড়ায় শুরু হয়েছে হিন্দুদের সন্ত্রাস। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ আর লুটতরাজ চলছে। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। মুসলিম নারী-পুরুষদের টেনে হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। মহিলাদের গায়ের অলংকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। রাজা জয়পাল নিজেই এই নির্দেশ দিয়েছে। রাজা বলেছে, মুসলমানদের ঘরে যা পাও হাতিয়ে নাও এবং সরকারের কোষাগারে জমা কর।

রাতে ইমরান ও তার সাথীরা পণ্ডিতের কাছ থেকে ঋষিকে ছিনিয়ে নেয়ার পর ব্যর্থ পণ্ডিত শহরের দিকে রওয়ানা হলো। শহর জ্বলছে কিন্তু সে বিষয়ে পণ্ডিতের মনে বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই। সে সোজা মন্দিরে প্রবেশ করলো এবং একটু পরই কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে বেরিয়ে এলো। শহরের সকল মানুষ আগুনের পাশে এসে জড়ো হয়েছে। ছেলে-বুড়ো, প্রৌঢ়-যুবা, যুবতী-কিশোরী কেউ বাকি নেই। পণ্ডিত ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এই দুরবস্থার মধ্যেও খুঁটে খুঁটে দেখছিল মেয়েদের। কারণ, ঋষির শূন্যতা তাকে পূরণ করতেই হবে। হঠাৎ একটি চেহারায় দৃষ্টি আটকে গেল পণ্ডিতের। একটি কিশোরীর প্রতি ইঙ্গিত করে দূরে সরে গেল।

একটু পরই দেখা গেল, কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি এসে হাজির। মন্দিরে বিশেষ গাড়ির আগমনে সসম্মানে মেয়েরা এদিক ওদিক সরে গেল। পণ্ডিতের এক লোক ঐ কিশোরীকে ধরে ফেলল, অপর একজন মেয়েটির নাকের ওপর একটি রুমাল রেখে তাকে টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলল। অবস্থার আকস্মিকতায় ব্যাপারটি কেউ তেমন আন্দাজ করতে পারল না। পণ্ডিতের ঈশারায় দ্রুত মেয়েটিকে নিয়ে গাড়ি পৌঁছে গেল মন্দিরে। বেলা বাড়ার আগেই তাকে টিলার মন্দিরে পৌঁছে দেয়া হল। যে টিলায় আটকে রাখা হয়েছিল ঋষিকে। কিন্তু মেয়েটি চেতনানাশক পদার্থের প্রভাবে তখনও হুঁশ ফিরে পায়নি।

পৌত্তলিকতাকে কখনো ধর্ম বলা যায় না। আজও বিবেকবান মানুষের কাছে তা কখনো ধর্ম নয়। অলীক কল্পনা, রেওয়াজ-রসম, মনুষ্য সৃষ্ট আনুষ্ঠানিকতা ও গোড়ামীর সমন্বিত রূপ পৌত্তলিকতা। কোনো উর্বর মস্তিষ্কের মতলববাজ এই অমানবিক কর্মগুলোকে ধর্ম হিসাবে আখ্যা দিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করেছে। পৌত্তলিকতাবাদে আল্লাহর পবিত্র সত্তার অনুভব অসম্ভব। কথিত এ মতবাদে নিরীহ অসহায় মেয়ে এবং শিশুদের অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়, বিনা অপরাধে এদের হত্যা করা হয়; ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ পৌত্তলিক ধর্মের মূল ভিত্তি। পৌত্তলিক ধর্মের পণ্ডিতেরা এসব অমানবিক ও অলীক অপকর্মগুলোকে ধর্মীয় বিধান বলে সমাজে চালু করেছে আর ভক্তেরা এগুলোকেই মেনে নিয়েছে ধর্মীয় বিধান হিসেবে। এরা আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য মূর্তি বানিয়েছে এবং প্রতিটি বড় বড় সৃষ্টির পূজা করছে ও অসংখ্য দেব-দেবীকে একেকটা মহান সৃষ্টি এবং শক্তির অধিকারী বলে প্রচার করছে। এখনও পর্যন্ত এদের মধ্যে দেখা যায়, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, সাপ-বিচ্ছু, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি ইত্যাদির পূজা করতে।

গজনীর শার্দুল-গোয়েন্দারা যে দক্ষতায় রাজা জয়পালের যুদ্ধ সামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দিল জয়পালের বাহিনী তাদের বিন্দু বিসর্গও আঁচ করতে পারলো না। জয়পাল উল্টো ভাবলো, কিশোরী বলীদানে বিলম্বের কারণে দেবতা অসন্তুষ্ট হয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। অবশ্য সে একথাও বলেছিল, অসম্ভব নয় যে, এটা সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দারা করেছে। কিন্তু এ অগ্নিকাণ্ড 'দেবতার-রোষ না প্রতিপক্ষ গোয়েন্দাদের কাজ' রাজা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিল না। হতাশা ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত রাজা ক্ষুব্ধকণ্ঠে সেনাপতিকে বলল, "পণ্ডিতকে ডাক। দেবতা চরম রুষ্ট হয়েছে। একটির বদলে দু'টি মেয়েকে বলী দিতে হবে,

তাড়াতাড়ি।" রাজা চেঁচিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বলছিল, "মুসলমানদের সব ঘর জ্বালিয়ে দাও। এদের সবকিছু লুটে নাও। আর সকল মুসলমান মেয়েকে ধরে এনে আমার সামনে হাজির করো।"

সত্যিকার যারা আগুন লাগিয়েছিল এরা ছিল দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, দূরদর্শী। জয়পালের দেবতাদের শাসন এদের উপর অচল। জয়পাল যখন অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত নিয়ে ভাবছে আর হতাশা ও মর্ম-যাতনায় ভুগছে ইত্যবসরে গোয়েন্দারা তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে কয়েকশ' মুসলমান নারী শিশুকে ধরে এনে রাজার সামনে হাজির করা হলো। এদের অধিকাংশই ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরের নারী ও শিশু। বলপূর্বক এদেরকে নিজেদের হেরেম থেকে ধরে আনা হয়। রাজা চোখ বড় বড় করে অগ্নি দৃষ্টিতে মুসলিম নারী-যুবতীদের দেখছিল। রাজ্যার এই দৃষ্টিতে যেমন ছিল রোষ তেমনি ছিল পাশবিক উন্মত্ততা।

মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে একদল সুন্দরী যুবতী-কিশোরীকে রাজার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অন্যদের ডিঙ্গিয়ে রাজার সামনে নিয়ে গেল। রাজা এদের দেখে বলল, "তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা সবাই সুন্দরী। অন্যথায় তোমাদের সাথে এমন ব্যবহার করা হত, জীবনের জন্য তোমাদের জাতি একটা শিক্ষা পেত। এখন থেকে তোমরা রাজ মহলে থাকবে। তোমাদের ধর্মকে ভুলে যেতে হবে। যেদিন তোমাদের লোকেরা এসে বলবে, অগ্নিকাণ্ড কারা ঘটিয়েছে সেদিন তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে।" একথা বলে পৈশাচিক হাসি হাসল রাজা।

"তোমাদের ধর্মের মতো আমাদের ধর্ম এমন ঠুনকো নয় যে, তোমাদের কথায় ভুলে যাব।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল এক কিশোরী।

"এই মেয়ে! বকবকানি বন্ধ কর।" গর্জে উঠল এক মন্ত্রী। "জান, কার দরবারে তোমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছ?"

"তোমাদের মহারাজ আমাদের খোদা নয়।" বলল অন্য এক কিশোরী। "অসহায়, নিরপরাধ মেয়েদের উপর যে রাজা হাত উঠাতে পারে তাকে কোন মুসলিম নারী সম্মান করতে পারে না। মহারাজা! তুমি মনে রেখো, তোমার যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার আমরা হাসি মুখেই বরণ করব। কিন্তু তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তোমাকে মৃত নয় জীবন্ত জ্বলতে হবে। তোমার কোন দেবতাই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ইতোমধ্যে তুমি দু'বার পরাজিত হয়েছো। একটি নয় হাজার কিশোরীকে দেবীর চরণে বলীদান করলেও তোমার পরাজয়

বিজয়ে রূপান্তরিত হবে না। পরাজয় তোমার বিধিলিপি। তুমি আমাদের শাস্তি দিলে এরচেয়ে শতগুণ বেশি কঠিন শাস্তি তোমাকে আমাদের প্রভু দেবেন।"

"এদের নিয়ে যাও।" নির্দেশ করল রাজা। সৈনিকেরা টেনে-হেঁচড়ে মুসলিম মেয়েদেরকে বন্দিশালায় নিয়ে গেল।

* * *

সুলতান মাহমূদ খোরাসান ও বোখারাকে নিজের শাসনে নিয়ে এলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। সে সময় বাগদাদের খেলাফতে আসীন হন কাদের বিল্লাহ আব্বাসী। ইসলামী নীতি অনুযায়ী সকল ছোট বড় রাষ্ট্র ও রাজ্য বাগদাদ খেলাফতের অধীনস্থ। সকল রাজ্য ও রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রীয় খেলাফতের ফরমান মানতে বাধ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের দুর্নীতি, আদর্শচ্যুতি এবং আঞ্চলিক শাসকদের ভোগ-বিলাসিতা ও ক্ষমতালিপ্সা খেলাফতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং শাসকদের মাঝে সৃষ্টি করে পারস্পরিক বিদ্বেষ। তখন শুধু বাগদাদ খেলাফত প্রতীকী কেন্দ্ররূপে বেঁচে আছে। তবুও সুলতান সুবক্তগীন কেন্দ্রীয় খেলাফতের সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। সুলতান মাহমূদও খেলাফতের প্রতি আনুগত্য বহাল রাখলেন। বুখারা ও খোরাসানকে গজনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে সুলতান মাহমূদ কেন্দ্রীয় খলিফাকে লিখলেন— "আমার এলাকার মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে যে বিপদগ্রস্ত হয়েছে সে বিপর্যয় এখনো কাটেনি। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী ক্ষমতালিপ্সুদের বিরুদ্ধে আমাকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এরা আমাদের ভূখণ্ড টুকরো টুকরো করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল আর নিজেদেরকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করছিল। আমি তাদের কাছে বহুবার মৈত্রী ও সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছি, অমুসলিমদের ক্রীড়নক হয়ে মুসলিম জাতি নাশ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছি কিন্তু আমার শান্তিপ্রস্তাব ও উদারতাকে তারা হীনমন্যতা ও দুর্বলতা মনে করেছে। এরা পরিস্থিতি এতই বিপদাপন্ন করে তুলেছিল যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমরা আপনার অনুমোদন গ্রহণ করার সুযোগও পাইনি। তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে হয়েছে। দৃশ্যত আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, বোখারা ও খোরাসান বিদ্রোহী ও গাদ্দারদের থেকে ছিনিয়ে এনে আমি তা গজনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অবশ্য একে আমি সুসংবাদ ও সাফল্য মনে করি না। মূলত এটা একটা জাতীয় দুর্ঘটনা যে, আমরা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত। যে সমষ্টিগত শক্তি ইসলামের সুরক্ষা এবং অগ্রগতির জন্য ব্যয় করার কথা

ছিল, যে শক্তি ইসলামের সীমানাকে বিস্তৃত করার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল সেই অপরিমেয় সম্ভাবনাকে আমরা অভ্যন্তরীণ হানাহানিতে অপব্যয় করেছি...।

আমি ময়দানের লোক। আমার মনে হয়, আমার জীবন রণাঙ্গনে কেটে যাবে। আমার লাশ হয়ত কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকবে। আমার ভয় হয় ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে যেন আমি নিহত না হই। এমন লড়াই সংঘাতে আমার মৃত্যু হলে আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দেব? আমি আমার রাজত্বের পরিধি বৃদ্ধি করতে চাই না, আমি চাই ইসলামের বিস্তৃতি। রাজমুকুট মাথায় পরে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসার অবকাশ আমি কখন পাব! হিন্দুস্তানের অসংখ্য দেব-দেবী আমাকে তিরস্কার করছে। রাজা জয়পাল হিন্দুস্তানের সকল রাজাকে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে সমরায়োজন করছে। আমি যখন ওদের দিকে অগ্রসর হই তখন আমার মুসলমান ভাইয়েরা পিছন থেকে আমার পিঠে ছুরি মারে। আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে আমার ভাই ও মুসলিমরা অভিন্ন শত্রুতে পরিণত হয়েছে...।

আপনি কি ঘোরী, তিবরিস্তানী, সামানী ও এলিখানীদের বলতে পারেন যে, আমরা সবাই একই নবীর উম্মত? এদেরকে কি একথা শুনানো সম্ভব যে, ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে বিধর্মীদের মোকাবেলায় টিকে থাকা সম্ভব নয়...?

এখানে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনো বিদ্যমান। জনাবের দু'আ ও সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য। গজনী সালতানাতের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল নয়। আমি জানি, আমাকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা আপনার পক্ষেও অসম্ভব। আমি তা প্রত্যাশাও করি না। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সহযোগিতা করেন।

আপনার গুণমুগ্ধ
মাহমূদ
খাদেম
"গজনী সালতানাত"

সুলতান মাহমূদের পত্রের জবাবে বাগদাদের খলিফা কাদের বিল্লাহ্ আব্বাসী লিখলেন...

"আপনার চিঠি পাঠান্তে দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হইনি। অবশ্যই ব্যাপারটা মোটেও নতুন নয়। আমাদের শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার নেশা মিল্লাতের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আজ যারা পারস্পরিক

জিঘাংসায় লিপ্ত এরা ইসলাম ও মুসলমানের অমিত সম্ভাবনাকে নিজেদের হীন স্বার্থে অপাত্রে ব্যবহার করছে। আপন ভাইকে নিশ্চিহ্ন করতে এরা ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলেছে। উম্মতে মোহাম্মদীকে নিজেদের দাস ও প্রজা বানিয়ে রাখার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের শাসনের বিরুদ্ধে অপবাদ ও মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে গৃহযুদ্ধকে উস্কে দিচ্ছে। এটা এখন মুসলিম শাসকদের প্রধান কাজে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে আমাদের শাসকদের মধ্যে চলছে এই অপপ্রয়াস। নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতার মোহে উম্মাহকে ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত করছে। আর এক অঞ্চলের মুসলমানদেরকে অপর অঞ্চলের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। ফলে খেলাফতের মানচিত্র শত ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে। আর এরই সুযোগ নিচ্ছে বিধর্মীরা। বিধর্মীরা আমাদের জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী ঢালছে। আর মুসলিম খেলাফতকে ভেঙ্গেচুরে বিনাশ করছে...।

আমাদের শাসকবর্গ মোটেও বুঝতে চাচ্ছেন না, আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেলে প্রতিটি অংশই বিধর্মীদের সহজ শিকারে পরিণত হবে। কাণ্ড থেকে শাখা ভেঙ্গে গেলে যেমন শুকিয়ে মরে যায়, তেমনি কেন্দ্রীয় খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুসলিম রাজ্যগুলোও অল্পদিনের মধ্যে ইসলামী চেতনা হারিয়ে বিলীন হয়ে যাবে। এভাবে যদি একের পর এক শাখা ভাঙ্গতে থাকে তাহলে এক সময় মুসলিম খেলাফতের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে ...।

গৃহযুদ্ধকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য যদি আপনাকে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় সেজন্য আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। তবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, ক্ষমতার মোহে যেন যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়েন। আপনি বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ জনগোষ্ঠীগুলোকে একত্র করুন। তাদেরকে ঐক্য-মৈত্রীর বাঁধনে আনতে চেষ্টা করুন। হিন্দুস্তানে মুসলমানরা দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। কতিপয় শাসক হিন্দু রাজাদের ভয়ে এবং নিজেদের ভোগ ও বিলাসিতার উপকরণ আমদানী অক্ষুণ্ন রাখার হীন স্বার্থে ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মনে করি, এদেরকে দমন করে হিন্দুস্তানের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া আপনার দায়িত্ব। তাদের ঈমান ও ইজ্জতের সুরক্ষা করা আপনার কর্তব্য। অনৈতিকতার আড্ডা হিন্দুস্তানের দেব-মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে সেখানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা আপনারই কাজ...।

যদি আপনার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন থাকে, আপনার উদ্দেশ্যে যদি কোন কলুষতা না থাকে, আল্লাহর পথে জিহাদই যদি হয় আপনার লক্ষ্য, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর

সাহায্য আপনার পদচুম্বন করবে। ক্ষমতার মোহে এবং জাগতিক স্বার্থে যারা যুদ্ধ করে দৃশ্যত বিজয়ী হলেও এ সফলতা ক্ষণিকের। স্থায়ী সাফল্য তারাই লাভ করে যারা সত্যের পথিক ও ন্যায়ের পথে চলে।"

বাগদাদের খলিফা এই চিঠিতেই সুলতান মাহমূদকে খোরাসান, বোখারা, আফগানিস্তানসহ বিশাল ভূখণ্ডের সুলতান ঘোষণা করেন এবং তাকে 'ইয়ামীনুদ্দৌলা' এবং 'আমিনুলমিল্লাত' অভিধায় অভিষিক্ত করেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা লেখেন, রাজা জয়পালের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং গৃহযুদ্ধ অবদমনে সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনী, জনবল ও অস্ত্রবল একেবারেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক আবু নসর মুস্কাতি এবং আবুল ফজলের রচনা থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময়ে সুলতান মাহমূদের অধীনে যে পরিমাণ দক্ষ সৈনিক, যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ আলেম-উলামা ছিলেন এবং তার প্রশাসনে যে পরিমাণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী বাহিনী ছিল সমকালীন কোন শাসকের এমনটি ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞ ও দক্ষ এসব লোকদের পারিতোষিক হিসাবে সুলতান মাহমূদকে মোটা অঙ্কের খরচ বহন করতে হতো। তিনি তার প্রতিবেশী গোলযোগপূর্ণ রাষ্ট্র এবং পৌত্তলিক ভারতের আনাচে কানাচে গোয়েন্দা বাহিনীকে যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এর পেছনেও তাকে বিপুল খরচ বহন করতে হতো। বস্তুত এসব কারণেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়েন সুলতান মাহমূদ। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলল আর অপরদিকে জয়পালের নেতৃত্বে হিন্দু রাজারা গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। একদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন অপরদিকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় সেনাশক্তির ঘাটতি। যারা ছিল তার মূল শক্তি এরাই হয়ে গেল প্রতিপক্ষ।

সুলতান মাহমূদের অবস্থা যখন চতুর্মুখী আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক দৈন্যতায় বিপর্যস্ত, সুলতানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঠিক এই মুহূর্তে আঁধার ভেদ করে দেখা দিল আলোর আভা ...।

চতুর্দিক থেকে গোয়েন্দা পরিবেশিত দুঃসংবাদের ঘনঘটা। রাজা জয়পাল আক্রমণ শানাচ্ছে। আমীর শ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। গভীর দুশ্চিন্তায় তলিয়ে গেলেন সুলতান। নিজের আসনে বসে উদাস মনে উপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ইত্যবসরে প্রহরী এসে খবর দিল, দু'জন আগন্তুক সুলতানের সাথে জরুরী সাক্ষাৎ করতে চায়। এরা চিস্তানের বাসিন্দা। সুলতান তাদেরকে হাজির করতে বললেন। তারা এল। সুলতান তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে কাছে

ডাকলেন এবং আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। তারা বলল, আমরা চিস্তানের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামে সুপেয় পানির অভাব। অনেক দূর থেকে আমাদেরকে খাবার পানি বহন করতে হয়। গ্রামের সবাই মিলে আমরা একটি কূপ খননের জন্য কাজ শুরু করেছিলাম। আমাদের ধারণা মতে পানি খুব বেশি গভীরে থাকার কথা নয় এবং জমিনও খুব বেশি শক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাত্র তিন হাত খননের পরই আর খনন করা সম্ভব হচ্ছিল না। পাথরের চেয়েও শক্ত মাটি দেখা গেল। খোরাসান ও চিস্তানের মহামান্য সুলতান! জমিন শক্ত ও পাথুরে হওয়াতে কোন সমস্যা ছিল না। আমরা তবুও খননকার্য অব্যাহত রাখতাম। কিন্তু তিন ফুট গভীরেই এমন মাটি দেখা দিল যে, আমাদের কোদাল, শাবল কোন কাজ করছিল না। আমরা জোরে আঘাত করলে মাটি থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, কোদাল ভেঙ্গে যায়। কিন্তু পাথর ভাঙ্গে না। এটা নিছক পাথর নয়। পাথরের রঙ এমন নয়। আমাদের বিশ্বাস, এটা কোন মূল্যবান ধাতু হবে। অনেকেই বলাবলি করছে, আগেকার কোন রাজা-বাদশাহর গচ্ছিত ধন-সম্পদ এগুলো। যারা এই সমস্ত ধন-সম্পদ গচ্ছিত রেখেছে তাদের প্রেতাত্মা ও জিনদের বসবাস এখানে। গ্রামের মানুষ এসব বলাবলি করে খুব ভীতু হয়ে পড়েছে। ভয়ে কেউ ওদিক মাড়াতে চায় না। একজন বুযুর্গ ব্যক্তি আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন সুলতানের কাছে এই খবর পৌঁছাতে। কারণ, যদি গচ্ছিত ধন-সম্পদ হয়ে থাকে তাহলে এগুলো উন্মুক্ত পড়ে রয়েছে। হেফাযত করা দরকার। আর কোন দামী ধাতু হলেও বিষয়টা সুলতানের নজরে থাকা উচিত।

সুলতান মাহমূদ তাদের কথা শুনে ভূমি সম্পর্কে কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কয়েকজন কমান্ডারের সাথে কিছুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে কথিত এলাকা পরিদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, জিন-ভূত এসব কিছুই না। আপনারা ওখানে গিয়ে আরো খনন কার্য চালিয়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমাকে অবহিত করুন।

কয়েকদিন পর সুলতান মাহমূদকে খবর দেয়া হল, এটি কোন গুপ্তধন নয়, এটি স্বর্ণের খনি। ভূমি থেকে মাত্র চার-পাঁচ হাত গভীরে স্বর্ণস্তর। খনন করার পর বিরাট এলাকা জুড়ে স্বর্ণখনি দেখা গেল।

ঐতিহাসিক গারদেজী ও কাসেম ফেরেশতার মতে, সুলতান মাহমূদের শাসনামলেই ওই খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন শুরু হয়। কিন্তু সুলতান মাহমূদের ইন্তেকালের পরে তার ছেলে মাসুদ যখন ক্ষমতায় আসীন হন তিনি পিতার নীতি আদর্শের পরিপন্থী কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি নিজেকে ভারতের হিন্দু রাজাদের

মতো সুলতানের পরিবর্তে রাজা ঘোষণা করেন, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। উত্তোলিত স্বর্ণখনির আয় অনৈসলামিক কর্ম, বিনোদন, সাজসজ্জা, মিনাবাজার প্রতিষ্ঠা ও খেল-তামাশায় ব্যয় করতে থাকেন। তখন এক রাতের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে স্বর্ণখনি মাটির গভীরে হারিয়ে গেল। পরবর্তীতে বহু খনন করেও মাসুদ আর স্বর্ণখনির অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না।

স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হবার পর মাহমূদ যখন দেখলেন, প্রকৃত পক্ষে এটি খাঁটি স্বর্ণ খনি তখন তিনি তার পীর ও মুর্শিদ আবুল হাসান খেরকানির দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন, "আমার আব্বু জীবদ্দশায় এই স্বর্ণখনিটিকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম, একটি স্বর্ণের গাছ আমার ঘরের ছাদ ফুড়ে উপরের দিকে উঠেছে এবং এর ডালপালা অর্ধেক দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

...এরপর আমার জন্ম হলো। অবশ্য এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করা হলো যে, আমার শাসনামলে গজনী সালতানাতের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়বে। এখন স্বর্ণখনি যা আবিষ্কৃত হলো সেটির অবস্থানও অনেকটা গাছের মতো। স্বর্ণের স্তর মাটির অল্প গভীরে গাছের ডালপালার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। আমার প্রিয় পীর ও মুর্শিদ! আপনি আমাকে মেহেরবানী করে বলুন, এসবের তাৎপর্য কী?"

"জমিনে এবং আসমানে আমাদের দৃষ্টিসীমার অগোচরে যা রয়েছে এর প্রকৃত কারণ একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন" বললেন, আবুল হাসান খেরকানী। "তুমি মনে মনে যা ধারণা করেছ আল্লাহ্ সেটিও জানেন। তুমি এখনও যা চিন্তা করোনি সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তোমার একথা অনুধাবন করা উচিত, আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব রাজা-বাদশাহকে এ ধরনের অলৌকিক ইশারা করে থাকেন যারা রাসূলের প্রকৃত উম্মত হয়ে থাকেন। তুমি যদি আল্লাহর রাসূলের প্রেমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই জিহাদ করে থাক তাহলে যে সমস্ত লোক মুসলমান হওয়ার পরও ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন এবং ক্ষমতা ও রাজত্বের লোভে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, অহেতুক খুনোখুনি করছে আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এখন অভাবে নিপতিত হয়েছ এবং তুমি শুধু আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য কামনা করছ। আল্লাহ্ তোমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। গাছের আকৃতিতে তোমার অভাব পূরণে মাটির ভেতর থেকে স্বর্ণখনি উন্মোচন করে দিয়েছেন।

প্রত্যেক সুলতানেরই উচিত বৃক্ষ সদৃশ হওয়া। বৃক্ষ যেমন নিজে সূর্য-তাপ সহ্য করে মানুষকে ছায়া দেয়, মানুষ বৃক্ষের অঙ্গহানি করেও বৃক্ষের নীচে বসে আরাম করে। শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষ বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। নব উদ্যমে আবার জীবনকর্ম শুরু করে। সুলতানদের ভূমিকাও এরূপ হওয়া উচিত। বৃক্ষ মানুষের রক্ত পান করে না, জমিন থেকে খাদ্য শোষণ করে মানুষের উপকার করে। মানুষকে দেয় কিন্তু মানুষের কিছু নেয় না।... মাহমূদ! নিজেকে এরকম ঘন শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ মনে কর। বৃক্ষের গুণাবলী আত্মস্থ কর। বৃক্ষ যেমন মানুষের উপকার করে, মানুষ থেকে উপকৃত হয় না, মানুষ বৃক্ষ কাটে কিন্তু বৃক্ষ মানুষ কাটে না। বৃক্ষ মানুষের বহুবিধ কাজে লাগে। কেউ গাছ চিরে পালঙ্ক বানায়, কোন গাছ হয় অন্ধের হাতের যষ্টি। কোন গাছ রাজা-বাদশাহদের সিংহাসন তৈরিতে লাগে...।

"মাহমূদ! যে সুলতান নিজেকে মানুষের শাসক মনে করে, মানুষকে মনে করে তার প্রজা। নিজেকে মনে করে মানুষের অন্নদাতা, বস্ত্রদাতা। বৃক্ষের মত গুণাবলী আত্মস্থ করতে পারে না, তাদের সিংহাসন উল্টে যেতে বেশি সময় লাগে না।

মাহমূদ! দু'টো জিনিস মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। একটি সম্পদ অপরটি রাজত্ব বা ক্ষমতা। সেই ব্যক্তিও শয়তানে পরিণত হয়, রাজত্ব বা সম্পদ কোনটি তার নেই কিন্তু এ দু'টোর মোহে সে আচ্ছন্ন। যার মাথায় রাজত্বের মুকুট রাখা হবে, সে যদি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে মাথা নত করতে না পারে তার দ্বারা মানুষের কোন উপকার হয় না। এসব শাসক মানুষের অনুকম্পা ও শ্রদ্ধা পায় না। এসব শাসক মানুষকে মানসিক ও সামাজিক সুখ-স্বস্তি দিতে ব্যর্থ হয়। তারা আল্লাহ্র কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। যে শাসকদের ভোগ-বিলাসিতার বিপরীতে গণমানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, আহাজারি-ফরিয়াদ, কষ্ট-দুর্ভোগের কান্না রয়েছে তাদের এই দুঃখ-দুর্ভোগগুলোই আখেরাতে সাপ-বিচ্ছু হয়ে এসব অত্যাচারী শাসকদের দংশন করবে...।"

খেরকানী আরো বলেন, "মাহমূদ! তুমি আল্লাহ্র সাহায্য চেয়েছ, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেছেন। একটু চিন্তা করে দেখ, তুমি আল্লাহ্র কোনো নবী-রাসূল নও। আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতাও নও, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা জমিনের পেট চিরে স্বর্ণখনি উন্মোচন করে তোমার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করেছেন। এই স্বর্ণ তোমার নয়, সালতানাতের। এ স্বর্ণের মালিক তুমি নও, দেশ ও জনকল্যাণে তা ব্যয় করতে হবে। তুমি যদি

ক্ষমতা ও অহমিকায় আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ ও অনুকম্পাকে ভুলে যাও, ভুলে যাও তোমার প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিস্মৃত হও গণমানুষের অধিকার, তাহলে জমিন আবার তার সম্পদ লুকিয়ে ফেলবে। যা আল্লাহ্ দান করেন তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। তাঁর অর্থবহ ইঙ্গিতকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও।"

স্বীয় পীর ও মুর্শিদ আবুল হাসান খেরকানীর কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে সুলতান মাহমূদ সৈন্যবাহিনীকে সুসংগঠিত করতে মনোনিবেশ করলেন। দেশের শাসন ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কার করলেন, তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন আনলেন। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় উন্নতি পরিলক্ষিত হল। তবুও সাধারণ মানুষ তার সেনাবাহিনীতে তরুণ, যুবক ছেলেদের ভর্তি করার জন্য উৎসাহে এগিয়ে আসত। তরুণ যুবকরা সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়াকে আভিজাত্যের পরিচায়ক মনে করত।

সরকারি ব্যবস্থাপনা ও নতুনভাবে সৈন্যবাহিনী ঢেলে সাজানোর পর মাহমূদ রাজা জয়পালের গতিবিধি জানার অপেক্ষা করছিলেন। জয়পালের দেশ থেকে কোন সংবাদ পেতে বিলম্ব হওয়ার অর্থ ছিল, জয়পাল হয়ত পরাজয়কে বরণ করে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। মাহমূদের এক সেনাপতি বলল, এই সুযোগে আমাদের উচিত ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া।

"জয়পাল দমে যাওয়ার ব্যক্তি নয়। অবশ্যই সে হামলা করবে।" বললেন সুলতান মাহমূদ। "আমি তার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাতে চাই যে, ভারত আক্রমণের অভিপ্রায় আমার মোটেও নেই। এটা কি ভালো হবে না, সে তার রাজ্য ছেড়ে এসে আমাদের এলাকায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে? আমি যদি তার অগ্রাভিযানের খবর সময় মত পাই তাহলে আমাদের ইচ্ছে মতো সুবিধাজনক জায়গায় তাকে যুদ্ধ খেলায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতে পারব?"

"এতদিনে তো লাহোর থেকে কোন না কোন খবর পৌছে যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের লোকেরা গ্রেফতার হয়ে যায়নি তো?" বলল সেনাপতি।

"আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন, যদি কোন খবর না আসে আমি এদিক থেকে লোক পাঠাব।" বললেন সুলতান মাহমূদ।

লাহোর থেকে ইমরান, নিজাম, কাসেম বলখী, জগমোহন, ঋষি ও জামিলার দল রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। যে রাতে দুঃসাহসী গজনী কমান্ডোরা জয়পালের যুদ্ধ সামগ্রীতে অগ্নিসংযোগ করেছিল সেই রাতেই ঋষির স্থলে পণ্ডিতেরা অন্য একটি কুমারীকে জোরপূর্বক তুলে টিলার মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। কিশোরীটি সংজ্ঞাহীন

হয়ে যাওয়ার পর যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল তখন সবকিছু সে অনুভব করতে পারছিল। প্রকৃত হিন্দু ঘরানার মেয়ে হওয়ার কারণে সে দেবের চরণে নিজেকে বলীদানে উৎসাহ বোধ করছিল। সে নিজে থেকেই বলছিল, ইন্দ্রা দেবীর চরণে আমাকে বলি দিয়ে দাও... মহারাজা জয়পালের কপালে আমার রক্তের তিলক পরিয়ে দাও...। আমার রক্তের ঝলকানিতে শত্রুদের অন্ধ করে দাও।

এ সত্যি এক তেলেসমাতী কারবার। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তার বয়সী মেয়েরা বৃত্তাকারে অর্ধনগ্ন হয়ে নাচছে আর মেয়েটি বিশেষ এক ধরনের বাজনার তালে তালে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিজে বলী হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কুমারীকে বলীদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার পর রাজা জয়পালকে টিলার মন্দিরে নিয়ে গেল পণ্ডিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা রাজাকে সরস্বতি মূর্তির সামনে নিয়ে বসালো। রাজা সরস্বতীকে নমস্কার করলো। মন্দিরের কুমারীরা রাজার উপর ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে দিল। পণ্ডিতেরা ভজন গাইল। ঐ কুমারী মেয়েটিকে এভাবে সাজিয়ে রাজার সামনে পেশ করা হল যে, মনে হচ্ছিল মেয়েটি একটি পরী। মেয়েটি দু'হাত প্রসারিত করে রাজার উদ্দেশে বলছিল, ইন্দ্রাদেবীর চরণে আমাকে বলী দিয়ে দাও। রাজার কপালে আমার রক্তের তিলক পরিয়ে দাও।

কুমারী পণ্ডিতের যাদুর প্রভাবে মাথা পেতে ধরল। এক পণ্ডিত রাজা জয়পালের কোষ থেকে তরবারি বের করল। নাঙ্গা তরবারি রাজার মাথার উপর দিয়ে বার কয়েক ঘুরালো এবং এক কোপে কুমারীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। মন্দিরে ঘন্টা ও শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। সাধু পণ্ডিতেরা ভজন গাইতে শুরু করল। সরস্বতী দেবীর চরণে করজোড়ে মিনতি জানাতে লাগল। প্রধান পণ্ডিত কুমারীর রক্তে আঙ্গুল চুবিয়ে রাজার কপালে তিলক পরিয়ে দিল। রাজা এই দুর্গম টিলার উপরে মন্দিরের এসব আয়োজন প্রত্যক্ষ করার পর তার চেহারা বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে হল যেন রাজা গজনী জয় করে ফেলেছে। সুলতান মাহমূদ তার কাছে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রফুল্ল চিত্তে মন্দির থেকে বের হয়ে রাজা কড়া নির্দেশ জারী করল, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত সৈন্যকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত কর। রাজার নির্দেশে তার রাজ্যের সকল প্রজার গৃহ উজাড় হয়ে পড়ল। এর আগে হিন্দু প্রজারা রাজার কোষাগারে অকাতরে তাদের গচ্ছিত সম্পদ অর্পণ করেছিল। সেগুলো ভস্মীভূত হওয়ার পর পুনরায় রাজার অভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে কৃষক প্রজাদের ঘরে এতটুকু আহারাদি অবশিষ্ট ছিল যা দিয়ে তারা মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত করতে পারে। কেননা, রাজা ও পণ্ডিতেরা হিন্দু প্রজাদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ,

মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এমনভাবে প্রচার করেছিল যে, প্রজাদের মনে মুসলমানদের প্রতি তীব্র আক্রোশ সৃষ্টি হয়েছিল। সকল হিন্দু প্রজা রাজার আগ্রাসী অভিযানে সাহায্য করাকে ধর্মীয় দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করত। অবশ্য ইতিপূর্বে হিন্দু গৃহিণী-মহিলারা তাদের সৌখিন অলংকারাদি রাজার কোষাগারে জমা করেছিল। সেগুলো ভস্মীভূত হওয়ার পর এখন তারা তাদের বাকী সম্পদের সিংহভাগ রাজার কোষাগারে অর্পণ করতে বাধ্য হল। অপরদিকে রাজা জয়পাল অন্যান্য হিন্দু রাজা মহারাজাদের দরবারে ধরনা দিয়ে তার যুদ্ধ-ভাণ্ডারকে স্ফীত করতে সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা চালাল। সবার কাছে রাজা শপথ করল, এবার সে আর পরাজিত হয়ে ফিরবে না। যে কোন মূল্যে সে গজনীকে পদানত করবেই।

* * *

নিজাম, কাসেম, জগমোহন, ঋষি ও জামিলাকে নিয়ে ইমরানের কাফেলা রাবী নদী পার হয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। ততক্ষণে তারা লাহোর থেকে বহুদূরে। ইমরান পেশাদার গোয়েন্দা, লাহোরের পথঘাট তার নখদর্পণে। প্রচলিত পথ ছেড়ে অজানা পথে কাফেলাকে নিয়ে চলল ইমরান। ঘন এক বনবীথিতে রাত পোহাল তাদের। ঋষি ঘোড়ার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে নামিয়ে আনল ইমরান। সবাইকে বলল, এখানে আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে। সারারাত কারো ঘুমানো সম্ভব হয়নি। ঘোড়াগুলোরও বিশ্রাম দরকার। এদেরকে দানাপানি দিতে হবে। পথ আমাদের অনেক দীর্ঘ। তদুপরি আমাদের যেতে হবে লুকিয়ে ছাপিয়ে। সবাই শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমের অতলে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর জামিলা ইমরানকে জাগিয়ে একটু দূরে নিয়ে গেল এবং বলল, "তুমি এই হিন্দু মেয়েটার সাথে আমাকেও নিয়ে এসেছ, আমার ভবিষ্যৎ কি হবে বল?"

"এ মুহূর্তে আমার সামনে তোমার ভবিষ্যৎ নয়, গজনী সালতানাতের ভবিষ্যতই প্রধান বিষয়।" জবাব দিল ইমরান। "গজনী পৌঁছে তোমাদের ব্যাপারে চিন্তা করব। আশা করি পথিমধ্যে এসব বিষয় তুলে আমার কর্তব্য কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আবার প্রচণ্ড ভয়ও হচ্ছে— তুমি এখন তোমার দেশের জন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত আছো। অথচ তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি যে অপরাধ করেছিলাম, তোমার নির্দেশ মতোই সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি।

কিন্তু এখন আমি দেখছি, ঋষির প্রতি তুমি ঝুঁকে পড়েছ, তুমি আমার থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাচ্ছ। নিজের জন্যেই তো তুমি ঋষিকে নিয়ে যাচ্ছ!"

"তোমার কি এখনও চিত্তে সুখ আসেনি?" বলল ইমরান। "এখনও কি ঋষি তোমাকে প্রেতাত্মা হয়ে ভয় দেখায়? সেতো এখন সশরীরে তোমার সাথে যাচ্ছে। এখন তো আর তোমার ভয় করার কিছু নেই। অপরাধের বোঝাও নেই তোমার উপর।"

"আমার সাথে এসব তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলো না ইমরান।" জামিলা চোখ বন্ধ করে দৈহিক উত্তেজনায় প্রকম্পিত কণ্ঠে বলল, "আমার শরীর বিক্রিত পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, যদ্দিন এই শরীর আছে ততদিনই জীবন আছে, আছে দাম, আছে মান। আছে তোমার প্রতি মানুষের আগ্রহ।"

"শোন জামিলা!" ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল ইমরান। "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার পথ আর আমার পথ ভিন্ন। তোমার কাছে আজ আমি আসল পরিচয় প্রকাশ করছি। আমি তোমাদের দেশের অধিবাসী নই, আমি গজনী সালতানাতের একজন সৈন্য। ওখানকারই অধিবাসী। আমি গজনী সেনাবাহিনীর এক পদস্থ গোয়েন্দা। আর এরা দু'জন গজনী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। বিগত যুদ্ধে এরা গ্রেফতার হয়ে জয়পালের প্রাসাদে অন্তরীণ হয়েছিল। এদের উদ্ধার করা ছিল আমার দায়িত্ব। আর দৈহিক রূপ-লাবণ্যের কাম-কামনায় জ্বলে পুড়ে মরছ তুমি। আমি এসবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এই হিন্দু মেয়েটি ও তার ভাই স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, আমি এদেরকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। শোন জামিলা! তোমার একথা প্রমাণ করতে হবে যে, ইসলাম একটা মর্যাদার ধর্ম। রূপ-রমণের কথাবার্তা এখন বাদ দাও। আমরা এখন শত্রু এলাকা অতিক্রম করছি। মৃত্যু আমাদের তাড়া করছে। নিজের ধর্মের জন্য নিজেকে বিলীন ও কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হও।"

ইমরান আবেগে উদ্বেলিত হয়ে জামিলাকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছিল। কিন্তু জামিলা মোটেও ইমরানের কথায় কর্ণপাত করল না। ইমরান কি বোঝাতে চাচ্ছে সেটা মোটেও সে বোঝার চেষ্টা করছে না। দেহ-কামনার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল জামিলার হৃদয়ে। জামিলার ভাবখানা এমন ছিল যে, ইমরান যা বলছে সেগুলো তার পক্ষে মোটেও বোঝা সম্ভবপর নয়। জামিলার মাথায় শুধুই তার ভূত-ভবিষ্যৎ ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার কাছে রাজা জয়পালের রাজ্য আর গজনীর সুরক্ষা নস্যি। ইমরানকে কব্জা করাই মূল কথা। দীর্ঘদিন থেকে জামিলা ইমরানকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার জন্য ফুটন্ত

কড়াইয়ের মতো উত্তপ্ত হয়ে আছে। শরীর মন আর দেহের উগ্র চাহিদাকে জামিলার পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল। এতকিছুর পরও যখন দেখল, ঋষির প্রতি ইমরানের ভীষণ আগ্রহ তখন হিংসার আগুন জামিলাকে আরো বেপরোয়া করে তুলল। ইমরানের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাড়া না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হল জামিলা। তার মধ্যে আবার জন্ম হল বঞ্চিতের জিঘাংসা।

জামিলার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঋষির দিকে নিবদ্ধ করল ইমরান। ঋষির কাছে গিয়ে ক্ষীণ স্বরে ডাকলো, ঋষি! ঋষি! ঋষি চোখ খুলে এদিক ওদিক দেখে ইমরানের দিকে অগ্রসর হল। ইমরানের কাছে পৌঁছে ছোট শিশুর মতো দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল ঋষি। তার গলায় বুকে নিজের গণ্ডদ্বয় ও কপাল ঘষে আহ্লাদ জানাচ্ছিল সে। ইমরান সস্নেহে ঋষির মাথা ধরে তার চোখে চোখ রাখল।

অদূরে বসে জামিলা সবই দেখছিল। আর আগ্নেয়গিরির লাভার মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল।

ঋষি ইমরানের গলা জড়িয়ে বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে ইমরানের কাছে জানতে চাইল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমরা এখন কোথায়? আমার দাদা কোথায়? দু'টো লোক ওখানে পড়ে রয়েছে, এরা কি জীবিত?" জামিলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ইমরানের গলা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ঋষি, 'এ মহিলাটি কে? এ তোমার বোন নয়তো? একে কোত্থেকে এনেছ?'

'তুমি সুস্থ হও। সবকিছুই বলব।' বলল ইমরান। ইমরান ঋষিকে ধরে তার কাছেই বসিয়ে দিল এবং বলল, 'তোমাকে আমরা পণ্ডিতের কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছি।' দু'হাতে চোখ ডলে ঋষি বলল, 'হ্যাঁ, কিছুটা মনে পড়ছে। পণ্ডিতরা আমাকে দেবীর চরণে বলী দানের জন্য জোর করে তুলে নিয়েছিল...। আচ্ছা, ওরা এখন কোথায়? আমি কোথায়? আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না তো?'

'এ মহিলার নাম জামিলা।' বলল ইমরান। "এ যদি সাহায্য না করত তাহলে পণ্ডিতরা তোমাকে যে দুর্গম জায়গায় অন্তরীণ করেছিল ওখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না।"

ঋষিকে ইমরান তার অপহরণ হওয়ার ঘটনা বিস্তারিত বলল। ঋষিকে উদ্ধার করতে কিভাবে জামিলা তাকে সহযোগিতা করেছে তাও জানাল। আরো জানাল, জামিলা এক বিত্তশালী বণিকের পালিয়ে আসা স্ত্রী। এছাড়াও ঐ বণিকের আরো দুই স্ত্রী ছিল। তাকে উদ্ধার করতে সহযোগিতা করায় ঋষি জামিলাকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই জামিলার রূপ, সৌন্দর্য ও কমনীয়তা তার মধ্যে জন্ম দিল ঈর্ষা। সে জামিলাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

ইত্যবসরে নিজাম ও জগমোহন ঘুম থেকে জেগে ঋষিকে খুঁজতে শুরু করল। ঋষি তখন সুস্থ। জাদু ও বিষক্রিয়ার প্রভাব তার মাথায় নেই। টিলার মন্দিরে ঋষির জীবনে কি ঘটেছিল তার একবিন্দুও মনে নেই ঋষির।

'বন্ধুগণ!' বলল ইমরান। 'আমাদের সামনে দীর্ঘ সফর এবং বড় ভয়াবহ সেই পথ। সাথে রয়েছে অনেক স্বর্ণমুদ্রা, অলংকারাদি। যে বিজন এলাকা দিয়ে আমরা অতিক্রম করব, না আছে এখানে কোন আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা না আছে সুপেয় পানি। সাথে যা আছে এগুলোকে অবলম্বন করেই আমাদেরকে পথ চলতে হবে।'

"তুমি আমাকে বলেছিলে, ঋষিকে উদ্ধার করতে পারলে তুমি আর ফিরে যাবে না।" বলল জগমোহন। "এ জন্য আমি ঘর থেকে অনেক অলংকারাদি নিয়ে এসেছি। সে কাপড়ের একটি থলে কোমর থেকে খুলে ইমরানের সামনে রাখল এবং বলল, আমাদের ঘরে যত ছিল তা ছাড়াও ঋষির ব্যবহৃত অলংকারাদিও এখানে রয়েছে।"

জামিলাকে ইমরান বলেছিল, ঋষিকে উদ্ধার করতে পারলে সে আর শহরে ফিরবে না। এজন্য জামিলাও বণিক স্বামীর ঘর থেকে যথাসম্ভব নগদ টাকা-পয়সা, অলংকারাদি সাথে নিয়ে এসেছিল। সফরের রীতি অনুযায়ী ইমরানকেই দলনেতার দায়িত্ব অর্পণ করল নিজাম এবং বলল, 'এইসব সোনা-দানা, টাকা-পয়সা তোমার দায়িত্বে রাখা হল এবং আমরা গজনী পৌঁছা পর্যন্ত তোমার নির্দেশ মতই সবাই চলব।' নিজামের সিদ্ধান্ত সবাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিল এবং যার কাছে যা ছিল সব ইমরানের কাছে অর্পণ করল। সোনা-দানা ও টাকা-পয়সার পরিমাণ একেবারে কম ছিল না। সবগুলো কোমরে বহন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এজন্য একটা পোটলা বেঁধে ইমরান টাকা-পয়সা ও সোনা-দানা নিজের কাছে রাখলো। ইমরান সফর সঙ্গী সবাইকে এই বলে সতর্ক করল, 'আমাদের পথ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। শুধু যে এই সোনাদানাই ডাকাতদের আগ্রহের বস্তু তাই নয়, যে দু'টি মেয়ে আমাদের সাথে রয়েছে ডাকাতদের জন্য এরাও খুব লোভনীয়।'

অতএব ডাকাত, ছিনতাইকারী এবং রাজার গোয়েন্দাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাতে সফর করার সিদ্ধান্ত নিল ইমরান এবং দিনের বেলা লুকিয়ে-ছাপিয়ে সম্ভাব্য নিরাপদ জায়গায় বিশ্রামের মনস্থ করল।

বেলা ডুবে গেছে। ইমরানের কাফেলা আবার রওয়ানা করল। ইমরানের পিছনে জামিলা আর জগমোহনের পেছনে ঋষি আরোহণ করল। যেতে যেতে

কাসেম তার ঘোড়াটাকে পিছনে নিয়ে গেল। কাসেমের অক্ষমতা ছিল, কাসেম নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানত না। নিজামের অবস্থাও ছিল তাই। কিন্তু ইমরান ছিল ভিন্ন। সে হিন্দুস্তানী ভাষা মাতৃভাষার মতই অনর্গল বলতে পারত। ঋষি, জামিলা ও জগমোহনের সাথেও সে অনর্গল কথা বলতে পারত। কাসেমকে পেছনে আসতে দেখে নিজামও পেছনে চলে গেল। তারা পরস্পর কথাবার্তা শুরু করল। দু'জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা একটু গভীর করার লক্ষ্যে তারা ইমরান থেকে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে চলল।

"আচ্ছা, তুমি কি ইমরানকে বিশ্বাস করতে পার? এই দুইটা সুন্দরী মেয়েকে সে কেন নিয়ে যাচ্ছে?" নিজামকে জিজ্ঞেস করল কাসেম। "তাছাড়া এতগুলো সোনা-দানাও কেন তুমি ওর দায়িত্বে দিয়ে দিলে? তুমি কি জান না টাকা-পয়সা ও সুন্দরী নারী মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে পারে...! টাকা আর নারীর কি যাদুকরী ক্ষমতা...!"

"ইমরান যদি বিশ্বাসযোগ্য না হতো তাহলে আমাদেরকে উদ্ধার না করেই সে এই হিন্দু মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত।" বলল নিজাম। 'দেখলে তো জামিলাকে সে কত কৌশলে ব্যবহার করেছে? যেহেতু এই মেয়েটি স্বামী বঞ্চিতা, এজন্য সুকৌশলে গজনী সালতানাতের পক্ষে তাকে ব্যবহার করেছে এবং তাকেও দিয়েছে স্বামী নির্যাতন থেকে মুক্তি।'

"এই দুই মেয়ের সাথে গজনী সালতানাতের লাভালাভের কি সম্পর্ক?" বলল কাসেম। "এটা ওর ভোগবাদী মানসিকতা। আর এর খরচ বহন করতে হচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে। তুমি যাই বল, ওর উপর আমার আস্থা নেই। তুমি কি ভেবে দেখেছ, জামিলা বিবাহিতা মেয়ে। স্বামী তালাক না দেয়া পর্যন্ত তার সাথে কারো বিবাহ বৈধ হতে পারে না! তুমি দেখো, জামিলাকে ইমরান রক্ষিতা হিসাবে রাখবে আর এই হিন্দু মেয়েটাকে মুসলমান বানিয়ে সে বিয়ে করবে।"

"তোমার কথাবার্তায় অবিশ্বাস নয়, হিংসার গন্ধ পাওয়া যায়।" বলল নিজাম। "দোস্ত! এই মেয়েদের উপর থেকে তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নাও। তুমি কেন ভুলে গেলে, বন্দিদশা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে ইমরান আমাদের কতটুকু উপকার করেছে? ইমরান আমাদেরকে মুক্ত না করলে ওই কাফেরের বন্দিশালায় আমাদেরকে মরতে হতো। মুজাহিদ যুদ্ধ ময়দানে শহীদ হওয়ার জন্য জন্ম নেয়। বন্দিশালায় মৃত্যুবরণ করার জন্য নয়। গজনী পৌঁছে আমাদের কর্তব্য হবে আবার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হিন্দুস্তানী বেঈমানদের বিরুদ্ধে

জেহাদকে বেগবান করা। ইমরান কাকে রক্ষিতা রাখল আর কাকে বিয়ে করল, তাতে আমাদের কি আসে যায়!"

"আমরা সেনাবাহিনীর ঊর্দ্ধতন অফিসার, আর ইমরান একজন সাধারণ গোয়েন্দা। আমাদের অধিকার আছে ইমরানের দোষ-ত্রুটি দেখার"। বলল কাসেম।

"এই ভ্রমণে আমরা ইমরানকে দলনেতা নির্বাচন করেছি"। বলল নিজাম। "সে যদি কোন ভুল করে বা কোন অন্যায় করে তাহলে আমরা তাকে বাধা দিতে পারি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আমাদের এখন লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বিবাদে গজনীতে পৌঁছা। সুলতানকে অবহিত করা, রাজা জয়পাল গজনী আক্রমণের জন্য তোড়জোর করছে।"

"তুমি একেবারেই হাবা"। বলল কাসেম। "এই ব্যাটা আমাদেরকে ধোঁকা দেবে।"

জামিলা ইমরানের পেছনে আরোহণ করে তার কাঁধে হাত রেখে গায়ে গা মিশিয়ে বসেছে। ঘোড়ার ঝাঁকুনির সাথে সাথে বারবার ইমরানের গায়ে আঁছড়ে পড়ছে জামিলা আর আবেগ ও উত্তেজনাকর কথা বলে ইমরানকে তাতিয়ে তুলতে চাচ্ছে। ইমরান অনুভব করল, জামিলার মধ্যে কামনেশা তীব্র হয়ে উঠছে।

"এই হিন্দু মেয়েটিকে তোমার কাছে এত ভাল লাগে কেন?" ইমরানকে জিজ্ঞেস করল জামিলা। 'আচ্ছা বলতো, ও কি আমার চেয়ে বেশি রূপসী?'

"জামিলা! যে কথা আমি তোমাকে বলেছি এর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি তোমাকে বলতে চাই, একজন মুসলিম নারী এবং অমুসলিম নারীর মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। এ মুহূর্তে কোন মনোদৈহিক বিনোদনে আমার কোন আকর্ষণ নেই। অবশ্য তুমি সুন্দরী, আগুনের শীষের মতো তোমার শরীর। আমার মতো অসংখ্য যুবকের দীন-ধর্ম তুমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পার। আমাকেও চাচ্ছ তুমি তোমার রূপের আগুনে জ্বালাতে। কিন্তু তুমি জান না, বৈষয়িক আকর্ষণ আমি অনেক আগেই নিঃশেষ করে দিয়েছি। আমার সাথীরা আমাকে দলনেতা নির্বাচন করেছে। এই সাথীদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আমার ব্যক্তিগত সুখ, আরাম-আয়েশ আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি। দলনেতা একটি ছোট্ট কাফেলার হোক বা রাষ্ট্রের হোক তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, সুখ-আহ্লাদ প্রাধান্য পেতে পারে না। দলনেতার কাছে শত্রু-মিত্রের সংজ্ঞাও ভিন্ন।

দলনেতার দৃষ্টি থাকে তার দল ও জাতির স্বার্থের প্রতি। ব্যক্তি স্বার্থ সেখানে একেবারেই গৌণ।"

'উনি একটা পাথরের মূর্তি!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জামিলা। 'হিন্দুরা নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে এগুলোকে পূজা করে। এসব মূর্তিদের না আছে কোন জীবন, না আছে কোন অনুভূতি। তুমি কি অমন একটা কিছু!' জামিলার কথায় ইমরান হেসে ফেলল।

এভাবেই এগিয়ে চলল ইমরানের ছোট্ট কাফেলা। জামিলার মধ্যে হতাশাও বাড়তে লাগল। বঞ্চিত জীবনের যন্ত্রণা জামিলার মধ্যে আরও তীব্রতর হয়ে উঠল। চলন্ত পথে কাসেম ইমরানের কাছ থেকে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে চলতে লাগল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ জামিলার ওপর। জামিলা যখন ওর দিকে তাকাত তখন তার চেহারায় ফুটে উঠত খুশির আভা। এসব নিয়ে ঋষির মধ্যে কোন ভাবান্তর ছিল না। ঋষি ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত। ভবিষ্যৎ নিয়ে জগমোহনের মনেও উঁকি দেয়নি কোন সংশয়, সন্দেহ। এভাবেই তারা প্রায় অর্ধেক রাস্তা চলে এল। একদিন কাসেম, নিজাম ও জামিলাকে সাক্ষী রেখে ঋষি ও জগমোহনকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিল ইমরান এবং ঋষির নাম দিল রাজিয়া ও জগমোহন ধারণ করলো আব্দুল জব্বার নাম।

একদিন ইমরানকে নিজের কাম চরিতার্থের জন্য সরাসরি আহ্বান করল জামিলা। কিন্তু তাতেও ইমরানের মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। জামিলার আহ্বানে সাড়া দিতে পূর্ববৎ উদাসীন রইল ইমরান। 'তুমি আস্ত একটা পাথর।' কামনায় উদ্বেলিত জামিলা ইমরানের পিঠে থাপ্পর দিয়ে বলল, 'তুমি একটা মাটির পিণ্ড। এমন জানলে কস্মিনকালেও আমি তোমার ফাঁদে পা দিতাম না।'

ইমরানের ছোট্ট কাফেলা পেশোয়ারের পাহাড়ি অঞ্চল অতিক্রম করছে। এই এলাকা সম্বন্ধে ইমরান ছিল অভিজ্ঞ। এখানে কোথায় কি আছে, কোথায় ঘাস পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে সুপেয় পানি— এর সবই ইমরানের জানা। এজন্য পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করার আগেই একটা গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় পানাহার সামগ্রী সংগ্রহ করল ইমরান এবং বলল, 'বন্ধুরা! তোমাদেরকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমরা এখন রাজা জয়পালের সীমানা পেড়িয়ে অনেকটা নিরাপদ এলাকায় এসে পড়েছি। এখানে আমাদের গ্রেপ্তার হওয়ার কোন আশংকা নেই।'

কাফেলা থামিয়ে দিল ইমরান। তখন রাত প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। দিনের প্রচণ্ড গরমে সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত। এলাকাটি অত্যন্ত রুক্ষ। গাছপালা নেই, নেই

কোন ছায়াতরু। দিনের বেলায় সূর্যতাপে পাহাড়ের শিলায় আগুন জ্বলতে থাকে। প্রতিটি পাথরকে মনে হয় একেকটা অগ্নিপিণ্ড। ঘোড়াগুলোকে এক পাশে বেঁধে রেখে সবাই আরামের জন্য শুয়ে পড়লো। ইমরান একটু দূরে শুইলো। সবাইকে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ জেগে রইল ইমরান। ততক্ষণে শুক্লপক্ষের চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল ইমরান।

কিন্তু কাসেমের চোখে ঘুম নেই। তার বুকের ভেতর তীব্র যন্ত্রণা। জামিলার রূপ-সৌন্দর্য তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। সাথীরা সবাই ঘুমে অচেতন। এ সময় দেখল তাকে অতিক্রম করছে একটি ছায়ামূর্তি। ক্ষীণস্বরে মাথা উঁচু করে ডাকল কাসেম, জামিলা! তার ডাকে থেমে গেল ছায়ামূর্তি। আসলেও ছায়াটি ছিল মূর্তিমান জামিলা। মুশকিল হলো, কাসেম জামিলার নাম ছাড়া তার সাথে কথা বলার মতো আর কোন কথাই জানে না। জামিলাও বুঝে না কাসেমের ভাষা। ইশারা ইঙ্গিতে জামিলাকে আহ্বান করল কাসেম। কাসেমের ইঙ্গিতে সাড়া দিল জামিলা। জামিলাকে কাছে বসিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে ইমরানের প্রতি তার ঘৃণা জামিলাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। আরো বোঝাতে চেষ্টা করলো, ইমরান সত্যিই ধোঁকাবাজ, প্রতারক। কাসেম জামিলাকে এই অনুভূতি দিতে চেষ্টা করল, সোনাদানা ও টাকা-পয়সা সে ইমরানের হাতে দিয়ে ভুল করেছে।

জামিলাকে দু'হাতে জড়িয়ে নিল কাসেম। কাসেমের সান্নিধ্য পেয়ে জামিলার হতাশ হৃদয়ে আবেগের বান ডাকল। সেও নিজেকে সঁপে দিল কাসেমের হাতে। কাসেমের স্পর্শ, সোহাগ ও সান্নিধ্য জামিলার হৃদয় থেকে ইমরানের আকর্ষণ মুহূর্তের মধ্যে বিলীন করে দিল। ইমরানের বিপরীতে কাসেমকেই সে মনে করল ভবিষ্যৎ। কাসেম বলখী জামিলাকে জড়িয়ে ধরে একটু দূরে নিয়ে গেল এবং এক জায়গায় বসিয়ে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে ইমরানের দিকে এগুলো। ইমরান তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। টাকা-পয়সা ও সোনার থলেটি তার পাশে রাখা। কাসেম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্ষিপ্ত পায়ে থলেটি হাতিয়ে নিল এবং দ্রুত জামিলার কাছে ফিরে আসল। সে জামিলাকে থলেটি দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে। ঘোড়াগুলো এদের থেকে কিছুটা দূরে বাঁধা ছিল। দু'টি ঘোড়ায় গদি এঁটে একটিতে সওয়ার হলো কাসেম, জামিলাকে ইশারা করলো অন্যটিতে সওয়ার হতে। কিন্তু জামিলা ইঙ্গিতে বোঝাল, সে সওয়ার হতে পারে না। অগত্যা নিজের সামনেই সওয়ার করাল জামিলাকে, আর অন্য ঘোড়াটির লাগাম বেঁধে নিল তার ঘোড়ার জিনের সাথে। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো

তারা। কিছুদূর গিয়ে কাসেম এক হাতে জামিলাকে নিজের বুকের সাথে মিলিয়ে নিল এবং ঘোড়াকে তাড় লাগালো। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ঘোড়া। নিঝুম রাতের নীরবতা ভেঙ্গে অশ্বখুরের আওয়াজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সবার আগে ইমরানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। গভীর রাতে ঘোড়ার আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মনে হতে থাকল খুব কাছেই কেউ ঘোড়া ছুটাচ্ছে। ইমরান চোখে মুখে হাত বুলিয়ে প্রথমেই দেখল থলেটি আছে কি-না। কিন্তু নেই। ধারে কাছে তালাশ করে থলেটির কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ইতোমধ্যে নিজাম ও আব্দুল জব্বারও জেগে উঠল। তারা তাদের ঘোড়ার খোঁজ নিল। কিন্তু দু'টি ঘোড়া নেই। এদিকে জামিলা ও কাসেম লাপাত্তা।

"ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি।" ইমরানের উদ্দেশে বলল নিজাম। "চলো এদেরকে আমরা পাকড়াও করব এবং নিজ হাতে এদের কতল করব।"

'না, এর দরকার নেই। যে মেয়েটিকে কাসেম নিয়ে গেছে প্রকৃতপক্ষে ও আমাদের কেউ নয়। সোনা-দানা ও টাকা-পয়সা যা নিয়েছে এগুলোও গজনী সালতানাতের সম্পদ নয়। এদেরকে পাকড়াও করা আমাদের দায়িত্বও নয়। বরং এদের পেছনে দৌড়ানো আমাদের কর্তব্য পরিপন্থী...। নিজাম ভাই! আমি তোমাদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলাম এই জন্য যে, হতে পারত রাজা তোমাদের দু'জনকে কব্জা করার জন্য সুন্দরী কোন ললনা লাগিয়ে দিত। নারী ও টাকা এমনি ভয়ঙ্কর জিনিস, পাথরের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষকেও মোমের মত জ্বালিয়ে গলিয়ে দিতে পারে। এমনটা হলে তোমরা ভুলে যেতে তোমাদের দায়িত্ব, তোমাদের জাতিত্ব, ধর্ম, নীতি, আদর্শ। ভোগ-ঐশ্বর্যের কাছে জলাঞ্জলী দিতে ঈমান, আমল। হিন্দু রাজার ক্রীড়নক হয়ে গজনী সালতানাতের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে তোমরা।'

ধীরে ধীরে ঘোড়ার আওয়াজ ইথারে মিলিয়ে গেল। "আমার ঘুম চলে গেছে, চল আমরা অগ্রসর হতে থাকি।" বলল নিজাম।

একটি ঘোড়ার উপর ঋষিকে এবং অন্য গোড়ার উপর জগমোহনকে সওয়ার করে ইমরান ও নিজাম দু'জনে ঘোড়ার লাগাম টেনে হেঁটে চলল। সিদ্ধান্ত নিল, তারা পর্যায়ক্রমে সওয়ার হবে।

"ও হয়তো জামিলাকে জোর করে নিয়ে গেছে।" বলল ঋষি।

"না, জামিলাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়নি। বরঞ্চ বলতে পার, জামিলাই কাসেমকে নিয়ে গেছে। যাই হোক, আপদ চলে গিয়ে ভাল হয়েছে।"

রাত পোহাল। পূর্বাকাশে উঁকি দিল লাল টকটকে সূর্য। ইত্যবসরে জামিলা ও কাসেম অনেক পথ অতিক্রম করেছে। ওরা মরণপণ ঘোড়া ছুটিয়েছে। কাসেম গজনীর সৈন্যদের নির্মিত রাস্তা ধরে এগুচ্ছিল। যে রাস্তা গজনী বাহিনী তৈরি করেছিল ভারত আক্রমণের উদ্দেশে। কাসেম যখন জয়পাল বাহিনীর কাছে গ্রেপ্তার হয়েছিল, এ পথ দিয়েই জয়পালের সৈনিকেরা তাদের নিয়ে গিয়েছিল। এই একটাই ছিল মাত্র রাস্তা। যা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। বেলা বেড়ে উঠার সাথে সাথে কাসেম অনুভব করল, "আমি অপরাধী, আমি পলাতক, ফেরারী। আমার পেছনে ধাওয়া করছে ইমরান ও নিজাম।" ধরা পড়ার আশঙ্কা ও অপরাধের তাড়না কাসেমকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। সে অভিজ্ঞ সৈনিক ও দীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। যে কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি সহ্য করা তার পক্ষে মোটেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অপরাধবোধ কাসেমের সহন শক্তিকে ভেঙ্গে খান খান করে দিল। সে অনুভবই করল না যে, ঘোড়াগুলো এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় দৌড়াতে পারবে না। তার সফর ছিল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে। বারবার বাঁক নিচ্ছিল পথ। কখনও চড়তে হতো পাহাড়ের উপরে, কখনও নামতে হতো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে। বারবার হোঁচট খেতে হতো পাথরের সাথে। বহু চড়াই উৎড়াই অতিক্রম করে চলতে হচ্ছিল তাকে।

বিরামহীন পথ চলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঘোড়া। যে ঘোড়াটায় কাসেম ও জামিলা উভয়ে আরোহণ করেছিল সেটি ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়া। জামিলা ও কাসেম দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়লো। পেছনের ঘোড়াটি তাল সামলাতে না পেরে কাসেমের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় চিৎকার দিয়ে উঠল জামিলা। কিন্তু কাসেমের অবস্থা শোচনীয়। কোন মতে নিজেকে টেনে তুলে জামিলার দিকে অগ্রসর হলো এবং জামিলাকে টেনে বসাল কাসেম। সওয়ার ঘোড়াটি কয়েকবার পা ঝাপটা দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। অপর ঘোড়াটির উপর কোন সওয়ারী না থাকায় সেটি অত দুর্বল ছিল না। কাসেম বলখী সেই ঘোড়াটির লাগাম হাতে নিয়ে এদিক ওদিক দেখল, কোথাও ঘাস আছে কি-না। না, যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর এ পাহাড়ি এলাকাটি এমন যে শুধুই পাথর। সামান্য দূর্বা ঘাসও কোথাও নেই। পানির তো প্রশ্নই ওঠে না। তখনো ধরা পরার আশঙ্কা কাসেমকে তাড়া করছে। সে মূল রাস্তা

ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। জামিলাকে বগলদাবা করে কোনমতে নিয়ে বসাল একটা পাথরের উপর। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল উভয়ে।

খুব বেশি সময় বিশ্রাম করতে পারেনি কাসেম। অপরাধ তাকে তাড়া করে নিয়ে চলল সামনের দিকে। জামিলাকে নিয়ে আবার সওয়ার হলো ঘোড়ায়। টাকার থলেটা জামিলা আঁকড়ে থাকল। এক হাতে জামিলা আর অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম টেনে খুব জোরে তাড়া করল কাসেম।

ইমরান ও নিজাম তাড়া করতে পারে এ আশংকায় কাসেম দীর্ঘ শ্রান্তির পরও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারেনি। ধরা পড়ার ভয়ে সে মূল পথ ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দুর্গম এলাকা দিয়ে গন্তব্যে পৌছার জন্য আবার ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করল। জামিলা অশ্বারোহণে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তার নেই। জামিলা ইঙ্গিতে কাসেমকে বোঝাল, ক্লান্তিকর বিরামহীন ভ্রমণে তার পশ্চাদদেশ ফুলে গেছে, উরুসন্ধি ছিলে গেছে। সারা শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে। পেট ধরে ইঙ্গিত করল, তার পক্ষে আর এক মুহূর্ত ঘোড়ায় বসে থাকা সম্ভব নয়।

যে স্বর্ণমুদ্রা ও রূপ সৌন্দর্যের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে কাসেম জামিলাকে নিয়ে কাফেলা ত্যাগ করে পালিয়ে এলো, সেই রূপ আর টাকার আকর্ষণ কাসেমের কাছে ফিকে হয়ে গেছে। কাসেম অনুভব করছে, তারও শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। তবুও মুখে কৃত্রিম শুষ্ক হাসির রেশ টেনে জামিলাকে এক হাতে জড়িয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে নিল। কাসেম অনুভব করল, জামিলার শরীরের স্পর্শে আর আগের মত পুলক নেই। জামিলা নিষ্প্রাণ দেহের মতো। জামিলা কাসেমের আহ্লাদে শরীরটা এলিয়ে দিল কাসেমের গায়ে। জামিলার গণ্ডদেশে কাসেম ঠোঁট স্পর্শ করল, তার ঘর্মাক্ত শরীরের সবটা ভার কাসেমের উপর ছেড়ে দিল। এলো চুল কাসেমের গলায় জড়িয়ে গেল। জামিলা তার ঘাড়, গলা কাসেমের গলায় হেলিয়ে দু'হাতে উল্টোভাবে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঘর্মাক্ত জামিলার শরীরটা কাসেমের কাছে দুর্গন্ধময় আবর্জনার মতো মনে হলো। আর জামিলার হেলিয়ে দেয়া শরীরটা কাসেমের কাছে বিরাট বোঝা অনুভূত হতে থাকল। কিছুক্ষণ পরেই কাসেম জামিলাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। প্রচণ্ড খরতাপ ও পাহাড়ের অগ্নি বিচ্ছুরণের কারণে ঘামে উভয়ের কাপড় ভিজে শরীরের সাথে লেপটে গেছে।

কাসেমের শরীর অবশ হয়ে আসছিল। দীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক হিসেবে কষ্টকর অশ্বারোহণ তার পক্ষে এতোটা অসহনীয় ছিল না কিন্তু এই পলায়নে

জিহাদের ময়দানের যে আত্মশক্তি থাকে তা নেই। যে জামিলা ছিল তার পালানোর প্রেরণা সেই জামিলার প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হলো। নিজের প্রতিও ঘৃণা জন্মাল।

কাসেম অনুভব করল, এ ঘোড়াটিরও দম ফুরিয়ে আসছে। জিহ্বা বের করে দিয়েছে ঘোড়া। ঘন ঘন সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে, দৌড়ের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। বারবার হোঁচট খাচ্ছে। যে দু'টি ঘোড়া নিয়ে কাসেম পালিয়ে এসেছে, এগুলো সেনাবাহিনীর ঘোড়া নয়। সেনাবাহিনীর ঘোড়া দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিতে এবং পানাহার না করেও অবিরাম পাহাড় পর্বত অতিক্রমে অভ্যস্ত থাকে। এগুলো ভাড়াটে ঘোড়া। যেগুলো সাধারণত বেসামরিক লোকেরা এখানে ওখানে যাওয়ার জন্যে ভাড়ায় নিয়ে থাকে। ইমরানের কথা মতো জগমোহন এগুলোকে পাশের গ্রাম থেকে ক'জন মেহমান আনা-নেয়ার কথা বলে ভাড়া করেছিল। এগুলো দুর্গম দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে অভ্যস্ত নয়। তাই অবিরাম দানাপানি ও বিশ্রাম ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় দৌড়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ঘোড়া।

ইমরানের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য কাসেম আরো দুর্গম পথে পা বাড়াল। তালাশ করতে লাগল পাহাড়ের কোন গিরিপথ। তখন সূর্য মাথার উপরে। পাহাড়ের পাথরগুলো যেন খড়তাপে জ্বলছে। প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করছে পাহাড়। ঘোড়া এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পাহাড়ের উঁচু নীচু বেয়ে আর এক কদম চলতে পারছে না। অগত্যা কাসেম ঘোড়া থেকে নামল। জামিলাকেও পাঁজাকোলা করে ঘোড়া থেকে নীচে নামাল। উভয়ে হাঁটতে থাকল হাত ধরাধরি করে। একটু হেঁটেই জামিলা ইশারা ইঙ্গিতে ঠোঁটে আঙ্গুল ধরে বুঝাল, পিপাসায় তার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, তার পক্ষে আর এক কদম হাঁটা সম্ভব নয়। কাষ্ঠ হাসি হেসে কাসেম জামিলাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার নিজেরও যে কষ্টে বুক শুকিয়ে আসছে। শরীরটা নিজের কাছেই ভারী মনে হচ্ছে কাসেমের। ঘোড়াটা আর এগুতে পারছে না। পা হেঁচড়ে চলছে। পাহাড়ের ঢালে একটু ছায়া পড়েছে। সেখানটায় বসে পড়ল কাসেম। জামিলা কাসেমের শরীরের উপর ধপাস করে পড়ে যাওয়ার মতো করে বসে পড়লো। স্বর্ণ মুদ্রার থলেটি জামিলা এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল যে, এটি ময়লার থলে মাত্র। ঘোড়াটি হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক ওদিক করছিল।

আবার জামিলা কাসেমকে বোঝাল, পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কাসেম তাকে কিছুটা বিতৃষ্ণামাখা ভাব নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, কষ্ট হলেও কিছু করার নেই। এখানে কোথাও পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। জামিলা তাকে

ইঙ্গিত করল এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা কোন মতে টেনে তুলে কাসেম পানি তালাশে বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে ফিরে আসল এবং জামিলার কাছে এসে অনিমেষ নেত্রে নিষ্পলক করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার অসহায়ত্ব তাকে বুঝাতে চাইল।

কাসেম যতটা ভয় করছিল ইমরানকে, তার চেয়েও বেশি নির্বিকার ছিল ইমরান কাসেম ও জামিলার ব্যাপারে। ওদের পিছু ধাওয়া করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও ইমরানের ছিল না। কাসেম ও জামিলা হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ইমরানের মাথা থেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল তারা।

ইমরান ও নিজাম আব্দুল জব্বার ওরফে জগমোহন ও রাজিয়ায় রূপান্তরিত ঋষিকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছিল। রোদের তাপ বেড়ে যাওয়ায় তারা একটি ছায়াপড়া ঢালে এসে থামল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা সেই ছায়ায় বিশ্রাম করল।

বেলা ডুবে গেল। ইমরান সাথীদের নিয়ে শুকনো খাবার খেয়ে সংগৃহীত পানি থেকে সবাইকে অল্প অল্প করে পান করতে বলল। যাতে বাকী পথ অতিক্রম করতে কোন অসুবিধার মুখোমুখি না হতে হয়। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে মৃদু মন্দ বাতাসে পাহাড়ের পাথর কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ইমরান সাথীদের নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করল।

"আমরা প্রায় এসে গেছি। কিন্তু বাকী পথ খুবই কঠিন। আমাদের ঘোড়াগুলো খুবই ক্লান্ত। এদের দৌড়ানো সম্ভব নয়। পানাহার ছাড়া বিরামহীন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ায় এগুলোর শক্তি প্রায় নিঃশেষ। তাছাড়া এ এলাকাটি খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করার মতোও নয়। পথ খুব উঁচু নীচু আর পাথরগুলো ধারালো। খুব সতর্ক পায়ে চলতে হবে। অন্যথায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙ্গার আশংকা রয়েছে। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য গজনী পৌঁছা। পথে কোন তাজাদম ঘোড়া পেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে সুলতানকে সংবাদ দেয়া যেতো। রাস্তায় কোন সওয়ারী পেলে ওকে হত্যা করে হলেও ঘোড়া ছিনিয়ে নিতাম। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে প্রয়োজন একটি তাজাদম ঘোড়া।"

"ইমরান! তোমরা না বল ইসলাম আল্লাহ্র ধর্ম? আল্লাহকে বল না ঘোড়াকে পানি পান করাতে?" মুচকি হেসে বলল ঋষি।

"বলার দরকার নেই। আল্লাহ্ সবকিছুই দেখেন।" প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলল ইমরান। "দেখবে এ ঘোড়া পিপাসার জন্যে মরবে না। তুমি বুঝতে পারোনি, আল্লাহর রহম না হলে এ পথ নিরাপদে আমরা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারতাম না। রাজা জয়পাল কাসেম ও নিজামকে পাকড়াও করার জন্যে সারা

দেশব্যাপী লোক ছড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু তাদের ফাঁকি দিয়ে আমরা চলে আসতে সক্ষম হয়েছি। এটা আল্লাহর বিরাট বড় রহমত। ঋষি! এখন তোমাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দিচ্ছি। তোমরা জানতে, আমি মুলতানের অধিবাসী। আসলে আমি মুলতানের অধিবাসী নই, গজনীর বাসিন্দা। গজনী সুলতানের নিয়োগকৃত গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমি। আর আমার দুই সাথী গজনী সেনাবাহিনীর অফিসার। বিগত যুদ্ধে এরা রাজা জয়পালের বাহিনীর কাছে গ্রেফতার হয়েছিল। আমি বন্দিদশা থেকে তাদের মুক্ত করে এনেছি এবং তোমাকেও পণ্ডিতদের আখড়া থেকে উদ্ধার করেছি। উভয় কাজ করেছি আল্লাহ্র ওয়াস্তে। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে প্রত্যেক কাজে মদদ করেছেন। আর জামিলা ও কাসেম জৈবিক তাড়নায় অসৎ উদ্দেশ্যে সবার সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছে। দেখবে, ওদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করেছি। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেনই। সবার যদি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা থাকে তবে পাথর চিরেও পানি বের হওয়া কঠিন কিছু নয়।"

বাস্তবেও পাথরের মধ্যেই পানি পেয়েছিল ইমরানের কাফেলা। তখন প্রায় রাতের দ্বিপ্রহর। পাহাড়ের গায়ে ঝিকমিক করছে চাঁদের আলো। শরীর হেলিয়ে চলছিল ঘোড়া দু'টো। একটি উপত্যকায় তারা এসে পৌঁছাল। হঠাৎ থেমে গেল ঘোড়া দু'টো। লাগাম টেনেও ঘোড়া দু'টোকে নাড়াতে পারল না ইমরান। ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, উভয়টি জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটছে আর উপত্যকার সমভূমির দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে ঘাড় হেলাচ্ছে। লাগাম ছেড়ে দিল ইমরান। ছাড়া পেয়েই ঘোড়া দু'টো সমভূমির দিকে যেতে লাগল।

ইমরান ঋষিকে বলল, ঋষি! তুমি নেমে পড়। ঋষি নামতে পারছিল না। ইমরান এগিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে ঋষি তার কোলে ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়ল। অপর ঘোড়ায় সওয়ার ছিল নিজাম, সেও নেমে পড়ল। ভারমুক্ত হয়ে ময়দানের দিকে দৌড়ে পালাল ঘোড়া দু'টো। ইমরান বলল, আহ্! বেচারা পানির গন্ধ পেয়েছে। আমাদের মশকটা দাও। এদিকে কোথাও পানি আছে। ঘোড়ার সাথে নিজাম আর জগমোহনও দৌড়াতে লাগল। ইমরান ঋষিকে নিয়ে অনুসরণ করল তাদের। দু'টি পাহাড়ের ঢালের নীচুতে গিয়ে থেমে গেল ঘোড়া। মুখ নীচু করে দীর্ঘশ্বাসে পানি পান করতে লাগল। নিজাম ও জগমোহনও ততক্ষণে ঘোড়ার কাছে চলে গেছে। জগমোহন ইমরানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, হায় ভগবান! পানি! ইমরান তার ভগবান ডাক শুনে দূর থেকে বলল, ভগবান নয় 'আল্লাহ্' বল। আল্লাহ্ তোমাকে পাহাড়ের মধ্যে পানির সন্ধান দিয়েছেন, ভগবান পানি দিতে পারে না। সে ঋষির দিকে তীর্যক দৃষ্টি হেনে বলল, 'দেখলে রাজিয়া।

আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে পাহাড়েও পানি দিতে পারেন।' কিছুটা লজ্জিত হলো ঋষি। ইমরানের আল্লাহ্ ভরসা ও দৃঢ়তার দরুন তার প্রতি সশ্রদ্ধভক্তিতে গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল— সে যেন সত্যিকার পথের দিশারী এবং সফল মানুষকেই পেয়েছে।

দূর থেকেই ইমরান দেখতে পেল পানি। চাঁদের আলো পানিতে পড়ে ঝকমক করছে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া পানি পান করে ঘাস খেতে শুরু করল। অথচ গোটা এলাকায় কোথাও ঘাস নেই। শুষ্ক পাথরে ঘাস জন্মাবে কি করে! কিন্তু এখানে পানি থাকায় আশপাশে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে ঘাস। ঘোড়া দু'টো হামলে পড়ল ঘাসের ওপর। আঁজলা ভরে পানি পান করল সবাই। শীতল পানি। তীব্র তৃষ্ণা আর গরমের মধ্যে এই ঠাণ্ডা পানিকে মনে হলো জীবনের সবচেয়ে অমৃত সুধা। সবাই নবপ্রাণ ফিরে পেল যেন। ঘোড়া দু'টোকে ঘাস খাওয়ার অবকাশ দিতে ইমরান একটি বড় পাথরের উপর বসে পড়ল সবাইকে নিয়ে।

কাসেম বলখী ও জামিলা পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে গজনী পৌঁছার জন্যে আবারো রওয়ানা হল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মনে গজনী পৌঁছেই বা কি করবে এ চিন্তা কাসেমকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলছিল। দিকভ্রান্তের মত তারা আধা দিন হেঁটেও একই জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরল। গজনীর দিকে মোটেও অগ্রসর হতে পারল না। এলাকাটি ছিল খুবই জটিল। পাহাড় আর ছোট ছোট টিলায় ভরা। সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ছাড়া পরিচিত পথ ছেড়ে লক্ষ্য স্থির করাও কঠিন। কাসেমের দেহমন অতটুকু স্থির ছিল না যে, সে সঠিক পথের দিক নির্ণয় করতে পারে। ঘোড়া আর চলতে পারে না। জামিলা ও কাসেম উভয়ের অবস্থাও সঙ্গীন। দীর্ঘক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। কতক্ষণ ঘোড়া ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল সেদিকেও খেয়াল নেই কারো। সম্বিত ফিরে এলে কাসেম ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, জামিলাও পড়ে যাওয়ার মতো করে গড়িয়ে পড়ল ঘোড়া থেকে।

ক্লান্ত অবসন্ন কাসেমের দু'চোখ বুজে এলো ঘুমে। তাকাতেই পারছিল না। এক পা নড়ার শক্তিও নেই দেহে। একটি চওড়া পাথরে পা টানটান করে শুয়ে পড়ল কাসেম। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাসেমের বুকটা কাঠ হয়ে গেছে। জামিলা ও ঘোড়ার দিকে তাকানোর ইচ্ছে হলো না কাসেমের। জামিলা এসে কাসেমের গায়ের উপর ঠেস দিয়ে খানিক্ষণ বসল। এরপর কাসেমের বুকের উপর মাথা রেখে ওকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কাসেম দু'হাতে জড়িয়ে নিল জামিলাকে। জামিলাও নিজেকে সোপর্দ করে দিল কাসেমের বুকে। অবসন্ন কাসেম জামিলার সংস্পর্শে অনুভব করল উন্মাদনা। মাথা তুলে জামিলাকে ইঙ্গিতে বুঝাল, পাহাড়ের

ওদিকে একটু আড়াল মতো জায়গার দিকে চলো। জামিলাই উঠে ওকে টেনে তুলল। দু'জন হাত ধরাধরি করে একটি ঝোপের আড়ালে পাহাড়ের গর্তের মতো জায়গায় গিয়ে জীবনের শেষ সাধ মিটাতে প্রবৃত্ত হল। কাসেম অনুভব করল, যে জীবন থেকে সে ফেরার হয়েছে সেই জীবন আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের চিন্তা ও গন্তব্যে পৌঁছার কথা ভুলে গেল তারা। দৈহিক কামনার আগুন জ্বালিয়ে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ ঘুম শেষে কাসেম যখন চোখ মেলল তখন রাত শেষে বেলা উঠে গেছে। হকচকিয়ে উঠল কাসেম। নিজেদেরকে এভাবে পাহাড়ের কোলে অরক্ষিত অবস্থায় দেখে ঘাবড়ে গেল। দাঁড়িয়ে জায়গাটা পরখ করে দেখল, গতকাল সন্ধ্যায় তারা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। রাতের অধিকাংশ সময় চলেও অগ্রসর হতে পারেনি মোটেও। একই জায়গা বৃত্তাকারে ঘুরেছে।

জামিলাকে ডেকে তুলল কাসেম। পরস্পরের প্রতি এরা তাকাতেও পারছিল না। আবার যাত্রা শুরু করতে চাইল কাসেম। কিন্তু ঘোড়াটি আর দেখতে পেল না। কাসেম ভাবল, ইমরান ও নিজাম হয়তো ওদের এখানে দেখে ঘোড়াটি নিয়ে গেছে। আর ওদের রেখে গেছে যাতে ক্ষুৎ-পিপাসায় ওরা মরুপাহাড়ে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুবরণ করে।

ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত ঘোড়া খাবারের সন্ধানে হারিয়ে গেল। বহু খোঁজাখুঁজি করেও ঘোড়ার কোন চিহ্নও পেল না। হতাশ হয়ে ফিরে এলো জামিলার কাছে। ভীত শংকিত কাসেম জামিলাকে টেনে তুলে দৌড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ পাথুরে উঁচুনীচু পথে দৌড়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলল জামিলা। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কাসেম তাকে টেনে তুলে কাঁধে নিয়ে আবার দৌড়াতে লাগল। সোনা-মুদ্রার থলিটাও হাতে নিল। কাসেম ভাবল, ধারে কাছেই হয়তো রয়েছে ইমরান ও নিজাম। ওদের দুরবস্থা দেখলে হয়তো সোনা ও মুদ্রার থলিটা ছিনিয়ে নেবে, জামিলাকেও নিয়ে যাবে তারা। বেশিক্ষণ জামিলাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াতে পারল না। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি ও ক্ষুৎ-পিপাসায় এমনিতেই শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। তদুপরি গত রাতের পাপ ও পালানোর অপরাধবোধ কাসেমের সামনে প্রেতাত্মা হয়ে দেখা দিল।

ক্লান্ত কাসেম আর জামিলাকে বহন করে অগ্রসর হতে পারল না। চোখে সর্ষেফুলের মতো চতুর্দিক অন্ধকার ধোঁয়াটে মনে হলো। মাথা চক্কর দিয়ে উঠল কাসেমের। কাঁধের বোঝার মতো জামিলাকে ছেড়ে দিল কাসেম। যমদূত যেন দাঁত বের করে নাচতে লাগল কাসেমের সামনে। জামিলাকে পরম মমতায়

জড়িয়ে নিল বুকে। জামিলার শরীর অসাড় হয়ে গেল। জামিলা চেতনা হারিয়ে ফেলল। স্বর্ণমুদ্রার থলেটা হাত থেকে পড়ে গেল।

খানিক্ষণ পর জামিলার হুঁশ ফিরতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো কাসেম। প্রাণ ফিরে পেল সে। দু'হাতে বাজু ধরে জামিলাকে বসাল কাসেম। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল কাসেম। স্বগতোক্তি করতে শুরু করল সে :

"তুমি আমার ভাষা বুঝবে না জামিলা! আমরা গজনীর পথ থেকে ফেরার হইনি। আল্লাহ্‌র পথ থেকে পালিয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌র পথ থেকে পালানোদের পরিণতি এটাই অবশ্যম্ভাবী। আমি ছিলাম অভিজ্ঞ সৈনিক। জীবনে বহুবার প্রচণ্ড তুষারপাত, আর লুহাওয়ায় মরু পাহাড়ে দিনের পর দিন বিরামহীন যুদ্ধ করেছি। দীর্ঘ সময় অনাহার, অনিদ্রা, ক্ষুধা-পিপাসায় কাটিয়েছি। সাথীদের অনেকেই শাহাদাৎ বরণ করেছে, আহত হয়েছে। হাত পা হারিয়েছে, নিজেও যখম হয়েছি, কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হইনি, আজকের মতো সাহস হারাইনি, এমন অসহায় বোধ করিনি। আমার শরীরের রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেলেও এমন বলহীন হওয়ার কথা নয়। এখন আমি জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। জানো, এর কারণ কি?"....উদ্বেলিত কাসেম জামিলাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'জান?' কিন্তু জামিলা তার কোন কথাই বুঝেনি। ফ্যালফ্যাল করে হা করে শুধু তাকিয়ে রইল কাসেমের দিকে। কাসেমের ভাষা না বুঝলেও জামিলা অতটুকু ঠিকই বুঝল, যে শক্ত সামর্থবান যুবককে সে দেহের কামনা পূরণের অপরিমেয় আধার মনে করেছিল সেই যৌবনের ঝর্ণা এখন শুকিয়ে গেছে, প্রেমের উত্তাপ নিভে গেছে। আবারো বলতে শুরু করল কাসেম :

"যুদ্ধ ময়দানে আমাদের দেহ নয়, আমাদের আত্মা লড়াই করতো। আমরা যুদ্ধ করতাম জাগতিক কোন লোভ-লালসার জন্যে নয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। আর এখানে আমরা পালিয়েছি দেহের কামনা আর মনের বাসনা পূরণে। আমরা আদর্শবিচ্যুত অপরাধী। তাই মাত্র দু'দিনের বৈরী পরিস্থিতিতে আমি প্রাণশক্তি খুইয়ে বসেছি। নিজের শরীরটাই এখন আমার কাছে ভারী মনে হচ্ছে। তোমার রূপের জৌলুস ম্লান হয়ে গেছে, তোমাকে মনে হচ্ছে দুর্গন্ধময় একটা পঁচা মরদেহ।

জামিলা! আমরা অপরাধী। পাপী। পাপীর কোন ঠিকানা নেই। দুনিয়াতে পাপীরা জীবনকে পাপাচারে ভোগ করে আর পরকালে আগুনে পুড়ে ভোগের প্রায়শ্চিত্ত করে।

জামিলা! আমরা পথচ্যুত হয়েছি। আমাদের সাথীরা সত্যপথের উপর রয়েছে। ওই হিন্দু মেয়ে ও তার ভাই সত্যের ঠিকানা পেয়েছে। মাটির মূর্তির পূজা ছেড়ে তারা আল্লাহ্‌র পথের দিশা পেয়েছে। ওরা ঠিক তাদের গন্তব্যে পৌছবে, কিন্তু আমরা ভ্রষ্টতার শিকার। আমাদেরকে এই বিজন প্রান্তরেই মরতে হবে।"

কাসেম বেদিশা হয়ে পড়েছিল। জীবনের করুণ পরিণতি আর অতীতের সুকীর্তি তাকে এতই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যে, তার আওয়াজ চড়ে গেল। জামিলা ভড়কে গেল কাসেমের উন্মাদনা দেখে। জামিলা হাত দিয়ে কাসেমের মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করল। বাকরুদ্ধ হয়ে কাসেম হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। জামিলাও জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুইয়ে ফেলেছে। তবুও কাসেমকে সান্ত্বনা দিতে নিজের ভাষাতেই বলতে শুরু করল :

"কাসেম! স্থির হও। এখনও আমরা চেষ্টা করলে বাঁচতে পারব। তোমাকে সাহায্য করার সামর্থ আছে আমার। যে কোন রাজ্যে আমরা দু'জন স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারব। প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আমাদের হাতে রয়েছে। তুমি নিরাশ হয়ো না। আমার দিকে তাকাও। উঠ।"

"আমি জানি না তুমি কি বলছো জামিলা! আমি কি বলি তাও বুঝতে পার না তুমি।" নিজের মত করে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কাসেম। জামিলাকে হাত ধরে টেনে তুলে বলল, "মৃত্যু ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই। এসো, মরার জন্য আরো ভাল কোন জায়গা পাওয়া যায় কি-না দেখি?"

ইমরানের কাফেলা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমতল ভূমিতে চলে এসেছিল। পথিমধ্যে তারা আরো এক জায়গায় পানির সন্ধান পেয়েছিল। তাদের কাফেলার গতি ছিল মন্থর। কেননা দু'জনকে পায়দল চলতে হতো। হঠাৎ একটি ঘোড়া দেখতে পেল নিজাম। ঘোড়ার গায়ে গদি আঁটা। কিন্তু আশপাশে কোন আরোহীকে দেখা গেল না।

ইমরানকে ডেকে বলল নিজাম, ইমরান! তুমি বলেছিলে কোন ঘোড়া পাওয়া গেলে আরোহীকে হত্যা করে হলেও ঘোড়া ছিনিয়ে নেবে। ওই দেখ! একটি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে।

নিজামের ইঙ্গিতে মরুভূমির দিকে তাকাল ইমরান। গদি আঁটানো একটি ঘোড়া আপন মনে ঘাস খাচ্ছে।

"আমার দৃষ্টিভ্রম না হলে বলতে পারি ঘোড়াটি আমাদেরই।" বলল ইমরান।

তারা একটু এগিয়ে দেখল, সত্যি ঘোড়াটি তাদেরই। যে দু'টো ঘোড়া নিয়ে কাসেম পালিয়েছিল এটি সে দু'টোর একটি। কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না।

ইমরান ও নিজাম তরবারী কোষমুক্ত করে নিল। কারণ, হঠাৎ কোন আড়াল থেকে তাদের উপর কাসেমের আক্রমণ করার আশংকা রয়েছে। কিন্তু আশে পাশে বহু খোঁজাখুঁজি করেও জামিলা ও কাসেমের দেখা পাওয়া গেল না। খুঁজে না পেয়ে ইমরান ও নিজাম কাসেমকে ডাকতে শুরু করল।

"কাসেম! আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। অতীতের সবকিছু আমরা ভুলে যাবো। তোমাকে বন্ধুর মতোই বরণ করে নেবো। কাসেম লুকিয়ে থেকো না, আমাদের সাথে চলে এসো!"

বহু ডাকাডাকির পরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

"ইমরান! ওদিকে দেখ। শকুন উড়ছে।" বলল নিজাম।

বিস্তীর্ণ মাঠের কোথাও শকুনের ঝাঁক উড়তে দেখার মানে ওখানে কোথাও মৃতের অস্তিত্ব রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহে শকুনের আক্রমণ বহুবার দেখেছে নিজাম। ইমরানেরও রয়েছে এ অভিজ্ঞতা। কাফেলাকে দেখে ঘোড়াটি মুখ উপরে তুলে হ্রেষারব করল। কিন্তু পালাতে চেষ্টা করল না। নিজাম ধীর পায়ে এগিয়ে ঘোড়ার বাগ হাতে নিল। অমনি ইমরান এক লাফে সওয়ার হলো ঘোড়ায়। নিজামও তার পিছনে চড়ে বসল। ঘোড়াটি বেশ ফুরফুরে। বোঝা যায় পর্যাপ্ত ঘাস ও পানি খেয়েছে সে। হয়তো বিশ্রামের কাজটিও সেরে নিয়েছে ইতিমধ্যে। তারা দ্রুত অগ্রসর হল শকুনের পালের দিকে। শকুনেরা কি যেন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

কাছে গিয়ে ইমরান ও নিজাম কয়েকটি ঢিল ছুঁড়ে দিল শকুনের দিকে। ঢিল খেয়ে দূরে সরে গেল শকুনেরা। কাছে গিয়ে দেখল, দু'টি লাশ অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে। মরদেহ দু'টি আর কারো নয় কাসেম ও জামিলার। শকুন দল এরই মধ্যে ওদের পেট ফেড়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে ফেলেছে। স্বর্ণ ও মুদ্রার থলেটি কাসেমের মুষ্টিবদ্ধ। ইমরান মুষ্টি খুলে থলেটি ছাড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই মুষ্টি খুলতে পারছিল না ইমরান। খুব বেশি আগে মরেনি এরা। শরীর এখনও তাজা। গা থেকে কোন দুর্গন্ধও ছড়ায়নি।

নিজাম ইমরানের উদ্দেশে বলল, "ইমরান! রেখে দাও ওসব। এগুলো ওদের হাতেই থাক। এই সোনা আর দেহই তো এদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। এসব ওদের কাছে থাকুক। আমাদের এ দিয়ে দরকার নেই। গজনী সালতানাতের

সম্পদ নয় এগুলো। এগুলো না নিলেও আমাদের অপরাধ হবে না। হতভাগাদের আত্মা হয়তো এতে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। এসো। আমরা চলে যাই।" একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে করুণ দৃষ্টিতে একবার উভয়কে দেখে চলে এলো ইমরান। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিরামহীন পলায়নে ক্ষুধা, পিপাসায় এদের মৃত্যু হয়েছে। যদি ডাকাতের আক্রমণে মরত তাহলে কাসেম অক্ষত থাকতো না, জামিলাকেও ডাকাতেরা রেখে যেত না। তাছাড়া স্বর্ণ ও মুদ্রার থলেটি এদের কাছে পাওয়া যেত না।" বলল ইমরান।

"আহ্! কি দুর্ভাগ্য এদের। আর একটু অগ্রসর হলেই পানি পেয়ে যেত এরা। এদের বাঁধনমুক্ত হয়ে ঘোড়া পানি ও ঘাসের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু এদের ভাগ্যে পানি জুটেনি। বন্ধুরা! ... এদের থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এতো বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রাও এদের জীবন রক্ষা করতে পারল না। বরং অনেক সময় টাকা ও সোনা-গয়না মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়।" ঋষিকে ইঙ্গিত করে বলল ইমরান।

"দেখো রাজিয়া! রূপের পরিণতি দেখে নাও। রূপ সৌন্দর্যের বড় গর্ব ছিল জামিলার। সে তার রূপের জালে আমাকেও বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু জামিলার মায়াজালে ধরা দিল কাসেম। আর এই রূপ আর সোনা দানাই কাল হলো ওদের।"

করুণ এ দৃশ্য ও ইমরানের কথায় অশ্রুসজল হয়ে উঠল রাজিয়া।

ওদের করুণ পরিণতি পিছনে ফেলে ইমরানের কাফেলা রওয়ানা হল গজনীর দিকে। এখন তাদের একজন সওয়ার হলো কাসেমের ঘোড়ায়।

সুলতান মাহমুদের কাছে যখন সংবাদ গেল যে, একজন মহিলাসহ লাহোর থেকে তিনজন লোক এসেছে। তারা সুলতানের সাথে দেখা করতে চায়। সুলতান হাতের কাজ রেখে তাদের ডেকে পাঠালেন। ইমরান ও নিজাম সুলতানকে সালাম দিয়ে মহলে ঢুকল। রাজিয়া ও আব্দুল জব্বারের কোন প্রয়োজন ছিল না, তাই তারা বাইরে অবস্থান করছিল।

ইমরান বিস্তারিত রিপোর্ট দিল। বাটাণ্ডার গোয়েন্দাদের তৎপরতা এবং রাজা জয়পালের সব যুদ্ধপোকরণ পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও সবিস্তারে জানাল। সে এ কথাও ব্যক্ত করল, কিভাবে নিজাম ও কাসেমকে রাজার বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং কিভাবে হিন্দু মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে পণ্ডিতদের আখড়া থেকে।

কাসেমের বিচ্যুতির কথা শুনে সুলতান খুব আফসোস করলেন। দুঃখে অনুতাপে সুলতানের চেহারা বিষাদময় হয়ে উঠল।

"নারী ও সম্পদের লিপ্সা মুসলিম জাতিকে যেভাবে পেয়ে বসেছে তা আমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" বললেন সুলতান। "সম্পদ আর নারীলিপ্সায়ই আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে। আচ্ছা, তোমরা কি সঠিক জানো, জয়পাল গজনী আক্রমণ করবে?"

"মহামান্য সুলতান! এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।" বলল ইমরান। "রাজার যুদ্ধ সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে গেলেও সেখানে রসদের ঘাটতি নেই। ইতোমধ্যে সে হয়তো ধ্বংস হওয়া সম্পদের ঘাটতি পূরণ করে ফেলেছে।"

"তোমাদের অন্য সাথীরা ওখানে কি করছে?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। "জয়পালের তৎপরতা সম্পর্কে আমার নিশ্চিত হওয়া দরকার, সে কি পরিমাণ সৈন্য নিয়ে আসছে?"

"বাটান্ডার লোকদের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাকে বলেছি। ওরা সেখানকারই বাসিন্দা। অধিকাংশই যুবক। খুব সাহসী উদ্যমী। ওয়াইস-এর তত্ত্বাবধানে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে। ওয়াইস আমাদের এখানকার লোক। সেখানের একটি মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব নিয়েছে কাজের সুবিধার জন্যে। রাজার সেনাবাহিনী রওয়ানা হলেই সে বিস্তারিত সংবাদ আপনাকে জানাবে।"

"মহামান্য সুলতান! আপনি আর কোন সংবাদের অপেক্ষা না করে প্রস্তুতি শুরু করে দিন।" বলল নিজাম। "জয়পালের সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছে। তার কথাবার্তা থেকে বুঝেছি, যে কোন মূল্যে সে গজনী আগ্রাসন চালাবে। সে তার সেনা অফিসারদের সাথে যেসব পরামর্শ করেছে তাও শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। এবার সে পরাজিত নয় বিজয়ী হতে জীবনের শেষ আক্রমণের উদ্দেশে আসবে। মোকাবেলা সমান সমান নয়, দশের বিরুদ্ধে একজনের হবে এমন বিশাল হবে রাজার বাহিনী। তাই অতীতের মতো মুখোমুখি নয় গেরিলা পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে আমাদের। অবশ্য রাজা এক ধরনের নির্ভাবনায় রয়েছে যে, সুলতান সুবক্তগীনের ইন্তেকালের পর সেনাবাহিনী সামাল দেয়ার মতো দক্ষ কেউ গজনী বাহিনীতে নেই। তার এই চিন্তাই আমাদের বড় এক হাতিয়ার।"

"সৈন্য তো আমার কম ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের কারণে বহু সৈনিক বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে গেছে। যদ্দরুন আমাদের সেনাবল কমে গেছে। আমাদের সেনা অফিসারদের মধ্যে এখন ক্ষমতার লোভ দেখা দিয়েছে।

ইসলামের পক্ষে জিহাদ করার যোগ্যতা আর নেই এদের। সেনা অফিসাররা যখন ক্ষমতার মসনদ দখলের পেছনে পড়ে তখন সে জাতির ধ্বংসের সুড়ং পথ সৃষ্টি হতে থাকে। স্বজাতির ধ্বংস নিজেরাই টেনে আনে।”

তখন সুলতান মাহমূদ গজনী, বলখ ও খোরাসানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সাথে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থাও করছিলেন। ইত্যবসরে নিজাম ও ইমরান লাহোর থেকে জয়পালের আক্রমণের খবর নিয়ে এলো। এদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার পর সুলতান সব সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে পরামর্শ সভায় বসলেন। সেনা কমান্ড আগেই নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন সুলতান। সেনাদের তিনি বললেন :

“এটা নিশ্চিত যে, হিন্দুস্তানের সব রাজা-মহারাজাকে নিয়ে তৃতীয়বার গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে জয়পাল। সেনা কমান্ড আগের মতো রাজার হাতেই থাকছে। ওদের সৈন্যসংখ্যা কত সে সংবাদ নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি বটে, তবে অন্তত এক লাখের কম হবে না তা অনুমান করা যায়। লাহোরে আমাদের লোকেরা রাজার সব রসদপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে। এজন্য রাজার অভিযান কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। আপনারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটি জানেন। সব সৈন্যকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারছি না। কারণ, সব সৈন্য বাইরে নিয়ে গেলে আমাদের ভাইয়েরা সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে আমাদের পিঠে ছুরি বসাবে।

এটা আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। আপনারা কি কখনও ভেবেছেন, যদি হিন্দুদের হাতে গজনীর পতন ঘটে তবে ওইসব ক্ষমতালিপ্সুদের অবস্থা কি হবে? শুধু তাই নয়, গজনীর পতন হলে হিন্দুরা খানায়ে কা'বা পর্যন্ত পৌত্তলিক প্রভাব বিস্তার করবে। অভিজ্ঞ প্রবীণগণ আমাকে জানিয়েছেন, ভারতের হিন্দু পণ্ডিতেরা দাবী করে, পুরাকালে দজলা ফোরাত পর্যন্ত নাকি হিন্দুদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তাই তারা কা'বা পর্যন্ত রামরাজ্য বিস্তৃত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের মনে রাখতে হবে, এরা শুধু যুদ্ধ করতে আসছে না, সাথে নিয়ে আসছে পৌত্তলিক ধর্ম আর আগ্রাসী চরিত্র। ইসলামের ধ্বংস সাধনে আমাদের প্রাণকেন্দ্রে আগ্রাসন চালাতে চায় হিন্দুরা। আপনাদেরকে শুধু সালতানাত ও নিজেদের ধনজন রক্ষার জন্যে নয় আমাদের প্রাণকেন্দ্র কা'বার সুরক্ষার জন্যে মরণপণ যুদ্ধ মোকাবেলা করতে হবে। আপনাদের সুবিধা হলো, হিন্দু সেনাদের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড ভীতি রয়েছে। লাহোর থেকে দু'জন লোক খবর নিয়ে এসেছে। তারা জানিয়েছে, গত যুদ্ধের পর পালিয়ে বেঁচে যাওয়া রাজার সৈন্যরা দেশে ফিরে গজনী বাহিনীর আতংক ছড়িয়েছে। রাজার নতুন সৈন্যদের মধ্যে গজনী সেনাদের আতংক বিরাজ করছে।

এছাড়াও আপনাদের আরেকটি সুবিধা হলো, আপনারা গজনীর বাইরে নিজ ভূমিতে সুবিধামতো জায়গায় ওদের মোকাবেলা করবেন। ময়দান আপনাদের মর্জি মতো হবে। গুপ্ত হামলার প্রচুর সুবিধা থাকবে আপনাদের হাতে। এছাড়াও লুমগানের বেশ কয়েকটি দুর্গকে ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহারের সুবিধা থাকবে আপনাদের। ...

জয়পালের বাহিনীতে অনেক হাতি থাকবে। হাতির সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারটি ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন। হাতি যেমন সুবিধাজনক, আত্মঘাতি পরিণতির জন্যে এগুলো ততোধিক মারাত্মক।

আমরাও হাতি ব্যবহার করব কিন্তু আক্রমণাত্মক হামলায় নয় জবাবি আক্রমণে। ওদের সাথে এটা হবে আমাদের চূড়ান্ত লড়াই। পূর্বের কৌশলই অবলম্বন করতে হবে। সম্মুখ মোকাবেলা এড়িয়ে দুই প্রান্তে আক্রমণ করে দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে হবে। দুশমনদেরকে আমাদের পিছনে তাড়িয়ে এনে সুযোগ মতো খেলিয়ে খেলিয়ে হত্যা করতে হবে ...।

শত্রুবাহিনীকে কখনও দুর্বল মনে করা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমরা যদি বিজয়ী হই তবে পেশোয়ার পর্যন্ত ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে এবং পেশোয়ার দখল করে নিতে হবে। আমি ওই এলাকার ভৌগোলিক মানচিত্রও আপনাদের দেখাচ্ছি। এর আগে আপনাদের মনে একথা গেঁথে নিতে হবে, আপনারা ইসলামের সুরক্ষার জন্যে লড়াই করছেন, এ লড়াই হক ও বাতিলের লড়াই। যে লড়াই আমাদের নবীজী (স.)-এর যুগে শুরু হয়েছিল, সেই লড়াই আজও আমাদেরকে লড়তে হচ্ছে। এমন যাতে না হয়, আমাদের হাতে ইসলাম ও মুসলমানদের অপমান হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের নাম ঘৃণাভরে স্মরণ করবে, তাই আমাদের শ্লোগান হবে— "হয় মৃত্যু না হয় বিজয়'।"

দীর্ঘ উজ্জীবনীমূলক বক্তব্যের পর সুলতান মানচিত্রটি সেনা অফিসারদের সামনে মেলে ধরলেন। তাদেরকে বোঝালেন কোন কোন পথ অবলম্বন করে রাতের অন্ধকারে গেরিলা আক্রমণ চালাতে হবে। সবশেষে বললেন, আগামী প্রত্যুষেই আমরা অভিযান শুরু করব। সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখুন।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে, ১০০১ সালের আগস্ট মাসে মাহমূদ মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে জয়পালের মোকাবেলায় গজনী থেকে রওয়ানা হন। তার বাহিনীতে ছিল জয়পালের কাছ থেকে পাওয়া ৫০টি হাতি। সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। পদাতিক বাহিনী বেশি ছিল না। কারণ, গজনীর

নিরাপত্তা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা রেখে যেতে হয়েছিল। মাহমূদের যুদ্ধকৌশল ছিল সম্মুখ সমরে প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রেখে গেরিলা আক্রমণে শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করা। এজন্য পদাতিক বাহিনীর চেয়ে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, পেশোয়ারে সুলতান মাহমূদ আক্রমণ করেছিলেন, এটা সঠিক নয়। আক্রমণের সব ব্যবস্থা রাজা জয়পালের পক্ষ থেকে হয়েছিল। গজনী আক্রমণের জন্যে জয়পাল যখন রওয়ানা করে সুলতান মাহমূদ আগেভাগেই গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সে খবর পেয়ে গজনীর বাইরে পেশোয়ারের সন্নিকটে জয়পালের মোকাবেলা করেন। এ বিষয়টিকে কুটিল ইতিহাসবেত্তারা উল্টোভাবে উপস্থাপন করেছে।

রাজা জয়পাল ক'দিনের মধ্যে রসদ ও আসবাবের ঘাটতি পূর্ণ করে ফেলেছিল। জয়পাল খুব তাড়াতাড়ি গজনী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে তার জেনারেলদের বলেছিল, "যে আমার আক্রমণ প্রতিহত করেছিল সেই সুবক্তগীন মরে গেছে। এবার গজনীই হবে আমার রাজধানী। দেবতার চরণে কুমারী বলী দিয়েছি। এবার দেবতাও আমার উপর সন্তুষ্ট। দেবতা আমার সহযোগিতায় থাকবেন। বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।"

* * *

এবার আগের মতো হিন্দুস্তানের অন্য রাজা-মহারাজারা সৈন্যবল বেশি দেয়নি। তাদের সন্দেহ ছিল জয়পালের বিজয়ের ব্যাপারে। এজন্য টাকা পয়সা প্রচুর দিয়েছে কিন্তু অনর্থক সেনাক্ষয় এড়ানোর জন্যে নানা অজুহাতে সেনা সাহায্য কম করেছে। তারপরও দেখা গেছে, রাজা জয়পাল যখন লাহোর থেকে গজনীর উদ্দেশে রওয়ানা হয় তখন তার সাথে ছিল বারো হাজার অশ্বারোহী, ত্রিশ হাজার পদাতিক ও তিনশ' সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি। রসদ, যুদ্ধাস্ত্র ও আহার সামগ্রী প্রায় এক বছরের সাথে নিয়েছিল রাজা। এক মাইলেরও বেশি দীর্ঘ ছিল রসদ সরঞ্জাম বোঝাই গরুর গাড়ির বহর। এছাড়া বিজয়ের পর গজনীর বণিক শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের বশে আনার জন্যে প্রচুর সোনাদানা-মণিমুক্তা সাথে নিয়েছিল জয়পাল।

রাজা অভিযান শুরু করতে খুবই উদগ্রীব ছিল। তাই খুব ব্যস্ততার মধ্যেই অভিযানে বের হল। তার ধারণা ছিল, গজনী সুলতানের অজান্তে সে গজনীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নিবে। জয়পাল লাহোর থেকে পেশোয়ারে পৌছে মাত্র একরাত সেখানে অবস্থান করে। যাতে মালবাহী গরুর গাড়ীর বহর পৌছে যায়। এর পরদিনই গজনীর উদ্দেশে লাহোর ত্যাগ করে পথে নামে জয়পাল।

পেশোয়ার ত্যাগ করার সাথে সাথেই গজনীর গোয়েন্দারা সুলতানকে রাজার সামগ্রিক রণসজ্জার সংবাদ পৌঁছে দেয়। সুলতান জয়পালের সৈন্যসংখ্যা ও সামগ্রিক আয়োজনের খবর যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই পেয়ে গেলেন।

পেশোয়ার ছেড়েই রাজা জয়পাল জানতে পারে, সুলতান মাহমূদ পাহাড়ী এলাকায় তাঁবু ফেলেছেন। রাজা মাহমূদের আগমন সংবাদ বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবুও পাহাড়ী এলাকাতেই তার বাহিনীকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দেয়। আর সংবাদটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে সুলতান মাহমূদের অবস্থান জানার জন্য একটি দলকে পাঠাল রাজা। কিন্তু সেই দল আর ফিরে আসতে পারল না। গজনী বাহিনী জয়পালের সাথে বোঝাপড়া ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

তখনও ভোর। চারদিকে আবছা অন্ধকার। এরই মধ্যে গজনীর বীর বাহিনী গেরিলা হামলা চালিয়ে জয়পাল বাহিনীর একটি বাহুর তাঁবু ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিছু সংখ্যক নিহত ও আহত হয় রাজার সৈনিক। রাজা সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। ততক্ষণে পূর্বাকাশে সূর্য উঠে গেছে। রণসাজে সজ্জিত হয়ে জয়পাল বাহিনী যখন সামনে বাড়ল তার বহু আগে থেকেই সুলতানের অশ্বারোহীরা তাদের স্বাগত জানাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো।

জয়পাল তার সৈনিকদের আক্রমণ হানতে নির্দেশ দিল। হিন্দুবাহিনী হস্তিদলকে সামনে বাড়িয়ে দিল। সুলতানের সৈন্যরা হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হয়ে এদেরকে বিক্ষিপ্ত করতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল এবং সুযোগ মতো হাতিগুলোকে আহত করতে তৎপর হল। একটু অগ্রসর হয়ে আবার পিছিয়ে আসা। আবার আগে বেড়ে পাশে ছড়িয়ে পড়া। এভাবে রাজার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সুলতানের সৈন্যরা। ওদিকে সুলতান মাহমূদ নিজে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজার বাহিনীর পিছনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু জয়পালের সৈন্যরা মাহমূদের ঘেরাও প্রচেষ্টাকে দেখে ফেলল এবং পিছনে সরতে শুরু করল।

রাজার সৈন্যরা পিছনের দিকে মোড় নিলে সুলতান আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তুমুল লড়াই বেঁধে গেল। লড়াই যখন তুঙ্গে গজনী বাহিনী তখন পিছনে সরে আসতে থাকে। গজনী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করছে দেখে হিন্দুরা তাদের ধাওয়া করে। এবার সুলতানের বাহিনী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় রাজার বাহিনী দু'ভাগ হয়ে গেল। ওদের একদল পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হল আর অপর দল পেশোয়ারের দিকে এগুতে লাগল।

এই সুযোগে সুলতানের কিছু সৈন্য প্রতিপক্ষের মাঝে চলে এলো এবং শত্রুবাহিনীর দুই প্রান্তে জোরদার আক্রমণ চালাল। রাজা জয়পাল ছিল দু'দলের মাঝামাঝি। পতাকা ছিল জয়পালের সাথে। কয়েকজন সৈন্য ছিল পতাকার পাহারায়। সুলতানের এই ছোট্ট দলটি রাজার পতাকা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে ঝাণ্ডা বাহিনীর উর্পর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু তাদের কারো পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হলো না। রাজার ঝাণ্ডাবাহিনী অক্ষত রয়ে গেল।

দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রাজার দু'অংশের সাথে তুমুল লড়াই চলল। গজনী বাহিনী এদের খেলিয়ে খেলিয়ে কচুকাটা করছিল। এদিকে রাজা চাচ্ছিল সুলতানকে এখানে ব্যস্ত রেখে সে বিরাট বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে গজনী কব্জা করে নেবে। সেজন্য রাজা গজনীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

যখনি রাজা গজনীর দিকে কিছুটা অগ্রসর হলো, লুকিয়ে থাকা সুলতান বাহিনীর গেরিলাদের টার্গেটের মধ্যে এসে গেল শত্রুসেনারা। শুরু হলো শত্রুদের উপর তীর বৃষ্টি। তীরের আঘাতে রাজার সৈন্যরা মাটিতে ছিটকে পড়ে পাথরখণ্ডের মত ভূতলে গড়াতে লাগল। ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র ১০ হাজার মুসলিম অশ্বারোহী। সুলতানের সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতিও ছিল প্রচুর, কিন্তু লড়াই ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে চলে আসছিল।

রাজা চাচ্ছিল মুসলমানরা সম্মুখ সমরে মোকাবেলা করুক। চেষ্টাও করছিল সেরূপ। তার সৈন্যদের ট্রেনিংও ছিল মুখোমুখি লড়াইয়ের। কিন্তু সুলতানের বাহিনী মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আকস্মিক আক্রমণ করে আবার দূরে সরে যাচ্ছিল, ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল হিন্দু-মুশরিকদের। সুলতান তার সুবিধামতো ময়দান নির্বাচন করে সেখানেই যুদ্ধের সূচনা করেন। রাজার ভাবনা ছিল ভিন্ন। ভেবেছিল, অতর্কিতে সে গজনী আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করে ফেলবে।

সময় যতই যাচ্ছিল রাজার বাহিনী ততই পর্যুদস্ত হচ্ছিল। বিরাট সেনাবল থাকার পরও জয়পাল প্রাণপণ লড়াই করে যুদ্ধ আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হচ্ছিল। রাজা চাচ্ছিল যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে, তাতে সে বাহিনীকে নতুন করে বিন্যাসের সুযোগ পাবে, কিন্তু মুসলিম সৈনিকেরা ততক্ষণে 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার' বলে ময়দানে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোমেলো হয়ে পড়ে জয়পালের সৈন্যরা। জয়পালের যুদ্ধ বিলম্বিত করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়ার পর পড়ন্ত বিকেলে সুলতান মাহমূদ পঞ্চাশটি হাতি আর দু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর পশ্চাতে তীব্র আক্রমণ করেন। জয়পালের শক্তি-কেন্দ্র ঘিরে ফেলে দু'হাজার অশ্বারোহী। তুমুল লড়াইয়ে বহু হতাহত হলো, জয়পাল বহু চেষ্টা করেও ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যেতে ব্যর্থ হলো। শীর্ষস্থানীয় পনেরজন কর্মকর্তাসহ গ্রেফতার হলো রাজা।

রাজার পতনে তার বাহিনী পালাতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল পেশোয়ার পর্যন্ত। হিন্দু বাহিনী শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার এড়াতে ও জীবন বাঁচানোর জন্য যে যেভাবে পারে পলায়নে প্রবৃত্ত হল। অবস্থা এমন হল যে, রাজার বিশাল বাহিনীকে বকরীর পালের মতো অল্প ক'জন মুসলিম সৈন্য বাঘের মতো তাড়িয়ে নিল।

সন্ধ্যার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। রাজা জয়পাল জীবনের চূড়ান্ত যুদ্ধেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। অবশ্য গজনী বাহিনী এ বিজয়ে জীবন ও রক্তের যে মূল্য শোধ করেছেন তা গজনীর মানুষ কখনও শোধ করতে পারেনি। দুপুরের আগেই যুদ্ধ পরিণতির দিকে গড়ায়। তখনই পাঁচ হাজারের বেশি শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে ফেলেছিল মুসলিম সৈন্যরা।

সুলতান তার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, মুখোমুখি সংঘর্ষে যাবে না। রাজার দু' প্রান্তে হঠাৎ করে ক'জন আক্রমণ করে আবার পালিয়ে যাবে, আবার ঘুরে এসে আক্রমণ শানাবে। এভাবে ছোট্ট ছোট্ট দলে হঠাৎ আক্রমণ করে চলে যাবে। তাতে শত্রুবাহিনী সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকবে, কোথা থেকে এসে প্রতিপক্ষ হামলা করে বসে, আর হামলা কীভাবে এবং কতোটা কঠিন হচ্ছে তা নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকবে।

এমনিতেই মুসলিম বাহিনীর আতংক বিরাজ করছিল জয়পাল শিবিরে। তদুপরি গজনী সৈন্যদের ক্ষীপ্র আক্রমণ আর আক্রমণ করে দ্রুত প্রস্থান করার ফলে পৌত্তলিকরা বুঝতেই পারলো না গজনী বাহিনীর সংখ্যা কত। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ছিল না জয়পাল বাহিনীর। অপর দিকে রাজার সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে সুলতানের প্রত্যেকটি সৈনিক ছিল অবগত। যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই তারা গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সহায়তায় প্রতিপক্ষের শক্তি সামর্থ ও প্রস্তুতির পরিপূর্ণ তথ্য পেয়ে গিয়েছিল। ফলে সুলতান বাহিনীর সামনে অস্ত্রসমর্পণ করতে হলো রাজা জয়পালের।

পেশোয়ার থেকে কিছুটা দূরে 'মিরান্দ' নামক স্থানে রাজা ও তার কর্মকর্তাদের হাজির করা হল সুলতানের সামনে। দোভাষির সাহায্যে শুরু হলো বন্দী ও বিজয়ীর মধ্যে সংলাপ।

"যুদ্ধ আপনি ও আমার মধ্যে হয়েছে কিন্তু জয় পরাজয় আপনি ও আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ ইসলামের বিজয়। আল্লাহ্ তাআলা এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন— সত্যের মোকাবেলায় মাটি-পাথরের তৈরি দেব-দেবীদের কিছুই করার শক্তি নেই। ওরা মানুষের ভালমন্দ সংঘটনের মালিক নয়। মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। জন্ম-মৃত্যু জয়-পরাজয় তাঁর ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। এ নিয়ে আপনার তৃতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হলো। এবার বিজয়ের জন্যে কুমারী বলীদান করেছিলেন। আপনার কল্পিত দেবতারা হয়তো আপনাকে নিরপরাধ কুমারী হত্যার শাস্তি দিয়েছে। কুরবানী আমরাও দেই তবে কাউকে খুন করে নয়। রণাঙ্গনে আমাদের সৈনিকদের লাশগুলো দেখুন! বুঝতে পারবেন, আল্লাহর জন্যে মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে। আমাদের কুরবানী আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আপনি কি আমাদের ঈমানে বিশ্বাস করেন? আপনার পঞ্চাশ হাজারের বিশাল বাহিনীকে মাত্র ১০ হাজার অশ্বারোহী ভেড়া বানিয়ে ছেড়েছে!"

"আপনার সাথে আমি ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে চাই না।" বলল রাজা। "পরাজয় আমি মেনে নিচ্ছি। আমি আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি। সেই সাথে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর কোন দিন আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করব না।"

"হতেও পারে, চুক্তি করার পরও ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে আপনি চুক্তি ভঙ্গ করবেন। আপনার দ্বারা এমনটা হওয়া স্বাভাবিক।" বললেন সুলতান।

"না! এমনটি আমি কখনও করব না। এখন বলুন, সন্ধির জন্যে আপনাকে কি পরিমাণ মুক্তিপণ দিতে হবে?"

"মুক্তিপণের মধ্যে আমি যুদ্ধে প্রাপ্ত কোন সম্পদ গণ্য করব না। কারণ এগুলো গনীমত।" বললেন সুলতান।

রাজার বাহিনীতে ছিল বিপুল সম্পদ। আফগানদের অনুগত করতে বহু মূল্যবান মণিমুক্তা, হীরা-জহরত, স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে এসেছিল রাজা। সেই সাথে গোটা বাহিনীর এক বছরের আহার সামগ্রী।

ঐতিহাসিকদের মতে, কুড়িটির মতো মুক্তার হার ছিল জয়পালের কাছে। আর স্বর্ণ ছিল পাঁচমণ। একটি হীরার হারের তখনকার বাজার মূল্যে ছিল আশি হাজার দিনার।

চুক্তি সম্পাদনে শর্ত করা হল : আড়াই লাখ দিনার ও পঞ্চাশটি সামরিক হাতির বিনিময়ে রাজাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। পণবন্দী হিসেবে তার কর্মকর্তাদের বন্দী করে রাখা হবে।

পেশোয়ার পর্যন্ত অধিকার করে নিলেন সুলতান। খায়বর ও আশপাশের সকল পাহাড়ী এলাকায়ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, ৮ মহররম ৩৮২ হিজরী সনের ২৭ নভেম্বর ১০০১ খৃষ্টাব্দের বৃহস্পতিবার এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। আর পরাজিত রাজা শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মুক্তিপণের স্বীকৃতি দিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্যে সুলতান কিছুদিন পেশোয়ারে কাটালেন। যখন সংবাদ এলো, গজনীর আশপাশের কুচক্রীরা চক্রান্ত করছে, তখন তিনি গজনী ফিরে গেলেন।

হিন্দুজাতির অপরিমেয় সম্পদ ও জীবন ধ্বংস করে রাজা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করল। এমনিতেই ছিল বয়স্ক-বুড়ো। পরাজয়ের যন্ত্রণা তাকে আরো কাহিল করে তুললো। রাজমহলে ফিরেই জরুরী দরবার তলব করল রাজা। দরবারে ঘোষণা করল নিজের ব্যর্থতা আর ক্ষমতা ত্যাগের কথা। রাজা বলল, আজ থেকে আমার ছেলে আনন্দ পাল রাজা। এ কথা বলেই রাজা সিংহাসন ত্যাগ করল।

রাজমহলেই সে সবাইকে বলল তার সাথে মহলের পার্শ্ববর্তী বাগানে যেতে। ছেলে আনন্দপাল তার সহগামী হল। যেতে যেতে রাজা ছেলের উদ্দেশ্যে বলল—

"তুমি যেভাবে ভাল মনে কর সেভাবেই রাজ্য চালাবে। এ ব্যাপারে আমার কোন পরামর্শ নেই। তবে ক'টি কথা মনে রেখো। কখনও গজনী আক্রমণে অগ্রসর হবে না। আমাদের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে কোন দিন পেরে উঠবে না। ওরা ঐশী শক্তির বলে যুদ্ধ করে। এই শক্তি আমাদের সৈন্যদের নেই। মাহমূদকে আড়াই লক্ষ দিনার মূল্যের স্বর্ণ দিয়ে দিয়ো, না হয় তোমার উপর সে আক্রমণ করবে। আর আক্রমণ করলে পরিণতি যা পেশোয়ারে দেখে এসেছো তাই হবে। এই চুক্তির ব্যত্যয় করো না।"

রাজা যখন রাজমহলের পার্শ্ববর্তী বাগানে উপনীত তখন সবাই এটা দেখে আশ্চর্য হলো যে ওখানে চিতা তৈরি করা হয়েছে। চিতায় কাঠের স্তূপ করে রাখা হয়েছে— হিন্দু মরদেহ পোড়াতে যেভাবে রাখা হয়। কিন্তু সেদিন রাজমহলের কারো মৃত্যুর কথা কেউ জানে না। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই বিস্ময়াভিভূত।

চিতায় রাজা পৌঁছার আগেই চিতায় তেল ঢেলে দেয়া হয় এবং চিতার পাশে জ্বলন্ত মশাল হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো। আরো ক'জন লোক কোন মরদেহ সৎকারে অপেক্ষা করছে।

কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই রাজা জয়পাল কাউকে কিছু না বলে চিতায় উঠে দাঁড়াল। মশালের দিকে হাত বাড়ালে লোকটি জ্বলন্ত মশাল রাজার হাতে তুলে দিল। রাজা তেলে ভেজানো কাঠের স্তূপে দাঁড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জয়পালের ছেলে দৌড়ে রাজাকে চিতা থেকে নামানোর জন্যে এগিয়ে গেল কিন্তু ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেলেছে রাজাকে। প্রজ্জ্বলিত আগুনের পাশে যাওয়া সম্ভব হলো না আনন্দ পালের।

কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়ার আগে রাজা ছেলে আনন্দ পালকে নির্দেশ দিয়েছিল, সে যাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ প্রস্তুতি না করে এবং সুলতান মাহমূদকে চুক্তির শর্তানুযায়ী আড়াই লাখ দিনার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সুলতানের সমবয়স্ক আনন্দ পাল উপদেশ উপেক্ষা করে বাবার জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়েই চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে পিতার পরাজয় ও অপমৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিল। বলল, "গজনীবাসীকে আমি এক দিনারও দেবো না এবং বাবার প্রতিশোধ আমি নেবই।"

এক রাতের স্বর্গবাস

মুলতান। উপমহাদেশের একমাত্র বসতি। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া, দখল-মুক্তির শত পট-পরিবর্তনেও যা অমুসলিমদের পদানত হয়নি। উপমহাদেশ থেকে মোগল শাসনের অবসান ঘটলেও মুলতান ছিল সব সময় ইংরেজ বেনিয়াদের কব্জামুক্ত। এগারো শতকে উপমহাদেশ জুড়ে হিন্দুদের দাপট থাকলেও মুলতান ছিল পৌত্তলিক পঙ্কিলতা মুক্ত। অথচ তখন মুলতানের আশপাশের সব রাজ্যে ছিল হিন্দু পৌত্তলিকদের জয়জয়কার।

১০০২ খৃস্টাব্দের ঘটনা। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর ভারতের পৌত্তলিকদের গড়া রাম-রাজ্যের ভিত্তিমূলে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত হানেন সুলতান মাহমূদ গজনবী। মাহমূদ গজনবীর আঘাতে কেঁপে উঠল পৌত্তলিকদের স্বর্গ-সিংহাসন।

ভারতের সবচেয়ে প্রতাপশালী হিন্দু রাজা জয়পালের তিনটি হামলা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন। চিরতরে স্তব্ধ করে দেন জয়পালের আগ্রাসী থাবা। জয়পালকে রণাঙ্গনে বন্দী করে ফেলেন। জয়পাল আর যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করে মোটা অংকের মুক্তিপণের চুক্তি করে মুক্ত হয়ে রাজধানীতে ফিরে ছেলে আনন্দ পালকে সিংহাসন সোপর্দ করে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়। আনন্দ পালকে জয়পাল মুক্তিপণ আদায় করতে এবং ভবিষ্যতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকতে ভবিষ্যদ্বাণী করে। মাহমূদ গজনবী পেশোয়ারের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে পেশোয়ার কেন্দ্রিক শাসন ক্ষমতা নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে নেন। যার ফলে মাহমূদের রাজধানী গজনী অনেকটা বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশংকা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

সুলতান মাহমূদ রাজা জয়পালকে বন্দী করার পর আড়াই লাখ স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণের শর্তে মুক্ত করে দেন। সেই সাথে পঞ্চাশটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি যুদ্ধ খরচ বাবদ দেয়ার অঙ্গীকার করে জয়পাল। জয়পাল রাজধানীতে ফিরে যথারীতি সুলতানের কাছে পঞ্চাশটি হাতি এবং আড়াই লাখ স্বর্ণমুদ্রা পাঠানোর কথা বলে চিতায় আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু আনন্দ পাল পিতার জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়েই সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আনন্দ পাল সেই সামবেশেই তার পিতার প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ ও যুদ্ধ জরিমানা দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

রাজা জয়পালের আত্মাহুতির ঘটনাটি ঘটে ১০০২ খৃস্টাব্দে। দেখতে দেখতে দু'বছর চলে গেল। জয়পালের প্রতিশ্রুত জরিমানা নিয়ে আসার পরিবর্তে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দারা খবর নিয়ে এল, আনন্দ পাল মুক্তিপণ পরিশোধের পরিবর্তে তার বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

... "এটা আমার কাছে আদৌ আশ্চর্যের কোন খবর নয়" বললেন সুলতান।" মানসিকভাবে এমনটির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। আমি এ জন্যই জয়পালের এলাকা কব্জা করেছি যে, জয়পালের চেলা ও পরামর্শদাতাদের কাছে গজনী এখন আসমানের তারার চেয়েও দূরবর্তী মনে হবে। আল্লাহর রহমত ও আমার জানবাজ যোদ্ধাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শুধু গজনী নয় ওদের আজীবন লালিত দুঃস্বপ্ন খানায়ে কা'বাকে আমি ওদের আগ্রাসন থেকে নিরাপদ করতে পেরেছি।"

"জয়পাল পরাজিত হয়ে কাপুরুষের মতো আত্মাহুতি দিয়েছে। এখন সিংহাসনে বসেছে ওর ছেলে, ওদের আমরা মোটেও পরোয়া করি না।" বলল এক সালার।

"দুশমনকে এতোটা খাটো করে দেখতে নেই বন্ধুরা! দুশমনদের ব্যাপারে সবকিছু গভীরভাবে ভাবতে হয়।" বললেন সুলতান। "রাজা জয়পালের মৃত্যুতে পৌত্তলিকতার পূজারীরা সব মরে যায়নি। ভারত থেকে বিলীন হয়ে যায়নি মূর্তিভক্তি। এটা দু'টি আদর্শের লড়াই। হিন্দুরাজা যুদ্ধ করতে না চাইলেও ওদের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা তাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। ওদের এলিট শ্রেণী এবং মাতাব্বররা কখনও শাসকদের নির্বিকার থাকতে দেবে না। দুশমনের শক্তিকে কখনও ছোট করে দেখবে না। বরং এখন তোমাদের ভাবতে হবে, এই জাতশত্রুদের পা কিভাবে চিরদিনের জন্যে ভেঙে দেয়া যায়।"

"আপনি যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে অভিমত হলো— এখনই আমাদের লাহোরের দিকে অগ্রাভিযান করা উচিত। তবে এর আগে হিন্দুস্তানে আমাদের একটি ঘাঁটি তৈরি করতে হবে, যাতে আমরা আরো অগ্রসর হতে পারি এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি।" বলল অপর এক সালার।

"ঘাঁটি আমাদের আছে।" বললেন সুলতান। "মুলতানকে আমরা ঘাঁটি মনে করতে পারি। মুলতানের শাসক আবুল ফাতাহ দাউদ বিন নসর একজন মুসলমান এবং আমাদের সুহৃদ।"

"জাঁহাপনা! দাউদ বিন নসর মুসলমান বটে, কিন্তু সে একজন কারামাতী, আপনি কারামাতীদের অতীত ইতিহাস জানেন, তাদের উপর ভরসা করা ঠিক নয়।" বলল উজীর।

"সে তো সুলতান সুবক্তগীন মরহুমের সাথে মৈত্রীচুক্তি করে প্রয়োজনের সময় একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। সে আমাদের ধোঁকা দিতে পারে না।" বললেন সুলতান।

"আলীজাহ! চিহ্নিত দুশমনের উপর নির্ভর করা যায় কিন্তু স্বজাতির গাদ্দারদের বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।" বলল উজির।

"আগামীকাল প্রত্যুষে একজন দূত পাঠিয়ে দিন। আমার বিশ্বাস, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় ভূমি থেকে আমরা আশানুরূপ সহযোগিতা পাব। দাউদ বিন নসর হিন্দু বেষ্টিত এলাকায় থাকে, সে হিন্দুদের মনোভাব আমাদের চেয়ে ভাল জানে। আমার মনে হয়, আমাদের অভিযানের সংবাদে সে খুশি হবে। তার সহযোগিতা আমাদের যেমন প্রয়োজন, তারও আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। আমার ইচ্ছা, সেখানে সামরিক দূত পাঠাব।"

"এ কাজে আসেম ওমর সবচেয়ে উপযুক্ত। বাহাদুর, উদ্যমী এবং চৌকস সেনা অফিসার। কথা বলার কৌশল জানে ভাল।"

"আসেম ওমর। কে যেন আমাকে বলেছিল, সে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভদ্রলোক।" বললেন সুলতান।

"যুদ্ধ-কৌশল ও সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কে আসেম ভাল জ্ঞান রাখে। সে একটা বিষয় যেমন বুঝে অপরকেও বোঝাতে পারে। রণাঙ্গনে শত্রুসেনাদের সামনেও সে স্বাভাবিক ভাবটা ধরে রাখতে পারে। এটা তার একটা বড় গুণ।" বলল সিপাহ্‌সালার।

"আপনি যদি মনে করেন সে-ই উপযুক্ত, তবে আমার দ্বিমত নেই। ওকে ডেকে পাঠান।" বললেন সুলতান। "আমি তাকে মৌখিক পয়গাম দেবো। কোন লিখিত পয়গাম দেবো না। কারণ, তাকে শত্রু এলাকা অতিক্রম করে যেতে হবে। লিখিত পয়গাম শত্রুদের হাতে চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।"

আসেম ওমর সুলতানের পয়গাম নিয়ে মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের দরবারে হাজির হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দাউদ বিন নসর-এর দরবারের জাঁকজমক দেখে আসেমের মনে হলো, দাউদ বিন নসর যেন সারা ভারতবর্ষের মহারাজা। সুলতান মাহমূদ এবং সুলতান সুবক্তগীনের রাজদরবারে আসেম ওমরের মতো কর্মকর্তা কেন সাধারণ সৈনিকেরাও সুলতানের পাশাপাশি বসে কথা বলতে পারে, কিন্তু দাউদ বিন নসরের দরবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুউচ্চ রাজ আসনে বসা দাউদ বিন নসর। আসনের নীচে সব কর্মকর্তা দাঁড়ানো।

অবস্থা দৃষ্টে আসেম নিজেকে দাউদ বিন নসরের সামনে অতি নগণ্য মনে করল। কী শান-শওকাত দাউদ বিন নসরের। তার দু'পাশে পরীর মত অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীরা পাখায় বাতাস করছে। মাথার উপরে বাহারী শামিয়ানা, রঙ-বেরঙের ঝাড়বাতি। নীচে সামনে অতি সাধারণ কয়েকটি আসনে মন্ত্রীপর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বসার ব্যবস্থা। ওরা দাউদ বিন নসরের সামনে পাথরের মূর্তির মতো স্থির।

"প্রজাদের ত্রাণকর্তা, মহামান্য রাজা! সুলতান মাহমূদ বিন সুবক্তগীনের দূত দরবারে উপস্থিত।" উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করল একজন ঘোষক।

আসেম ওমর এদিক সেদিক তাকাল। কিন্তু ঠাহর করতে পারল না, এ আওয়াজ কোত্থেকে এলো।

"গজনীর দূতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।" বলল দাউদ। "কি সংবাদ নিয়ে এলে?"

"আপনার জন্যে কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছি।" হতচকিত হয়ে বলল আসেম। নিজেকে সামলিয়ে বলল, "আগে আপনার খেদমতে সেগুলো পেশ করার অনুমতি চাচ্ছি।"

"সুলতান মাহমূদ কি তোমাদেরকে রাজ-দরবারের আদব শেখায়নি?" কিছুটা তাচ্ছিল্য মেশানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল দাউদ!

"আলীজাহ্! আমাদের ওখানে এমন দরবারের ব্যবস্থা নেই। সুলতানের অধিকাংশ মজলিস হয় কোন ময়দান কিংবা সাধারণ ঘরে। সেখানে আমরা সবাই একসাথে বসে কথা বলি।"

"এটা কোন যুদ্ধ ময়দান নয় সম্মানিত অতিথি! আমার এখানে কোন লোকের আমার অনুমতি ছাড়া কাশি দেয়াও বেয়াদবী।"

"সুলতান হয়তো আমাকে কোন ভুল জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে বলা হয়েছিল, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় স্মৃতিবাহী ভূমির সর্বশেষ শাসকের কাছে আমাকে পাঠানো হচ্ছে। আমি তো মনে করেছিলাম, শত শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে আসা আরব মুজাহিদের মতো মুহাম্মদ বিন কাসিমের স্মৃতিবাহী এ রাজ্যের শাসকও হবেন আরব যোদ্ধাদের মতো তাঁবুর অধিবাসী।"

"তোমাকে কে বলল, আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। তোমরা ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। আমরা এখানকার বিজয়ী শাসক। আমার দাদা আহমদ খান লোদী এই এলাকা জয় করে শাসন ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন এ অঞ্চলে কারামতী আদর্শের প্রবর্তক। তবুও আজকের জন্য তোমাকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাজ্য বলার অধিকার দেয়া হলো। আমরা মুসলমান। আমাদের ভিন্নধর্মী মনে করার কারণ নেই। কিন্তু আমাদের রাজদরবারের একটা নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে বৈকি।"

"এসব আদব রক্ষা না করা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ এ আদব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আমি কি উপঢৌকন পেশ করতে পারি?" বলল আসেম ওমর।

"হ্যাঁ, অনুমতি দেয়া হলো।"

"দরবারের বাইরে আসেম ওমরের চার সাথী দাঁড়ানো। উপঢৌকন ছিল তাদের কাছে। আসেম দ্রুত পায়ে দরবার থেকে বেরিয়ে তাদের গিয়ে বলল, তোমরা এগুলো নিয়ে চল। উপহার সামগ্রীর মধ্যে কিছু ছিল খুব দামী হিরা মণিমুক্তার অলংকার এবং গজনী এলাকার দামী আসবাব। এসবের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য একটি জিনিস ছিল রাজা জয়পালের তরবারী। এই তরবারীটি সর্বশেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের সময় সুলতানের কদমে উৎসর্গ করেছিল জয়পাল এবং বলেছিল, "দয়া করে আমাকে প্রাণভিক্ষা দিন। আর জীবনে কখনও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দুঃসাহস করব না।"

আসেম ওমর অগ্রসর হয়ে তরবারীটি দাউদ বিন নসরের পায়ের কাছে রেখে দিল।

"কোন পয়গাম আছে কি?"

"আমাকে কি একাকী কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে?"

দরবারীদের দিকে চোখ ফেরাল দাউদ। সবাই উঠে চলে গেল বাইরে। রয়ে গেল মাত্র দুটি যুবতী। এরা দাউদের কুরসীর পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে বাতাস করছিল। দাউদের ইশারায় তার সিংহাসনের কাছে রাখা একটি আসনে গিয়ে বসল আসেম।

"এই দরবারের নিয়ম-কানুন আমাকে রক্ষা করতেই হয়, না হয় শাসন কাজ চালানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।" কিছুটা নমনীয় কণ্ঠে বলল দাউদ। "এসব নিয়ম রক্ষা করা আমাদের একটা সমস্যা। আর আপনার জন্যে সমস্যা হয়েছে এসব আইন-কানুন সম্পর্কে জানা না থাকা। আচ্ছা, আপনি কি লিখিত কোন পয়গাম এনেছেন?"

"জ্বী-না। পথে শত্রুদের হাতে সংবাদ হস্তগত হওয়ার আশংকায় সুলতান কোন লিখিত পয়গাম দেননি। আমি সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার। যেহেতু পয়গামটিও সামরিক কৌশল বিষয়ক, এজন্য সুলতান আমাকে পাঠিয়েছেন মৌখিক পয়গাম দিয়ে, লিখিত পয়গাম দেননি।"

"আপনি জানেন, রাজা জয়পাল পর পর তিনবার আমাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবার সে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। প্রত্যেকবারই সে মোটা অংকের জরিমানা দিয়ে আর যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করেছে কিন্তু কোন অঙ্গীকারই সে রক্ষা করেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে হলো। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ তার স্থলাভিষিক্ত পুত্র আনন্দ পাল আজো পর্যন্ত আদায় করেনি। বরঞ্চ পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তার সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেয়ার খবর পেয়েছি আমরা।"

যে দুই যুবতী দাউদ বিন নসরের পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল এরা উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

"আপনি জানেন যে, আমাদের রাজধানীকে নিরাপদ করতে আমরা লুগমান ও পেশোয়ার কব্জা করে নিয়েছি। চুক্তি মতে পাঞ্জাব আমাদের শাসনাধীন। আনন্দ পাল ও পাটনার শাসক বিজে রায় আমাদের নিয়োজিত শাসক। সুলতানের অনুমোদন ছাড়া তাদের কোন নির্দেশ জারি করার অধিকার নেই— এরা আমাদের সুলতানের অধীনে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে মাত্র। কিন্তু উভয়েই রাজা জয়পালের কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে। তাই অন্যান্য হিন্দু রাজাদের নিয়ে এরা যাতে আবার সেনা অভিযান চালাতে না পারে সেজন্য সুলতান ইচ্ছা করছেন লাহোরে অগ্রাভিযান করবেন। সুলতানের উদ্দেশ্য দু'টি। শাসকদের পীড়ন থেকে সাধারণ নাগরিকদের মুক্তি দেয়া এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বহু ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম রাজ্য আজ মূর্তির বাগাড়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে আবার তাওহীদের তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করাই সুলতানের উদ্দেশ্য।"

"এ পরিকল্পনায় আমরা কি করতে পারি।" জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"যেহেতু আমি সৈনিক, এজন্য সামরিক ঢংয়ে কথা বলছি। আমরা বিজি রায় এবং আনন্দ পালের অবস্থানের মাঝামাঝি স্থানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করতে চাচ্ছি। আপনি যেহেতু উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছেন এজন্য আপনার এলাকাকে ঘাঁটি স্থাপনের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা বিবেচনা করছি। আমরা ঘাঁটি স্থাপন করেই মুসলমান অধিবাসীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করব। এতে আপনাদের যেমন ফায়দা হবে আমরাও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব। এটা হবে উভয়ের জন্যে উপকারী। আমরা এখানে এলে আপনার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না পৌত্তলিকরা। প্রয়োজনের সময় আমরা একে অন্যের সহযোগিতা করতে পারব। এ ব্যাপারে সুলতানের প্রয়োজন আপনার পক্ষ থেকে নিশ্চিত আশ্বাস। আপনার কাছ থেকে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা চাই যে, আমরা যখন পেশোয়ার থেকে মুলতানের দিকে অগ্রাভিযান করে আপনার এলাকা অতিক্রম করব তখন যদি বিজি রায় কিংবা আনন্দ পাল আমাদের পথ রোধ করে তবে পিছন থেকে অথবা এ পাশ থেকে আপনি ওদের উপর হামলা করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন। তাহলে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা কখন-ই আপনাকে একা ছেড়ে দেবো না। প্রয়োজনে আপনার জন্য আমরা আমৃত্যু লড়ে যাব।"

"সুলতান মাহমূদ অভিযান পরিচালনা করতে চাইলে তিনি তা করতে পারেন। আমরা তো আর তাকে বাধা দিতে পারব না। কিন্তু দুই রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো সৈন্য আমাদের নেই।" বলল দাউদ বিন নসর।

"আপনার জবাবে আশ্বস্ত হতে পারলাম না। আপনার কাছ থেকে এ জবাব নিয়ে গেলে সুলতান নিশ্চিত হতে পারবেন না। সেনারা তো আপনার মতো আমার মতো সেনাপতিদের কমান্ডে অগ্রাভিযান চালাবে, কাজেই সমূহ বিপদ আশংকার বিষয়টি আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আমি আসার সময় এ অঞ্চলের পথ ঘাট দেখে এসেছি। এলাকাটি আমাদের জন্য নিরাপদ হলেও পাহাড়ের চূড়া থেকে তীরন্দাজদের টার্গেট হওয়ার আশংকা প্রবল। কাজেই সেনাবাহিনীর জন্যে পথটি মোটেও সুগম নয়। আপনার কাজ হবে আগে থেকে আপনি আপনার তীরন্দাজ সেনা ইউনিটকে ওই এলাকায় পাহারায় নিয়োগ করবেন, যাতে আমাদের সেনারা নিরাপদে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলো অতিক্রম করতে পারে।"

"এ কাজ করতে হলে আমাদের তীরন্দাজদেরকে আমাদের প্রশাসনিক এলাকার বাইরে হিন্দুদের এলাকায় পাঠাতে হবে।" বলল দাউদ বিন নসর।

"লুগমান ও গজনী কখনও জয়পালের এলাকা ছিল না। অবশ্য লুগমান ও হিন্দ আমাদের এলাকাও নয়। কিন্তু জয়পাল আমাদের এলাকাতে সেনা অভিযান করেছে, এর জবাবে আমরা তাদের এলাকায় অভিযান চালাচ্ছি। আপনি কি একথা ভুলে গেছেন, যে এলাকা এরা শাসন করছে তা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল! আমরা আমাদের ভূমি তাদের দখলমুক্ত করতে চাচ্ছি।"

গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল দাউদ। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "আসলে আপনার সুলতানের চাহিদার জবাব তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া মুশকিল। এজন্যে আমার ভাবতে হবে। উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। আপনি এখানে চারদিন অপেক্ষা করুন। শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখুন, আমি আমার উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে নেই। আজ থেকে আপনি রাজকীয় অতিথি। আজ রাতে আপনার সম্মানে ভোজসভা হবে। সেই সভায় আপনার সম্মানে বড় ধরনের আপ্যায়ন ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে।"

সত্যিই নৈশভোজের আয়োজন ছিল রাজকীয়। অনুষ্ঠানের বিলাসী আয়োজন দেখে আসেম ওমরের চোখ ছানাবড়া।

প্রাসাদের বাগানে আয়োজন করা হলো নৈশভোজের। রঙ-বেরঙের ঝাড়বাতি, জরিদার শামিয়ানা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মনমাতানো প্যান্ডেল।

ঝাড়বাতিগুলো দেখে আসেমের কাছে মনে হলো, সোনা ও রুপার তৈরি কতগুলো জ্বলন্ত তারা। বহু বর্ণের ফানুস এবং জরিদার কারুকার্যময় শামিয়ানার সাথে ঝুলানো ঝাড়বাতিগুলোর নীচে অবস্থানরত মানুষগুলোর গায়ের রং যেমনই হোক না কেন সবাইকে ফর্সা আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী মনে হচ্ছিল।

অভাবিত এই মজলিসের বর্ণাঢ্য আয়োজনে আসেম এমনই প্রভাবিত হয়ে পড়ল যে, সে ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গেল। মনে হতে লাগল, সে কোন স্বপ্নালোকে বিচরণ করছে। তবলার ও ঢোলের হাল্কা বাজনার তালে মঞ্চে একটি নর্তকী নাচের নানা মুদ্রা উপস্থাপন করছে। যেন একটি নাগিনী ফনা তুলে খেলছে শিকার নিয়ে। নর্তকী ষোড়শী যুবতী। দুই বাহু সম্পূর্ণ খোলা, পরনের কাপড় অতি সূক্ষ্ম। নাভীর নীচে কতগুলো রেশমী সূতোর পাকানো ঝালর দোল খাচ্ছে নাচের তালে তালে। এমন দোলনীতে তার উরুসন্ধি বারবার প্রকাশ পাচ্ছে। বুকের স্বল্পবসন তরুণীর যৌবনকে ফুটন্ত গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত করছে। তরুণীটি হয়তো এমনিতেই সুন্দরী, কিন্তু আলোর বর্ণাঢ্য রঙ-এর প্রতিবিম্ব ওকে এতোই মায়াবী ও মোহনীয় করে তুলেছে যে, ওর রেশমী চুলের বাহার আর রুপোর মতো দাঁতের মুক্তা ঝরানো হাসিতে অনুষ্ঠানের সকল পুরুষের দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ হতে বাধ্য।

নর্তকীটি বাজনার উচ্চাঙ্গ তালে নাচতে নাচতে আসর কাঁপিয়ে হারিয়ে গেল। যেন কোন জলপরী জলতরঙ্গের মধ্যে খেলা করে হঠাৎ জলরাশির মাঝে তলিয়ে গেল। বাজনা বদলে গেল। নতুন করে শুরু হল অন্য সুর। এবারের বাজনার তাল লয় ভিন্ন, আরো উগ্র, আরো তীব্র। ঠিক এ সময়ে জলরাশির ভেতর থেকে যেন হঠাৎ করে দৃশ্যমান হলো আরেক নর্তকী। যেন কোন জলপরী পানির তলা থেকে ভেসে উঠেছে। এটি আগের তরুণীর চেয়ে আরো স্বল্পবসনা, আরো বেশি উদ্দীপক। এর নাচ ও তাল আরো মোহনীয়।

আসেম বিন ওমর দাউদ বিন নসর থেকে দূরে। শত শত মেহমানের সাথে উপবিষ্ট। সবাই জানে, আজকের এ আয়োজন সুলতান মাহমূদের বিশেষ দূতের সম্মানে। কিন্তু কে কোথায় আর মেহমানই বা কে সে খবর নেয়ার খেয়াল নেই কারো। সবার দৃষ্টি মঞ্চের নৃত্যরত কিশোরীদের দিকে। ওদের নাচ আর যন্ত্রীদের বাজনা সমবেত সবাইকে আবেগের শৃঙ্গে পৌঁছে দিল। যুবতীদের নাচের মুদ্রা আর শারীরিক কসরত থেকে চোখ ফেরানো কারো পক্ষেই সম্ভব হলো না। আসেম ওমর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নর্তকীর প্রতি। এতো সুন্দর, এতো আকর্ষণীয় হতে পারে নারী, সে তা কখনও ভাবতেই পারেনি। নর্তকীর নিক্কনের ঝংকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল আসেম তার খবর কে রাখে।

এর আগে শরীরের কাঁপুনি ঝাঁকুনি আসেম দেখেনি তা নয়, তবে সেই কাঁপুনি ঝাঁকুনি নর্তকীর নয়। যুদ্ধ ময়দানে আহত মৃত্যু পথযাত্রী সৈনিকদের, যুদ্ধরত সিপাহীদের— যারা আহত হয়ে মাটিতে-মরুতে কিংবা পাহাড়ী পাথুরে জমিনে তড়পাতে তড়পাতে নিস্তেজ হয়ে চিরদিনের জন্যে স্থির হয়ে গেছে। গত বিশ বাইশ বছর যাবত আসেম দেখেছে যুদ্ধাহত সৈনিকের মৃত্যু যন্ত্রণার ছটফটানি। সেখানে দোস্ত-দুশমনের একই রঙ, একই কাতর ধ্বনি।

মাটি আর খুন এই দু'য়ের সাথে ছিল আসেমের মিতালী। রণাঙ্গনের ভয়াবহ দৃশ্য আসেমের প্রিয়। মরা এবং মারা এই ছিল আসেমের নেশা, ভালবাসা। আসেম তার সুলতানের চরিত্রেও এই রঙ-ই দেখে আসছে। সুলতানের দরবারে আসেম ধুলোবালির যে আস্তরণ দেখে, সেই ধুলো মাটির চরিত্র-আদর্শ সে সুলতানের মাঝেও দেখেছে। সুলতানের দরবারে এ ধরনের রঙিন ফানুস কল্পনা করাও মুশকিল।

দাউদ বিন নসরের দরবারে আসেম নৃত্যরত নর্তকীদের যে নাচের মুদ্রা দেখেছে, উদ্ভিন্ন যৌবনা উর্বষী তরুণীদের স্নায়ু উদ্দীপক যে অঙ্গভঙ্গি আসেম প্রত্যক্ষ করল, তাতে তার মধ্য থেকে যোদ্ধার আদর্শ বিলীন হয়ে মনের ভেতর ভোগবাদী লিপ্সা জেগে উঠেছে। ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আসেমের ঘুমিয়ে থাকা কাম প্রবৃত্তি। যুদ্ধ ময়দানের বীভৎস রক্তাক্ত রূপের প্রতি তার মনে জন্ম নিতে লাগল প্রচণ্ড ঘৃণা। যুদ্ধাহত সৈনিকের রক্ত-রাঙা চেহারা আর তপ্ত খুনের গন্ধ তার মনের মধ্যে তীব্র বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করল, তদস্থলে জন্ম নিল ভোগের উন্মাদনা। দাউদ বিন নসরের এই কামোদ্দীপক রগরগে আয়োজন আসেমের ভেতরকার যোদ্ধাকে অল্প সময়ের মধ্যে আমূল বদলে দিল। সে অনুভব করল যুদ্ধের ক্লান্তি, ক্ষুধা-পিপাসার যাতনা। তার দু'পা এখন রণাঙ্গনের অশ্বারোহণে অক্ষম। তার তাবৎ সাহস, শক্তি ও প্রশিক্ষণ বিলীন হয়ে সেখানে উঁকি দিল ভীরুতা এবং যুদ্ধাবেগের স্থান দখল করল যৌবনের উন্মাদনা।

তরুণী দু'টি নৃত্য প্রদর্শন করে চলে যাওয়ার পর এলো চৌদ্দ পনেরো বছরের এক বালক। বালক হলেও তার চেহারা তরুণীদের চেয়ে আরো বেশি মোহনীয়। বালকটি আরো বেশি যৌন উদ্দীপক নৃত্য প্রদর্শন করতে শুরু করল। বালকের সাথে সমান তালে সহযোগী হলো অন্য দু'টি তরুণী। এরা প্রত্যেকেই স্বল্পবসনা। এদের যৌথ নৃত্য উপস্থাপনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল আসেম। তার দৃষ্টি ওদিকেই নিবদ্ধ। আশপাশের কোন খেয়াল নেই, কে কোথায় কি করছে।

ঠিক এ মুহূর্তে তার কানের কাছে রিনঝিন শব্দ। উপরের দিকে চোখ তুলল আসেম। দেখল, নর্তকীদের মতোই এক উর্বষী যুবতী শ্বেত শুভ্র রুপালী তশতরী হাতে তার সামনে দণ্ডায়মান। হাতে একটি পানপাত্র। তরুণীর ঠোঁটে ঈষৎ মুচকী হাসি, এমন মোহনীয় হাসি কখনও প্রত্যক্ষ করেনি আসেম। তরুণীর সলজ্জ গ্রহণের আবেদন আর আপ্যায়নের মাদকীয় ভঙ্গি আসেমকে মর্তে নামিয়ে দিল।

আসেম তরুণীকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "এটা হয়তো শরাব। আমি শরাব পান করি না। আমি মুসলমান।"

"শরাব নয় শরবত।" আসেমের সামনের টেবিলে তশতরী রেখে শৈল্পিক ভঙ্গিতে পানপাত্র সুরাহী থেকে ভরে দিল তরুণী।

একটা শংকা মনে চেপে রেখেই পানপাত্র হাতে নিল আসেম। চুমুক দিল পান পাত্রে। মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করল এক অজানা ভাল লাগার অনুভূতি। আসেম ওমর অনুভব করল এক অভাবিত স্বাদ-তৃপ্তি। সে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল তরুণীর দিকে— আহ্! কি স্বাদ! এ কি শরবত না জান্নাতের নেয়ামত! কিন্তু জিজ্ঞেস করার অবকাশ হলো না। তরুণীর চোখে চোখ পড়তেই ওর মাদকীয় হাসিতে হারিয়ে গেল আসেমের কণ্ঠ। আরো গভীর আবেশে তলিয়ে গেল আসেম। পুনরায় সোরাহী থেকে পানপাত্র পূর্ণ করে দিল তরুণী। অব্যক্ত ভঙ্গিতে নিবেদন করল, পান করুন সম্মানিত মেহমান! আপনাকে পান করিয়ে মাতাল করাই আমার কাজ। ভেসে চলুন স্বপ্নময় আগুনের দিকে। ইত্যবসরে আসেমের সামনে হাজির হল আরো বড় ধরনের একটি তশতরী নিয়ে অনিন্দ্য সুন্দর বালক। এ তশতরিতে ভুনা করা পাখি। তশতরী থেকে ভাপ উঠছে। মন ভুলানো স্বাদের গন্ধ। সে গন্ধে যে কোন ভোজনবিমুখ মানুষও আহারে প্রলুব্ধ হতে বাধ্য।

আশপাশে একবার চোখ বুলাল আসেম। সমবেত প্রত্যেক মেহমানের সামনে এ ধরনের পাখি ভুনার করা পাত্র রাখা হচ্ছে।

তরুণী ও বালক চলে গেছে। এবার সাগ্রহে আসেম তশতরী থেকে তুলে নিল একটি ভুনা পাখি। এক লোকমা মুখে পুরে চুমুক দিল পেয়ালায়। পাখির স্বাদ আর শরবতের তৃপ্তি বিস্মৃত করে দিল আপন কর্তব্য। একের পর এক পাখি আর পানপাত্র ভরে গলাধঃকরণ করতে থাকল আসেম। তৃপ্তির সুখে ভাসতে লাগল অন্য এক আসেম।

এই ফাঁকে বার কয়েক তার কাছে এলো সেই তরুণী ও বালক। খালিপাত্র তুলে নিল আর ভর্তি পাত্র রেখে দিল। সেদিকে খেয়াল ছিল না আসেমের। কতগুলো পাখি আর কত গ্লাস পানীয় পেটে চালান করেছে সে আন্দাজও ছিল না

তার। চোখ দুটো গোল হয়ে এলো। মাথা কিছুটা ভারী ভারী মনে হল। খাবার পরিবেশনকারিণী তরুণী তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল একটি কক্ষে। অস্বাভাবিক সুন্দর পরিপাটি সাজানো কক্ষ। বিশাল এক পালঙ্ক। তুলতুলে তোষকের উপর রেশমী গালিচা। আসেম ঠিক মতো পা ফেলতে পারছিল না। কক্ষের দরজায় গিয়ে অনুভব করল, সে হয়তো ভুল করে শাহী কক্ষে ঢুকে পড়েছে। এমন বিলাসী বিছানা সে কল্পনা করতে পারছে না। কিন্তু তরুণী তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিল পালঙ্কের উপর। মাথা থেকে পাগড়ী খুলে রেখে দিল পাশের টেবিলে।

"আহ্! যা পান করালে সেটাতো শরবত নয় শরাব!" জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল সে তরুণীর দিকে।

"আমরাও মুসলমান। এখানে ওই ধরনের শরাব পান করা হয় না, কাফের বেঈমানরা যেসব শরাব পান করে। আমরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। আমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি।" বলল তরুণী।

আবারো পানপাত্র থেকে গ্লাস ভরে মুখের কাছে ধরল তরুণী। তরুণীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারল না আসেম। পান শেষে যখন গ্লাস রেখে দিল তখন তরুণী আসেমের গণ্ডদ্বয় হাতে নিয়ে আদুরে স্পর্শে চোখে চোখ রাখল।

"এটাই জীবন জনাব! এটাই ইসলাম! এতে কোন সাজাও নেই কোন দেনাও নেই।" মাদকতা মেশানো ভঙ্গিতে বলল তরুণী।

আসেমের সামনে অর্ধনগ্ন তরুণী। সে তার ভুবন ভুলানো মোহিনী হাসি আর শরীরের মিষ্টি গন্ধে আপ্লুত। আরো ঘনিষ্ঠ হলো তরুণী। আসেম তরুণীর উষ্ণতায় ভুলে গেল নিজের অবস্থান, কর্তব্য ও আত্মপরিচয়। তার মাথা গুলিয়ে গেল কাম তৃষ্ণায়। তার ঈমানের প্রদীপ নিভে গেল মদ, নারীর দমকা ঝাপটায়। ভেসে চলল আসেম আদিমতার নেশায়, জীবনের রঙীন ভেলায়।

সন্ধ্যায় যে সময়টায় মেহমানরা ভোজসভায় আসতে শুরু করে তখন রাজপ্রাসাদে দাউদকে বাতাসকারিণী দুই তরুণীর একজন নির্জন কক্ষে এক প্রৌঢ়কে বলছিল— "মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিশেষ দূত দাউদ বিন নসরকে কি পয়গাম দিয়েছে। সেই তরুণীই নৃত্য চলার সময় আসেম বিন ওমরকে আপ্যায়নে সহযোগিতা করছিল আর প্রৌঢ় লোকটি দাউদের পাশে বসে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিল, আপ্যায়নও গ্রহণ করছিল।

সেই লোকটি দাউদকে বলল, "সুলতান মাহমূদের পয়গামে আপনার ভয় পাওয়ার কি আছে! রাজা আনন্দ পাল এবং বিজি রায় মহাশয়দ্বয় আপনার রাজ্যের

নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের প্রতিনিধি হিসেবেই আপনার এখানে রয়েছি আমি। যে কোন সমস্যায় আপনার জন্যে রাজাদের ভরপুর সহযোগিতা নিতে পারব আমি। সুলতান মাহমূদ একজন সাম্রাজ্যবাদী। রাজ্য বিস্তারে হিন্দু মুসলমান তার কাছে সমান। আপনার লাভ ক্ষতিতে তার কিছু যায় আসে না। সে তার নিজের স্বার্থে আপনাকে ব্যবহার করতে চায় মাত্র।"

"আপনি কি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না?" প্রৌঢ়কে প্রশ্ন করল দাউদ। "আপনাদের সাথে যে মৈত্রীর বন্ধন যে কোন মূল্যে তা অক্ষুণ্ন রাখতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপনি কি খেয়াল করেননি, ইসলামের আত্মশক্তিকে আমি কিভাবে বিদায় করেছি আমার প্রশাসন থেকে? আপনি খেয়াল করেননি, মুসলমানদের হৃদয় থেকে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়াদি আমি কত কৌশলে নির্মূল করছি? আপনাকে কে ধারণা দিল যে, আমি সুলতান মাহমূদের প্রত্যাশা পূরণ করব? দেখুন না ওর জন্যে কি ব্যবস্থা আমি করেছি! যে মেয়েটিকে আমি দূতের সেবায় নিয়োগ করেছি, যে কোন কঠিন আদর্শের অধিকারী পরহেযগার মু'মেনকেও সে তার যাদুকরী কৌশলে ঈমানহারা করতে সক্ষম। তাকে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দিয়ে সেভাবেই তৈরি করেছি। দেখবেন সে দূত বেচারাকে ভেড়া বানিয়ে ছাড়বে।"

"এটাই যথেষ্ট নয় জাঁহাপনা! এই ব্যক্তি যেমন সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা, আমিও সামরিক বাহিনীর অফিসার। আমিও আপনাকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই পরামর্শ দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আপনি সুলতান মাহমূদকে মোটেও পছন্দ করেন না। আপনি এটাও আশা করেন যে, সুলতান মাহমূদের মতো আপদকে দূরে রেখেই যাতে ঠাণ্ডা করে দেয়া যায়। এজন্য আপনি এই দূতকে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি দূতকে বলে দিন, সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযানে তার সৈন্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন আপনি। এ আশ্বাসের ভিত্তিতে ওরা যখন এগিয়ে আসবে, তখন আনন্দ পালকে বলে তার সৈন্যদের আমি সুবিধা মতো জায়গায় বসিয়ে রাখবো। ধারণাতীতভাবে আনন্দ পালের সৈন্যরা 'খেল খতম' করে দেবে।"

"দূতের ব্রেন ওয়াশের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দেখেননি, শরবত মনে করে কতো গ্লাস খাঁটি মদ গিলেছে বেটা। এরপর যেটুকু হুঁশ-জ্ঞান থাকবে সেটুকুও দূর হয়ে যাবে মেয়েটির কৌশলী পরিচর্যায়।" বলল দাউদ।

আসেম ওমরের চার দেহরক্ষী দাউদ বিন নসরের দেহরক্ষীদের সাথে আহার করল। ওরা ঘুর্ণাক্ষরেও জানল না, তাদের দূত দাউদ বিন নসরের বালাখানায় এক রাতের স্বর্গবাসে মত্ত।

যে আসেমের ঘুম ভাঙতো অতি প্রত্যুষে, সেই আসেম সূর্যোদয়ের সময়ও গভীর ঘুমে তলিয়ে রইল। বেলা অনেক উপরে উঠার পর চোখ মেলল আসেম। চোখ মেলেই ঘাবড়ে গেল সে। গত রাতের ঘোর কেটে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠল তার কাছে। ঠিক এ সময়ে ঘরে প্রবেশ করল সেই তরুণী। তার মুখে স্মিত হাসি আর হাতে তশতরী।

আসেম তাকে লক্ষ্য করে বলল, "গত রাতে তুমি আমাকে গুনাহগার করে দিলে। এখানে আমি বিশেষ এক কাজে এসেছিলাম।" কিছুটা আতংকিত কণ্ঠ আসেমের।

তরুণী তশতরী টেবিলের উপর রেখে দুধের একটি গ্লাস আসেমের হাতে ধরিয়ে দিল কিন্তু আসেম টেবিলে রেখে দিল গ্লাস। বলল, "গত রাতে কি ঘটেছিল তা না বলা পর্যন্ত তোমার হাতের কিছুই আমি স্পর্শ করব না।"

"তুমি জাহান্নাম থেকে জান্নাতে এসেছো! বুঝলে? এটার নাম জীবন, এটাই জিন্দেগী। বেঁচে থাকার সার্থকতা এখানেই।" বলল তরুণী।

এমন সময় এক শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুধারী দীর্ঘ জুব্বা পরিহিত সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ প্রবেশ করল সে কক্ষে। স্বগতোক্তি করতে লাগল— "হতভাগ্য তোমাদের বাদশাহ! যাকে তোমরা সুলতান বলে থাকো। তার প্ররোচনায় জীবনের এই স্বাদ এই প্রাপ্তিকে তোমরা পাপ বলছো। অথচ জীবনে এতটুকু ভোগ করার অধিকার তোমাদের প্রাপ্য। কিন্তু সে তোমাদের জীবনকে বিষাদময় করে দিয়েছে। জীবনের স্বাদকে তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অগণিত প্রাণের বিনিময়ে নিজের স্বর্গবাসকে নিশ্চিত করতে চায় সে। এজন্য তোমাদের দিয়ে সে যুদ্ধ করায়, রক্তের হোলি খেলে। আর নিজে থাকে নিরাপদে। কে তোমাদের বলেছে যে, ইসলামে আরাম-আয়েশ, এতটুকু বিনোদন হারাম?" বৃদ্ধের বলার ঢঙ এবং ভাষার কারুকাজ এতো নিপুণ এবং কণ্ঠ এতো মধুর যে, আসেম ওমর রাতের তরুণীর মতো বুড়োর কাছে নিজেকে কখন সঁপে দিল টেরই পেল না। সে এতোটাই বুড়োর কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ল যে, বুড়োর প্রতিটি কথাকে তার মনে হচ্ছিল জীবনের প্রতিচ্ছবি, সত্য ও বাস্তবতার প্রতীক।

আসলে এটা মানুষের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা। পাপ যখন পূর্ণ অবয়বে মানুষকে গ্রাস করে ফেলে তখন তার সাধারণ বোধটুকুও লোপ পেয়ে বসে, পাপকাজকেই তখন আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে। পাপ কাজের পক্ষে তখন যুক্তি খুঁজে ফিরে মানুষের মন। অপরাধকে যৌক্তিকতার লেবেল এঁটে আরো অপরাধের গভীরে তলিয়ে যেতে যুক্তি সংগ্রহ করে মানুষ। আসেম ওমরের মন থেকেও ইসলামের

বিধি-নিষেধ লোপ পেয়ে গেল। ভোগবাদিতায় গা ভাসানোর জন্যে তার পক্ষে দরকার ছিল কিছু যৌক্তিক সাপোর্ট। কিন্তু তা আসেমের মাথায় ছিল না। এই পণ্ডিত লোকটি সেই হারামকে হালাল করণের যৌক্তিক ভিত্তিগুলোই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছিল। আসেমের এ মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল ভোগবাদের পক্ষে এ ধরনের যৌক্তিক বিশ্লেষণ। বুড়ো তাই পরিবেশন করছিল। আরো নিবিড়ভাবে গ্রহণ করতে শুরু করল আসেম বুড়োর যুক্তিগুলো।

আসেম ওমর ছিল সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেরা কমান্ডার। তাকে বিপথগামী করতে পারলে সহজেই সুলতান বাহিনীর বড় একটি অংশকে যুদ্ধবিমুখ করা সম্ভব। সে লক্ষ্যকেই সামনে রেখে হিন্দু রাজা আনন্দ পাল ও বিজি রায়ের নিয়োজিত প্রতিনিধির সাথে পরামর্শ করেছিল দাউদ।

আসেম ওমর কুচক্রীদের ফাঁদে ফেঁসে গেল। তার কাছে দাউদ পয়গাম পাঠাল, আজ রাজকীয় মেহমান হিসেবে গজনীর বিশেষ দূতকে শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলোতে নিয়ে যাওয়া হবে। আসেমের জন্যে রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। যে গাড়িতে স্বয়ং দাউদ চড়ে থাকে। গাড়িটি চারটি বিশেষ ঘোড়া টেনে নেবে। সাথে দেয়া হলো দাউদের বিশেষ নিরাপত্তা রক্ষীদের ক'জন। বিশেষ পোশাকে সজ্জিত এরা। আসেমকে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম হলো সমুদ্রতীরের মনোরম দর্শনীয় জায়গায়।

রাজকীয় বিলাসী ব্যবস্থাপনায় আসেম ভুলে গেল নিজের কর্তব্য কাজ। সে এখন নিজেকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করতে লাগল। তার মধ্যে জন্ম নিল রাজা রাজা মনোভাব। সাথীদের খোঁজ-খবর নেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করল না সে। তারা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, সে খবর নেয়ার সুযোগ তার নেই। ওদেরকেও রাজপ্রাসাদ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো, আজ তাদের দূতের ভ্রমণের প্রোগ্রাম করা হয়েছে। ইচ্ছে করলে তারাও এই সুযোগে শহর ঘুরে দেখতে পারে। সুযোগ পেয়ে তারাও শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

একজন ভাবগম্ভীর, সুদর্শন বুযুর্গ লোকই মনে হচ্ছিল তাকে দেখে। পরিধেয় পোশাক, মুখের দাড়ি আর কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, লোকটি বড় ধরনের আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি। একটি উঁচু দেয়াল ঘেরা বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে থেমে গেল, যখন তার চোখে পড়ল চারজন সৈনিক ধরনের লোকের আগমন। ওদের পোশাক দেখেই তিনি আন্দাজ করেছিলেন, এরা মুসলমান সৈনিক এবং এখানে নবাগত। এদের মুলতানের অধিবাসী মনে হলো না, ভারতীয় মনে করাও

কঠিন। বুযুর্গ লোকটি চারজনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। মুচকি হেসে বলল, "আপনারা গজনীর অধিবাসী?"

তারা চারজন থেমে গেল এবং হেসে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল।

"আপনারা কি একটু সময়ের জন্যে আমার ঘরে আসবেন? আমাকে আপনাদের মেহমানদারী করার সুযোগ দিয়ে ধন্য করবেন?" ফারসী ভাষায় বললেন তিনি।

"পরবাসে নিজের মাতৃভাষার আহ্বানে কালবিলম্ব না করে সবাই তার অনুগামী হল। আপ্যায়নের ফাঁকে অতিথিরা জানাল তারা কমান্ডার আসেম ওমরের নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে গজনী থেকে এখানে এসেছে। কমান্ডার আসেম ওমর সুলতানের বিশেষ বার্তা নিয়ে দাউদ বিন নসরের এখানে এসেছেন।

"আসেম ওমর এ মুহূর্তে কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন বুযুর্গ।

"আমরা তাকে শাহী গাড়িতে সওয়ার হয়ে ভ্রমণে বের হতে দেখেছি।" জবাবে বলল এক নিরাপত্তারক্ষী।

"আমি আসেম ওমরের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু জানতে পারলাম, সে এখন তার নিরাপত্তারক্ষীদের সাথেও সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করছে না।" বলল লোকটি।

"কেন? কি হয়েছে?" বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চাইল এক নিরাপত্তারক্ষী। "এমন কিছু ঘটেনি তো যে তাকে বন্দী করে ফেলা হয়েছে? আর বন্দিশালায় না খেয়ে কষ্ট যাতনায় মৃত্যুবরণ করতে হবে তাকে!"

"সে বন্দিদশা অনেক ভাল যে বন্দিদশায় মানুষ কষ্ট দুর্ভোগ পোহায়, কষ্ট যাতনায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যে জিঞ্জিরে আপনাদের কমান্ডারকে বাঁধা হয়েছে, তা খুব জটিল। এই জিঞ্জিরে মানুষ কষ্ট পায় না বটে কিন্তু তার ভেতরের বিবেক বোধ, ঈমানী শক্তি মরে যায়, সৈনিকের মধ্যে জন্ম নেয় ভীরুতা। এটা এমন এক জিঞ্জির যা হলো নারীর রেশমী চুল আর ষোড়শী যুবতীদের দেহবল্লরীর মাদকতার বাঁধন। যে কোন সৈনিক এ ধরনের বন্দিদশার শিকার হলে সে সৈনিকের আর যুদ্ধ করার মুরোদ থাকে না, সে হয়ে পড়ে নারীর আঁচলে বাঁধা পোষা জন্তু। আচ্ছা, গতরাতের নৈশভোজে কি আপনারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন?"

"না। আমাদেরকে ভিন্নভাবে খাবার দেয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আমাদের নেয়া হয়নি।" বলল এক নিরাপত্তাকর্মী।

"ওকে গতরাতে শরাব পান করানো হয়েছে এবং গতরাত সে এমন এক যাদুকন্যার বাহুডোরে ছিল যাকে এক কথায় আমরা মায়াবিনী বলে জানি।" বললেন বুযুর্গ।

"আপনিও কি সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন?"

"না, আমি ওখানে যাইনি। দাউদ শাহীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার কান ও চোখ সময় সময় শাহী মহলের দিকে তাক করা থাকে। ভেতরের সব খবর আমার জানা। দাউদের কাছে আসেম কি পয়গাম নিয়ে এসেছে সে খবরও আছে আমার কাছে।"

"তাহলে ভয়ের ব্যাপারটি কি?"

"আশংকার ব্যাপার হলো, আসেম সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে এসেছে বটে, কিন্তু সে দাউদ ও হিন্দুরাজাদের কাছে আত্মবিক্রি করে তাদের চর হিসেবে গজনী ফিরে যাবে। আসেম সুলতানের জন্যে এক কঠিন প্রতারণার ফাঁদে পরিণত হবে। আমি ভাবছিলাম, কি করে আসেম অথবা আপনাদের সাথে সাক্ষাত করি। কোন সুযোগই করতে পারছিলাম না। সৎ উদ্দেশ্য থাকলে যে কোন কাজে আল্লাহ্ সাহায্য করেন। আপনারা শহর দেখতে বের হলেন, আর এই সুযোগে আল্লাহ্ আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করালেন। আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা এখন দূর হয়ে গেল।"

"আমাদেরকে বলা হয়েছে, মুলতান একটি ইসলামী রাজ্য।" বলল একজন নিরাপত্তারক্ষী। অপর একজন বলল, "মুসলমান হওয়ার কারণে সুলতান সুবক্তগীনের সময় থেকেই দাউদ বিন নসর আমাদের সুহৃদ।"

"আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এই ভেবে যে, সবকিছু জানা থাকার পরও সুলতান মাহমূদ কি করে আপনাদের এখানে পাঠালেন এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখলেন!

তো আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন। যাতে আপনারাও আপনাদের কমান্ডারের মতো ওদের জালে আটকা না পড়েন।"

"... মুলতানের শাসন ক্ষমতা কেরামতীদের হাতে। এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে বটে কিন্তু তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। যেমন— এরা আখেরাত বিশ্বাস করে না। এরা বিশ্বাস করে, বেহেশত দোযখ দুনিয়াতেই। আখেরাতে শাস্তি-পুরস্কার বলতে কিছু নেই। এরা ইসলামের হারাম

হালালকে অস্বীকার করে। ব্যভিচার ও মদপানে উৎসাহিত করে। তারা মনে করে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিই করেছেন ভোগ-বিলাসের জন্যে এবং ইসলামের হারাম হালালের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবান্তর। এরপরও মুসলমানদের ধোঁকা দিতে এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। প্রকৃতপক্ষে এরা হিন্দু, খৃস্টান ও ইহুদীদের চেয়েও জঘন্য, ছদ্মবেশী ভয়ংকর দুশমন। আব্দুল্লাহ এবং মাইমুন নামের দু' আরব এ মতবাদের উদ্ভাবক। কোন আরব দেশ থেকে তৃতীয় হিজরী শতকে এদের উত্থান শুরু। তবে এই মতবাদের মূল জনক এক খৃস্টান যাজক। ইহুদীদের সমর্থন ও সহযোগিতাও রয়েছে এদের পিছনে। কারো মতে ইরানের এক বড় অংশ এই কেরামতী মতবাদের অনুসারী।

এ থেকেই বোঝা যায়, এই বাতিল ফেরকা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলাম যখন রোম সাগর পেরিয়ে অর্ধেক পৃথিবী তৌহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলে, তখন খৃস্টান ও ইহুদী পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের টনক নড়ে। এরা বুঝেছে, কোন সত্য ধর্মকে তার অনুসারীদের হত্যা করে নিঃশেষ করা যায় না। তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছে, সত্য ধর্মের অনুসারীদের যদি ধর্মের আবরণে বিভ্রান্ত করা যায় তবেই তাদের ঈমানী শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়া সহজ। এ হলো একটা পদ্ধতি। অন্য পদ্ধতি হলো, সেই ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শাসকবর্গকে ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা। শাসকদেরকে ভোগবাদী ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলা।...

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো দৈহিক চাহিদা। যৌন চাহিদা মানুষের সহজাত বিষয় এবং তা পবিত্র বিধিমালার আওতায় প্রশংসনীয় বটে কিন্তু এটাই আবার বিধি-নিষেধের পরিপন্থী পন্থায় চরিতার্থ হলে চরম কদর্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর কাছে তা মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। তাই আমাদের চির শত্রুরা আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শাসকবর্গকে বিপথগামী করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে নারী, মদ ও বিত্ত-বৈভব।

ইহুদী খৃস্টানরা আব্দুল্লাহ্ ও মাইমুনকে অপরিমেয় ধন-সম্পদ ও তাদের প্রশিক্ষিত নারী সরবরাহ করে ভৃত্যে পরিণত করে। এরা এদেরকে ব্যবহার করে মুসলিম শাসকবর্গকে বিলাসী ভোগবাদিতায় অভ্যস্ত করতে সক্ষম হয়। ওদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ ইসলাম বিবর্জিত হলেও সব বিষয়ে ইসলামের লেবেল এঁটে দেয়। যার ফলে মুসলমানরা বিভ্রান্তির শিকার। দৃশ্যত এরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে ভেতরে ভেতরে ইসলামের মৌল আকীদা, হারাম-হালাল, পরকালের আযাব-গযব ও জবাবদিহিতার অনুভূতিটুকুও মানুষের মন থেকে মুছে

দিতে তৎপরতা চালায়। আর প্রচার করে, এটাই প্রকৃত ইসলাম। ধর্মান্ধ মুসলমানরা নাকি ইসলামের প্রকৃত রূপ বদল করে মানুষের কাছ থেকে ভোগবাদিতার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। কত জঘন্য এদের কর্মকাণ্ড! কারামাতীরা প্রচার করে, মৃত্যুর পর জান্নাত জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। এ সবই নাকি আলেমদের মনগড়া বিষয়। প্রত্যেক মুসলমানের মৌলিক অধিকার রয়েছে দুনিয়াতে সবকিছুর স্বাদ নেয়া এবং ভোগ করার। দুনিয়াতেই জান্নাত জাহান্নাম। যে কেউ ইচ্ছে মতো তার জীবনকে জান্নাতী সুখে ভরে নিতে পারে।...

স্বভাবত মানুষ ভাল কাজের দিকে ধীর লয়ে অগ্রসর হয়, কখনও পিছিয়েও আসে। কিন্তু মন্দ কাজের প্রতি মানুষ খুব দ্রুত অগ্রসর হয়। কারামাতীরা মানুষের এই সহজাত শক্তিটাকে কৌশলে ব্যবহার করছে। ২৯০ হিজরী সনে কারামাতীরা সিরিয়ার ব্যাপক জনসংখ্যাকে বিভ্রান্ত করে সেখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটাতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে সেখানে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। ৩১১ হিজরী সনে এরা বসরা ও কুফা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালিয়ে শহর দু'টিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। আবু তাহের নামের এক কুখ্যাত দস্যুকে তারা সে সময় ক্ষমতায় বসিয়ে মক্কা মুয়াজ্জিমাকেও দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল এই কারামতী গোষ্ঠী।

কারামাতীরা এক পর্যায়ে পবিত্র হাজরে আসওয়াদকে কা'বা গাত্র থেকে সরিয়ে বসরায় স্থানান্তরিত করে। প্রায় বিশ বছর হাজরে আসওয়াদ বসরায় ছিল ওদের কব্জায়। এরপর আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দিতে শুরু করেন। হালাকু খান ওদের মৃত্যুদূত হিসেবে আভির্ভূত হন। হালাকু খানের আক্রমণে কারামাতীদের অধিকাংশ অনুসারী নিহত হয়। যারা বেঁচে থাকে তারা পালিয়ে ইরানে পাড়ি জমায়। ইরানেও ওরা স্থির থাকতে পারেনি। ইরানী স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করে। ওই বিতাড়িত কারামাতীদের উত্তরসূরীদেরকেই আজ আপনারা দাউদ বিন নসরের সুরতে দেখছেন।

দাউদ বিন নসরের দাদা আহমদ খান কারামাতী মুলতানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। সে ইসলামের সহীহ্ আকীদায় বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে হত্যা করে, জুলুম অত্যাচার চালিয়ে এমন ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, ওদের মোকাবেলায় দাঁড়াবার মতো কেউ আর বেঁচে ছিল না। সকল প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তিকে

নিঃশেষ করে কারামাতীরা প্রচার করতে শুরু করে, আমরা যে ইসলাম প্রচার করি সেটিই সত্যিকার ইসলাম। অত্যাচার উৎপীড়ন ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আহমদ খান একটি অনুগত গোষ্ঠী তৈরি করে নেয় এবং মুলতানে কারামাতী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের স্মৃতিবাহী এই মুলতান। সারা দুনিয়ার ইহুদী খৃস্ট শক্তি এদের সহযোগী। কিন্তু বাইরে থেকে মুসলমানরা এদের অপকর্ম ততোটা অনুধাবন করতে পারে না বলে এদেরকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদাঙ্ক অনুসারী মনে করে বিভ্রান্তির শিকার হয়। প্রকাশ্যে এরা হিন্দুদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখলেও নেপথ্যে দাউদ বিন নসর হিন্দুদের প্রধান সহযোগী এবং হিন্দু পৃষ্ঠপোষকতাই তার প্রধান শক্তি। কারামাতীদের দীর্ঘ ইতিহাস আপনাদেরকে এজন্য শুনাচ্ছি যে, যদি দাউদ সুলতানকে সহযোগিতার ওয়াদা করে তবে তা মারাত্মক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা যাতে এদের ভালভাবে চিনতে পারেন এজন্যই আমার এতোসব বলা।"

"আসেম ওমর কি পয়গাম নিয়ে এলেন এ ব্যাপারে আপনি অবগত হলেন কিভাবে?" প্রশ্ন করল এক নিরাপত্তাকর্মী। "আপনি কি করে জানলেন, রাতের বেলায় সে মদ পান করেছে? আপনি কি এখানে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছেন?"

"না। আমি কোন গোয়েন্দা নই। আমি সুলতান মাহমূদেরও নিয়োগকৃত গোয়েন্দা নই। আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের আত্মার সন্তান। তাঁরই উত্তরসূরী। আমরা সেই মহান ব্যক্তিদের বংশজাত— মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে যারা এখানে এসে সত্যিকার ইসলাম প্রচারে আত্মনিবেদন করেছিলেন। আমরা কারামাতীদের বিপরীতে সত্যিকার ইসলাম প্রচারে গোপন সংগঠন গড়ে তুলেছি। আমাদের নিজস্ব লোক রাজমহলের ভেতরে কাজ করে। ভেতরের সকল সংবাদ তাদের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। দাউদ বিন নসর ব্যক্তিগতভাবেও জানে, তার বিরুদ্ধে একটি গোপন শক্তি সক্রিয় রয়েছে, কিন্তু সে আমাদের কখনও চিহ্নিত করতে পারেনি। আমরা খুবই সতর্কভাবে কাজ করি। আমাদের প্রত্যেক সদস্য সুশিক্ষিত, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। পুরুষ ছাড়াও অনেক মহিলা রয়েছে আমাদের সংগঠনে। তারা প্রত্যেকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী। তারা সৎ, আমানতদার ও পরহেযগার। দাউদ যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযানের পরিকল্পনা করে তবে আগেই আমরা এর খবর পেয়ে যাই, তার পক্ষে আমাদের কার্যক্রম চিহ্নিত করা মোটেই সহজ নয়।"

“এখন আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?”

“আগে আপনাদেরকে এ বিষয়টি বুঝতে হবে, দাউদ আপনাদের সুহৃদ নয়, সে হিন্দুদের সুহৃদ। সেই সাথে আপনাদের দূতবেশী কমান্ডারের উপরও ভরসা ত্যাগ করতে হবে। সে যদি সুলতানের কাছে মুলতানে সেনা অভিযানের পরিকল্পনা পেশ করে তবে আপনারা সুলতানকে দাউদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে বলবেন। তিনি যদি হিন্দুদের পদানত করতে সেনা অভিযানে আগ্রহী হন তবে সর্বাগ্রে মুলতানের কারামতী আখড়াকে নির্মূল করতে হবে।

আমি আপনাদের এ আশ্বাস দিচ্ছি, ইসলামের নামে প্রতারণা করে কেউ রক্ষা পায়নি। দাউদেরও শেষ রক্ষা হবে না। যারাই ইসলামের নামে প্রতারণা করেছে ধ্বংস হয়েছে। দাউদের ধ্বংসও অনিবার্য।”

“তাহলে আমাদের আগে দেখতে হবে, কমান্ডার আসেম ওমর কি করেন।” বলল এক নিরাপত্তারক্ষী। “তিনি তো দাউদের ফাঁদে পা নাও দিতে পারেন। যদি দেখি তিনি দাউদের ফাঁদে পা দিয়েছেন, তাহলে আপনি যা বলেছেন সে তথ্য সুলতানকে জানাব।”

* * *

দাউদ বিন নসরের সামনে উপবিষ্ট আসেম ওমর। তাদের সামনের টেবিলে একটি মানচিত্র।

“এ মানচিত্র আপনি সাথে নিয়ে যেতে পারেন।” বলল দাউদ। “আমি আপনাকে সুলতানের সেনাবাহিনীর জন্যে নিরাপদ পথ বলে দিলাম। চুন্নাব নদী পার হওয়ার জায়গাটিও বলে দিয়েছি।”

“আপনি যে পথের কথা বললেন, সে পথে আনন্দ পাল ও বিজি রায়ের সৈন্যরা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। আমার কাছে তো পথটি অনিরাপদ মনে হচ্ছে। এ জটিল পথে আপনি কিভাবে আমাদের নিরাপত্তা দেবেন?” বলল আসেম।

দাউদের উত্তরে আশ্বস্ত হতে পারল না আসেম। দাউদের কথা ও তার প্রতিশ্রুতিকে সামরিক দৃষ্টকোণ থেকে যাচাই করতে শুরু করল আসেম। আসেমের মনে দাউদের কথায় সন্দেহ উঁকি দিল। সন্দেহ নিরসনকল্পে বহু প্রশ্ন করল আসেম। আসেমের অভাবিত জিজ্ঞাসায় দাউদ ভেবাচেকা খেয়ে গেল।

“আর ক'দিন কি এখানে আছেন না আপনি?”

"কর্তব্যের খাতিরে আমাকে যেতে হচ্ছে। নয়তো আমার আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল না।"

"কর্তব্যের ব্যাপার হলে সেই কর্তব্য আমি যেভাবে বলি সেভাবে পালন করুন। আপনি সুলতানকে এ পথে এনে আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আপনি আমাদের এখানে এলে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব সোপর্দ করা হবে আপনাকে। আর আরাম-আয়েশ যা পাচ্ছেন সেসব সব সময়ের জন্যে স্থায়ী করে দেয়া হবে।"

"আপনি যদি মাহমূদকে আমাদের পাতানো ফাঁদে আটকে দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে এ অঙ্গীকার দিচ্ছি, আমার রাজ্যের কিছু এলাকা ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন শাসন কাজ চালানোর ব্যবস্থা করে দেবো আপনাকে। যুদ্ধ ময়দানে এতো কৃতিত্ব অর্জনের পর জীবনে কিছুটা আরাম-আয়েশ করার অধিকার অবশ্যই আপনার আছে। মানুষতো আর দুনিয়াতে বারবার আসে না!"

শ্বেত শুভ্র শ্মশ্রুধারী লোকটি যে ধরনের কথা বলেছিল দাউদের মুখেও সে ধরনের কথা শুনতে পেল আসেম। দাউদ বলল, "হিন্দুদের চেয়ে পরোপকারী কোন সুহৃদ আপনি ইহজগতে পাবেন না। আপনি হিন্দুদের সাথে মিশে দেখুন না! সুলতানের ইচ্ছার বলী হয়ে জীবনটাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে কি লাভ? আগামীকাল সকালেই চলে যান। সুলতানকে গিয়ে বলুন— দাউদ বিন নসর আপনাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে এবং অগ্রাভিযানের পথও বলে দিয়েছে।"

সেই দিন বিকেলের ঘটনা। আসেম ওমর তার কক্ষে চার নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে পাঠাল। তাদের বলল, "আগামীকাল সকালেই আমি রওয়ানা হবো।" আসেম তাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বিদায় গ্রহণ করল।

তারা মহলের একটি গলিপথে নিজেদের থাকার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় পিছন দিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা একটি মহিলাকে তাদের দিকে আসতে দেখল। মহিলাটি তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দিকে না তাকিয়েই অনুচ্চ আওয়াজে নিজের ভাষায় ও ইঙ্গিতে বলল, "তোমাদের একজন এখনই ওই বুযুর্গ ব্যক্তির বাড়িতে চলে যাও, যার বাড়িতে তোমরা মেহমান হয়েছিলে।" মহিলাটি আর কোন কথা না বলে তার মতো করে ওদের অতিক্রম করে চলে গেল।

তাদের একজন তখনই গিয়ে সেই বুযুর্গ ব্যক্তির দরজায় কড়া নাড়ল। তিনি নিজেই দরজা খুলে তাকে ভেতরে নিলেন।

"আসেম ওমর কেরামাতীদের ফাঁদে আটকে গেছে।" বললেন বুযুর্গ। "সে দাউদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তি মতো তাকে একটি মানচিত্র দিয়ে দেয়া হয়েছে, যে পথে সুলতানের বাহিনী নিয়ে আসবে সে। আপনারা আগামীকাল সকালেই এখান থেকে রওয়ানা হচ্ছেন। আপনারা সুলতানকে গিয়ে বলবেন, যাঁকে আপনি মুসলমান ও সুহৃদ মনে করছেন সে শত্রুতায় হিন্দুদের চেয়েও জঘন্য। কোন অবস্থাতেই আসেমের বলা পথে সেনাভিযানের চিন্তা যেন সুলতান না করেন। আপনি জলদি এ দেশ থেকে চলে যান। পথে কোন সময় নষ্ট করবেন না।"

"আচ্ছা ওই মহিলাটি কে? যিনি আমাদের একজনকে আপনার সাথে দেখা করার সংবাদ দিলেন?" জিজ্ঞেস করল নিরাপত্তারক্ষী।

"সে এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারী।" বললেন বুযুর্গ।

"আপনারা হয়তো তার সৌন্দর্য দেখে থাকবেন। তাকে তার মা-বাবা মোটা অংকের পণের বিনিময়ে এক চরিত্রহীন ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে বিয়ে দেয়। লোকটি দাউদের সাথে সুসম্পর্ক অটুট রাখার স্বার্থে নিজের স্ত্রীকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেয়। দাউদ দু'বছর তাকে হেরেমে রেখে রাজকর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই বুদ্ধিমতি, পড়ালেখাও জানে। সে ছিল আমার মেয়ের সহপাঠিনী। এই সুবাদে সে আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে। আমার মেয়ের সাথে সময় কাটায়, কথাবার্তা বলে। ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য প্রথম দিকে সে খুব কান্নাকাটি করতো, কিন্তু আমার মেয়ের মাধ্যমে আমি তাকে যখন বলেছি, এই জাহান্নামের ভেতরে থেকেও তুমি ইচ্ছে করলে ইসলামের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পার, তখন সে দুঃখ বুকে চেপে আমাদের সহযোগিতা করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে সব ধরনের শাহী ফরমান ও পরিকল্পনা আমরা আগেই জানতে পারি। সে যথাসময়ে আমাদের কাছে সংবাদ পৌছে দেয়। প্রশাসনিক কাজে সে খুবই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তা হিসেবে রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ দাউদ বিন নসর যখন আসেমকে ডেকে একান্তে হিন্দুদের তৈরি মানচিত্র দিয়ে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকাতে রাজ্যদানের টোপ দিল তখন এই মেয়েটি তাদেরকে পানীয় ও শরাব পরিবেশন করছিল। দাউদের একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করে এই মেয়ে। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তাদের কথাবার্তা। ওখানকার কাজ শেষ হলেই সে আমার এখানে এসে সব বলে গেছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,

সুলতানকে আপনার আস্থায় নেয়া যে, আসেম ওমর যে প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে তা প্রতারণার ফাঁদ আর আপনি যা বলবেন তা সঠিক।"

"এই মহিলা কি নিয়মিত আপনার নিকট যাতায়াত করে?" জিজ্ঞেস করল নিরাপত্তারক্ষী। "সে কি রাজমহল থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায়? তাকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়ার কথা কি আপনি কখনও ভেবেছেন? কোন মুসলমান যদি ওকে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চায় এবং বিয়ে করে। তা কি সম্ভব?"

"অনেকবার ওকে এই নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার কথা ভেবেছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য এমন কোন মুসলিম যুবক পাইনি যে তাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সংসার গড়তে পারে। আজকেও সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের কেউ যদি সাহস করেন তবে সে আপনাদের কারো সাথে গজনী চলে যেতে আগ্রহী। ওকে কেউ বিয়ে না করলেও কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সেবা করেও জীবন কাটিয়ে দিতে রাজী।"

"আমরা ওকে সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু সবার গোচরে ওকে নিয়ে পথ চলা মুশকিল হবে। ওকে যদি আমাদের যাত্রা পথের কোন জায়গায় শহর থেকে দূরে কোথাও আমাদের সাথে মিলিত করা যায় তবে সাথে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। অবশ্য আসেম ওকে সাথে নিয়ে যেতে বাধ সাধবে। সে দিকটা আমরা সামাল দেবো।" বলল নিরাপত্তারক্ষী।

পরদিন খুব ভোরে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই কমান্ডার আসেম চার সঙ্গীকে নিয়ে গজনীর পথে রওয়ানা হল। তাদের সাথে নতুন যোগ হলো দাউদ বিন নসরের উপঢৌকন বোঝাই করা একটি উট। এক সৈনিকের বর্শার সাথে বেঁধে দেয়া হল সাদা পতাকা। যা শাসকদের পক্ষ থেকে দেয়া তাদের জন্যে নিরাপত্তার প্রতীক।

আসেমের কাফেলা শহর অতিক্রম করে নদী পেরিয়ে গেল। আসেম ওমর আসার সময় সাথীদের সাথে নানা খোশগল্পে পথ অতিক্রম করেছিল। সঙ্গীরা ও তার মধ্যে তেমন কোন আভিজাত্যের বিভেদ ভাব ছিল না তখন। কিন্তু ফেরার পথে সেই আসেম অন্য মানুষ। এখন সে সবার থেকে আগে আগে চলছে। কারো সাথে কোন গল্প করার মনোভাব তার নেই। কথা দু'চারটি যা বলছে, সেগুলোর সবই হয়তো সঙ্গীদের প্রতি নির্দেশ নয়তো দিক নির্দেশনামূলক। তার মধ্যে এখন রাজকীয় ভাব। মাথাটা যেন আগের চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে এক হাত। আচরণে স্পষ্ট অহমিকার ছাপ।

সূর্য প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা। একটা ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার ভেতর দিয়ে তারা যাচ্ছে। আসেম তাদের থেকে অনেকটা আগে। হঠাৎ এক সাথী অন্যদের ইশারায় বলল, দেখো তো ঝোঁপের আড়ালে দু'টি লোকের অবস্থান মনে হয় কি-না। ওদের চোখ এবং দেহের কিছু অংশ আবছা অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল। অন্যরাও তাকে সমর্থন করল এবং বলল, মনে হয় বুযুর্গ ব্যক্তি সেই মহিলাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

তারা গত রাতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ হলো। তাদের একজন ঘোড়া থামিয়ে ধীরে ধীরে ঘন-জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হল। বাকীরা আসেমের অনুগামী হল। সৈনিক একটু অগ্রসর হলেই সেই যুবতীকে দেখতে পেল। সে একটি ঘোড়ায় আরোহিত। সাথে একজন পুরুষ। লোকটি যুবতীকে সৈনিকের কাছে সোপর্দ করে নীরবে চলে গেল। যুবতীকে নিয়ে সৈনিক কিছুক্ষণ সেখানেই বসে রইল। এরা চোখের ভাব বিনিময় ও মুচকি হাসি ছাড়া কেউ কারো কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে না। যুবতী ও সৈনিকের ভাষা ভিন্ন। যুবতী যখন ইঙ্গিতে সৈনিককে বলল চলুন, তখন সৈনিক তাকে চুপ করে বসে থাকতে অনুরোধ করল।

সূর্য ডুবে চারদিকে অন্ধকার নেমে এলো। সাথীদেরকে তাঁবু টাঙ্গিয়ে বিশ্রামের নির্দেশ দিল আসেম। আসেম যখন দেখলো, লোক একজন কম তখন অন্যদের জিজ্ঞেস করল, সে কোথায়? সবাই বিস্ময় প্রকাশ করল এবং অবজ্ঞাও দেখালো কিছুটা। বলল, সব সময় পিছনে পিছনে থেকেছে। বলছিল তার কাছে নাকি মুলতান খুবই ভাল লেগেছে। সে থেকে যাবে। আরেকজন বললো, কে জানে কোন বারবণিতাকে নাকি ভাল লেগেছে তার। ওখানেই ফিরে গেছে হয়তো।

আসেম ওদের প্রতি খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করল। ওরাও আসেমের কথায় দৃশ্যত অনুতাপ করল। একজন বলল, "ওকে খোঁজা অর্থহীন। পশ্চাদ্ধাবন করেও কোন লাভ নেই। কে জানে কখন পালিয়েছে। আমরা তো স্বপ্নেও ভাবিনি ও এমন করে পালাবে।"

দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল আসেমের চেহারা। বহুক্ষণ পর বলল, "ঠিকই বলেছ, ওকে খোঁজা অর্থহীন। তার চেয়ে বরং ও যেখানে যেতে চাইছে সেখানেই চলে যাক।"

এতো গুরুত্বপূর্ণ একজন সাথীর হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি আসেমকে। কারণ তার নিজের প্রাণই তো পড়ে রয়েছে দাউদের প্রাসাদে'। তার তনু মনে এখনও পেয়ালা আর রমণীর উষ্ণতার অনুভব।

নিরাপত্তারক্ষী যদি কোন রমণীকে মন দিয়ে থাকে তো আর বেশি কি দিয়েছে। আসেম নিজেকেই তো বিক্রি করে দিয়েছে দাউদের কাছে। ঈমান বিলীন করে দিয়েছে তরুণীর দেহের উষ্ণতায় মদের পেয়ালায়। শরীরটা শুধু যাচ্ছে গজনীর দিকে, আসেমের মনটা বাঁধা মুলতানের প্রাসাদে। তাই সাধারণ একজন সৈনিকের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে কতটুকু আর প্রভাবিত করবে। নিজের কাছেই আসেমকে রাজা রাজা মনে হচ্ছে। সৈনিক তো দূরের কথা, খোদ সুলতানেরই কোন গুরুত্ব নেই তার কাছে।

কল্পনাও করতে পারেনি আসেম— সে যখন তিন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে বিশ্রাম করছে, তখন তার হারিয়ে যাওয়া সৈনিক এক যুবতীকে নিয়ে গজনীর পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

ভারত অভিযান
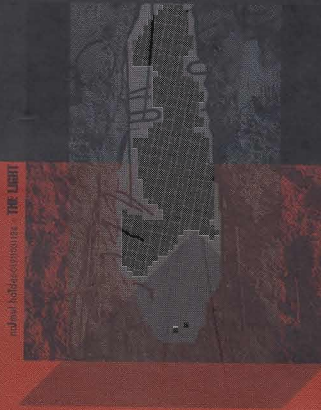
VAROT OVIJAN : 1
ISBN 984-70109-0000-3 SET